মনোদর্শন

জেরাম এ. শেফার

জেরোম এ. শেফার

মনোদর্শন

মুহম্মদ জহুরুল হক
সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
অনূদিত

বাংলা একাডেমী : ঢাকা

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় ১৩৯০
জুন, ১৯৮৩

বাএ : ১৩৪৪
মুদ্রণ-সংখ্যা : ২২৫০

পাণ্ডুলিপি
পাঠ্যপুস্তক বিভাগ

প্রকাশক
বশীর আলহেলাল
পরিচালক
প্রকাশন-বিক্রয় বিভাগ
বাংলা একাডেমী

প্রচ্ছদ : রাগীব আহসান

মুদ্রণে
গোলাম মহিউদ্দীন মন্ছি
জয় প্রিন্টার্স
এইচ,বি,এ ফ,সি, বিল্ডিং
২২, পুরানা পল্টন, ঢাকা

মূল্য : পঁচিশ টাকা

MONODARSHAN (Jerome A. Shaffer's Philosophy of Mind) translated by Md. Zahurul Huq. Published by Bangla Academy, Dhaka. First Edition, June 1983. Price Taka : 25·00.US Dollar 3·00.

অনুবাদকের কথা

আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে দর্শন বিভাগের পাঠক্রমে মনোদর্শন-এর সংযোজন খুব বেশী দিনের কথা নয়। গত তিন বছর যাবৎ এ বিষয়টি আমাদের দর্শন বিভাগে স্নাতক সম্মান শ্রেণীতে পড়ান হচ্ছে। জেরোম এ, শেফার-এর Philosophy of Mind গ্রন্থটি আমরা Text-book হিসাবে নিয়েছি প্রারম্ভ থেকেই। দর্শনের বেশীরভাগ ছাত্র-ছাত্রীই এখন তাদের মাতৃভাষা বাংলার মাধ্যমে পড়াশুনা করে এবং পরীক্ষা দিয়ে থাকে। ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধার্থে এবং মনোদর্শনকে জনপ্রিয় করে তুলবার উদ্দেশ্যে শেফারের বইখানি ইংরেজী থেকে বাংলায় অনুবাদ করার কাজটি হাতে নিয়েছিলাম অনেক আগেই। কিছুটা দেরী হলেও, বইখানি ছাপার অক্ষরে বের হচ্ছে দেখে খুবই আনন্দবোধ করছি।

দর্শন বিষয়ক গ্রন্থের অনুবাদের কাজ খুবই দুরূহ ব্যাপার। দার্শনিক চিন্তাধারা এবং তার আলোচনা-পদ্ধতির সঙ্গে পরিচয় না থাকলে মূল বক্তব্যের উপস্থাপনায় ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা দেয়ার সম্ভাবনা থাকে। আমি সাধ্যমত সঠিক অনুবাদ করার চেষ্টা করেছি। কতখানি সফলকাম হয়েছি তা বিচারের ভার আমার পাঠক-পাঠিকার উপরই রইল।

মূল গ্রন্থে অনেক জটিল শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। দর্শনের উপর বাংলায় কোন পূর্ণাঙ্গ পরিভাষা-কোষ না থাকায় অনুবাদের কাজে বেশ কষ্ট পেতে হয়েছে। অনেক জায়গাই বেশ চিন্তা ও পরিশ্রম করতে হয়েছে। অনূদিত বক্তব্যকে সহজবোধ্য করার যথেষ্ট চেষ্টা করেছি। মূল গ্রন্থের কিছু কিছু ইংরেজী শব্দ বা বাক্যাংশ সময় সময় বাংলা অনুবাদের পাশে বন্ধনীর মধ্যে উল্লেখ করেছি। উদ্দেশ্য হচ্ছেঃ পাঠক-পাঠিকাকে মূল শব্দ বা বক্তব্যের সঙ্গে পরিচিত করানো এবং ভুল বুঝাবুঝির অহেতুক বিড়ম্বনা এড়ানো। বিশেষ কারণে, মূল গ্রন্থের বাঁকা হরফের শব্দ বা বাক্যাংশকে উদ্ধৃতি-চিহ্ন (single quotation) দিয়ে প্রকাশ করেছি।

এ গ্রন্থটি অনুবাদে আমি বেশ কয়েকজনের কাছ থেকেই সক্রিয় সাহায্য ও সহানুভূতি পেয়েছি। আমার সহকর্মী প্রভাষক গালিব আহসান খান ও তাঁর স্ত্রী রাশেদা খানম-এর (এঁরা দুজনই এখন বিদেশে অধ্যয়নরত রয়েছেন) নাম সর্বাগ্রেই স্মরণ না করে পারছি না। বইখানির পঞ্চম অধ্যায়ের অনুবাদের প্রাথমিক খসড়া রচনায় তাঁদের সক্রিয় সাহায্যের জন্য

আমি খুবই উপকৃত হয়েছি। দর্শন বিভাগের অধ্যাপক ডঃ আমিনুল ইসলাম সাহেবের নামও আমি কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। প্রথম দুটি অধ্যায়ের খসড়া-অনুবাদে তাঁর সক্রিয় সাহায্য গ্রন্থটির সাবিক অনুবাদের কাজে অগ্রসর হওয়ার ব্যাপারে আমাকে যথেষ্ট প্রেরণা যুগিয়েছে। এজন্য তাঁর কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী। পরিশেষে, এ গ্রন্থ অনুবাদের ব্যাপারে অধ্যাপক ডঃ আবদুল মতীনের অবদান আমি অকপটে স্বীকার করছি। তাঁর সক্রিয় সাহায্য ও উৎসাহের ফলেই গ্রন্থটির অনুবাদের এবং পরিশোধনের কাজ শেষ করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছে। গ্রন্থটির সম্পাদনার ভার গ্রহণ করে অধ্যাপক ডঃ আবদুল মতীন সাহেব আমার যে উপকার করলেন, সেজন্য তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। এ গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করার ব্যাপারে বাংলা একাডেমী কর্তৃপক্ষ আমাকে যে সুযোগ ও উৎসাহ দিয়েছেন, সেজন্য তাঁদের কাছেও আমি কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রইলাম। জয় প্রিন্টার্সের ম্যানেজার জনাব গোলাম মহিউদ্দীন সাহেবের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই বইখানি অবশেষে ছাপার অক্ষরে বেরুল। এজন্য, তাঁকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

বইখানিতে কিছু কিছু মুদ্রণদোষ থেকে গেল। শত চেষ্টা সত্ত্বেও, বইখানি অনুবাদে আর যা ত্রুটি রয়ে গেল তার জন্য আমি স্বয়ং দায়ী।

অনুবাদখানি দর্শনের ছাত্র-ছাত্রীদের কাজে লাগলেই আমার শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

মু. জ. হক
জুন, ১৯৮৩

প্রসঙ্গ-কথা

'মন' এবং 'মানসিক' এই কথা দুটি আমরা অহরহই ব্যবহার করি। কিন্তু এদের দ্বারা আমরা কি বুঝাই? নিঃসন্দেহে 'মন' কথাটির দুটি উপাদান রয়েছে। একটি উপাদান হচ্ছেঃ যাকে সচেতন বলে মনে করা হয় তারই মন আছে বলা যেতে পারে; আর যা কখনই সচেতন নয় তার যে মন আছে তা বলা যায় না। কোন 'মনের অবস্থা' বা 'মানসিক অবস্থা' হচ্ছে সাধারণভাবে চেতনারই একটা অবস্থা; কোন কিছু মনে রাখা, কোন বিষয়ে দুশ্চিন্তা করা বা উদ্বিগ্ন হওয়া, কোন কিছুতে মনোযোগ দেয়া, অথবা এটা কিংবা ওটা সম্পর্কে যত্নবান বা সতর্ক হওয়ার অর্থ হচ্ছে সেটি সম্পর্কে সচেতনাবস্থায় থাকা, এবং যদি কোন কিছু কারো মন থেকে বাদ পড়ে যায় তাহলে সে-সম্পর্কে তার মন সচেতনতা হারায়। অপর উপাদানটি হচ্ছে, কতকগুলো কর্ম-ক্ষমতা বা দক্ষতার কোন একটি সমষ্টি। কোন কিছু 'মন' কথাটি দ্বারা বিশেষিত হয় তখনই, যখন তা এমনসব উপায়ে কাজ করতে সক্ষম হয় যা কোন না কোন উদ্দেশ্য-সাধনকে সম্ভব করে তোলে, পরিবর্তিত অবস্থায় এর কাজগুলোকে এমনভাবে পরিচালিত করতে পারে যেন তাদের উদ্দেশ্য-সন্ধানী চরিত্রটি বজায় থাকে, এবং অতীত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এর উদ্দেশ্যাবলীকে সফলতার সাথে অনুসরণ করতে পারে। এই অর্থেই আমরা মানসিক ত্রুটি ও মানসিক রোগের, কোন সূক্ষ্ম, উদ্ভাবনক্ষম বা খেয়ালী মনের, বৈজ্ঞানিক বা শিল্পীসুলভ মানসিকতার, রোমক বা চৈনিক মন-মানসের কথা বলে থাকি।

'মন' বলে কথিত একটি প্রত্যয়ে চেতনা এবং উদ্দেশ্য-সাধন উপযোগী কর্ম-ক্ষমতা বা দক্ষতাসমূহ আরোপণের কোন যৌক্তিকতা আছে কি? যৌক্তিকতা রয়েছে বৈকি! প্রকৃতপক্ষে, মানুষ ও ইতর-প্রাণীর এমনসব কর্ম-ক্ষমতা রয়েছে যে-গুলোর প্রয়োগের জন্যই চেতনার বিদ্যমানতা অত্যাবশ্যক; কেননা সচেতন প্রাণীই সেসব কর্ম-ক্ষমতা বা দক্ষতার অধিকারী হয় এবং কেবল চেতনাবস্থা থাকলেই সেসবের প্রয়োগ সম্ভব হয়। অর্থাৎ, প্রাণীর কর্ম-ক্ষমতা বা দক্ষতাসমূহ চেতনার উপর নির্ভরশীল এবং সেগুলোর অধিকারী হওয়া তাদের সচেতনতার তথ্যই প্রমাণ করে। এভাবে 'মন' কথাটির ব্যবহার করতে গিয়ে যুগপৎ চেতনার বিদ্যমানতা এবং সেসব

কর্ম-ক্ষমতা বা দক্ষতার উপস্থিতিকে নির্দেশ করা হয় যে-গুলোর প্রয়োগের জন্যই চেতনা অপরিহার্য। সুতরাং বলা যায়, চেতনাই হল 'মন'-এর কেন্দ্রীয় উপাদান। আমরা যাকে মনোদর্শন (Philosophy of Mind) বলি তা চেতনাক্ষম জীবসম্পর্কিত ঘটনাবলী নিয়েই আলোচনা করে। অন্য কথায়, চেতনার প্রকৃতি কি, কি কি ধরনের জিনিস সচেতন বা চেতনাক্ষম এবং কেবল চেতনাক্ষম জীবসমূহ যে-সবের নিয়ন্ত্রণাধীন এমনসব ঘটনাই (যে-গুলোকে আমরা সচারাচর 'মানসিক ঘটনা' [mental phenomena] বলি) মনোদর্শনের প্রধান আলোচ্য বিষয়।

চেতনাকে কেন্দ্র করে মনোদর্শনে নানাবিধ বিতর্কমূলক প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। প্রকাশের বিভিন্নতা সত্ত্বেও চেতনা সম্পর্কে একটি স্বাভাবিক প্রশ্ন হলঃ এই চেতনা কি কোন গোপনীয় বিষয় (যা একান্তই ব্যক্তিগত) বা এমন একটি আভ্যন্তরীণ ঘটনা বা বিষয় যা কেবল জ্ঞাতার কাছেই ধরা পড়ে? অথবা এটা কি মূলতঃ এমন একটি প্রকাশ্য ঘটনা বা বিষয় যা কেবল জ্ঞাতা নয়, বরং অপরাপর ব্যক্তির প্রত্যক্ষণের আওতাভুক্ত? এই প্রসঙ্গে চেতনার উত্তম-পুরুষ বিবরণ (first-person account) এবং নাম-পুরুষ বিবরণ (third-person account) দুটির আলোচনা মনোদর্শনে খুবই প্রাধান্যলাভ করেছে। আর একটি প্রশ্নঃ কাকে আমরা চেতনাসম্পন্ন বলব? শরীর, মন, না ব্যক্তি? এই প্রশ্নের সঙ্গে সম্পর্কিত পি,এফ, স্ট্রসনের ব্যক্তিতত্ত্ব, দ্বিমুখী ও জড়বাদী মতবাদগুলো মনোদর্শনের আলোচনায় একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করে রয়েছে। দেহ-মন সম্পর্কিত দর্শনের পুরাতন সমস্যা, ইচ্ছার স্বাধীনতা বা দায়িত্ব, মৃত্যু এবং আত্মার অমরত্ব, ইন্দ্রিয়াতীত অভিজ্ঞতাবিষয়ক ঘটনা, আত্ম-জ্ঞান, ব্যক্তির একরূপতা, অপরের মন সম্বন্ধে জ্ঞান, প্রভৃতি মনোদর্শনের আলোচনার পর্যায়ভুক্ত।

মনোদর্শনের আলোচনার বিষয়-বস্তুকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়; যথাঃ (১) 'মন' সম্পর্কিত সাধারণ সমস্যার প্রশ্নাবলী, এবং (২) বিভিন্ন মানসিক ঘটনা বা মানসিক প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত বিশেষ প্রশ্ন। প্রথমোক্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত প্রশ্নগুলো নিম্নরূপ হতে পারেঃ মন বা মানসিক ঘটনার স্বরূপ বা প্রকৃতি কিরূপ, 'মন' বলে কোন বস্তু আছে কি নেই, মনের সঙ্গে অন্যান্য ধরনের বস্তু বা বিষয়, যেমন দেহ, ব্যক্তি, যন্ত্র, প্রকৃতি, ইতর-প্রাণী, দেবতা ইত্যাদির মধ্যে সম্বন্ধের প্রশ্নাবলী; ব্যক্তির অন্তর্নিহিত মানসিক দিকগুলো, যেমন শক্তি, প্রবণতা, দক্ষতা, কাজ ও তার বিভিন্ন

প্রক্রিয়া, ঘটনা, সংবেদনশীলতা, গুণাবলী ইত্যাদি সম্পর্কিত প্রশ্নাবলী; মনের কার্য-ধারা সম্পর্কিত প্রশ্ন, যেমন মন কেবল কি যান্ত্রিক নিয়মে চলে, না এর কাজের পিছনে কোন উদ্দেশ্য বিদ্যমান থাকে, অথবা কোন নিয়মনীতি ব্যতিরেকেই এটি কাজ করে যায়; মানুষের আচরণের অন্তর্নিহিত মানসিক উপাদান সম্পর্কিত প্রশ্নাবলী এবং মানুষের কাজের দায়িত্ব ও মূল্য বিচারে আমাদের পর্যালোচনায় সে-সবের প্রাসঙ্গিকতার প্রশ্নবালীও মনোদর্শনের আলোচ্য বিষয়। মনোদর্শনের দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত আলোচনার বিষয়-বস্তু হল বিভিন্ন মানসিক ঘটনা বা প্রক্রিয়া-বিজড়িত প্রত্যয়সমূহের বিশ্লেষণমূলক ও যৌক্তিক ব্যাখ্যা। সেগুলো হল: (১) জ্ঞানমূলক প্রত্যয়সমূহ (cognitive concepts), যেমন: চিন্তা, বিশ্বাস, স্মৃতি, প্রত্যক্ষণ, কল্পনা, প্রতিচ্ছবি ইত্যাদি; (২) ইচ্ছা-প্রসূত প্রত্যয়সমূহ (Will-concepts), যেমন: সিদ্ধান্ত, পছন্দ, অভিপ্রায়, কামনা, অভীস্পসা ইত্যাদি; এবং (৩) আবেগ, অনুভূতি ও সংবেদন-সূচক প্রত্যয়সমূহ (emotion, feeling and seusation-words) যেমনঃ রাগ, দ্বেষ, ভয়, আনন্দ, সুখ-দুঃখ ইত্যাদি; এছাড়া, প্রেরণা, মনোযোগ, চেতন ও অবচেতনাবস্থা, স্বপ্ন ইত্যাদি সম্পর্কিত সমস্যাবলীও মনোদর্শনের আলোচনার পরিসরভুক্ত।

বাস্তবিকপক্ষে, মনোদর্শনের সমস্যাবলী আলোচনার দুটি দিক আছে। একটি হল (১) মানসিক প্রত্যয়সমূহের আধিবিদ্যক ব্যাখ্যার (metaphysic of mental concepts) দিক আর অপরটি অর্থবোধ থেকে বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে (২) মানসিক প্রত্যয়সমূহের যৌক্তিক ব্যাখ্যা (logic of mental concepts)। যদি আমরা সাধারণভাবে প্রশ্ন করি: চেতনা কাকে বলে? চেতনার প্রকৃতি কি? তাহলে, এরূপ প্রশ্ন আধিবিদ্যক ব্যাখ্যারই অন্তর্গত হবে। আর যদি বলি: চেতনার অস্তিত্ব বলতে কি বুঝায়? "ক-এর অস্তিত্ব আছে" এই উক্তির অর্থ কি? এসব প্রশ্ন মনোদর্শনের যৌক্তিক ব্যাখ্যার আওতাভুক্ত হয়ে পড়ে। মনোদর্শনের এরূপ ভূমিকার কারণেই সমকালীন দর্শনে মনোদর্শন বিশ্লেষণী দর্শন বা ভাষা-দর্শন (Analytical Philosophy or Philosophy of Language)-এর অঙ্গীভূত বলে বিবেচিত হয়।

মনোদর্শন সাধারণ দর্শনের একটি শাখা মাত্র। সুতরাং, দর্শনের অন্যান্য শাখা-প্রশাখার সঙ্গে মনোদর্শনের সম্বন্ধ থাকা একান্তই স্বাভাবিক। নীতিদর্শন নৈতিক অনুভূতি, উদ্দেশ্য, অভিপ্রায় প্রভৃতি মানসিক প্রক্রিয়া-বিষয়ক অবস্থাগুলোরও আলোচনা করে থাকে; জ্ঞান-তত্ত্ব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য

অভিজ্ঞতার এবং ধর্মদর্শন অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতাবিষয়ক আলোচনার উপর গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। মনোদর্শনে আলোচিত মানসিক ঘটনা বা মানসিক প্রক্রিয়া সমূহের সঙ্গে এসব বিষয়ের যে নিকট সম্পর্ক রয়েছে তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু তত্ত্ববিদ্যা বা অধিবিদ্যার (Metaphysics) সাথে মনোদর্শনের সম্পর্ক আরও নিবিড়। তার কারণ, মানসিক অবস্থা বা প্রক্রিয়াসমূহের স্বরূপ বা প্রকৃতি সংক্রান্ত প্রশ্নগুলো সত্তার (reality) অপরাপর অংশের সহিত সম্পর্কযুক্ত। অন্য কথায়, মানসিক ঘটনা বা প্রক্রিয়া সমূহের তাত্ত্বিক মর্যাদার সাথে মনোদর্শনের মৌলিক প্রশ্নগুলো নিগূঢ়ভাবে জড়িত। মনোদর্শনের সাথে অভিজ্ঞতামূলক মনোবিজ্ঞানের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, মনোদর্শন ও মনোবিজ্ঞান (Psychology)-এর আলোচনা এবং ক্রমোন্নতি বহুলাংশে পরস্পর নির্ভরশীল। চেতনা বিজড়িত বিভিন্ন মানসিক ঘটনা বা প্রক্রিয়ার আলোচনা মনোবিজ্ঞানের আওতাভুক্ত; চেতনার মানসিক প্রক্রিয়া হতে উদ্ভূত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়গুলোর অভিজ্ঞতামূলক অনুসন্ধানই হল মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। আর, মনোবিজ্ঞানে আলোচিত চেতনা, বিভিন্ন মানসিক ঘটনা বা মানসিক প্রক্রিয়া সম্পর্কিত প্রত্যয়সমূহের দার্শনিক তথা তাৎপর্যমূলক বিশ্লেষণই হল মনোদর্শনের কাজ। এ-কারণেই মনোদর্শন দার্শনিক মনোবিজ্ঞান (Philosophical Psychology) নামেও পরিচিত।

সূচীপত্র

১ উপক্রমণিকা — আত্মা; আত্মা সম্পর্কে কতিপয় ধারণা; আত্মা ও মন; মন; মানসিক ঘটনাবলীর প্রকারভেদ; অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে মনোদর্শনের সম্পর্ক; চেতনা কাকে বলে? মানসিক ঘটনাবলী সম্পর্কিত কতিপয় মতবাদ। পৃঃ ১--১৮

২ চেতনা — নাম-পুরুষ বিবরণ; নাম-পুরুষ বিবরণের সুবিধা; নাম-পুরুষ বিবরণের কতিপয় অসুবিধা; উত্তম-পুরুষ বিবরণ; অভিপ্রায়তত্ত্ব; ব্যক্তিগত নির্দেশক সংজ্ঞা; একটি আপত্তি; একটি আপোষমূলক সমাধান। পৃঃ ১৯--৪৭

৩ চেতনার কর্তা — দ্বৈতবাদ; প্রচলিত দেহ-মন সমস্যা; দ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ; জড়বাদ; অভিন্নতা তত্ত্বের কতকগুলো অসুবিধা; দ্বিমুখী তত্ত্ব; ব্যক্তি-তত্ত্ব; ব্যক্তি কাকে বলে? দ্বৈতবাদের পুনর্বিবেচনা। পৃঃ ৪৮--৮৫

৪ চেতনা ও দেহ — দ্বৈতবাদী তত্ত্বসমূহ; সমান্তরালবাদ; উপঘটনাবাদ; উপঘটনাবাদের আপাতবিরোধিতা; মনোদৈহিক পারস্পরিক ক্রিয়াবাদ; পরবর্তী জীবন; অধি-মনো-বৈজ্ঞানিক ঘটনা। পৃঃ ৮৬--১১০

৫ কাজ — কাজ সম্পর্কে কয়েকটি তত্ত্বঃ (১) কাজের কারণ হিসাবে মানসিক ঘটনা, (২) কর্তা-তত্ত্ব, (৩) সম্পাদনমূলক তত্ত্ব, (৪)কাজের ব্যাখ্যা হিসাবে লক্ষ্য ও (৫) কাজের প্রসঙ্গমূলক বিবরণ; যুক্তি ও কারণ; মানসিক কারণ তত্ত্বের পুনরালোচনা; স্বাধীন-ইচ্ছার সমস্যা। পৃঃ ১১১--৬০

১
উপক্রমণিকা

আত্মা

আমার ছেলেবেলায় স্কুল ছুটির পরবর্তী সময়ে আমাদের আলাপ-আলোচনার অন্যতম প্রধান বিষয় ছিল, মানুষের 'আত্মা' আছে কি নেই। কেউ কেউ এই বলে যুক্তি দিত যে, নিশ্চয়ই মানুষের আত্মা আছে; কারণ, আত্মা না থাকলে মানুষ ও প্রাণীতে পার্থক্য থাকত না। অন্যেরা দাবী করত যে, মানুষ অন্যান্য প্রাণী থেকে পৃথক 'নয়'; সুতরাং মানুষের আত্মা থাকলে প্রাণীর, এমন কি পোকা-মাকড়েরও, আত্মা থাকবে। তা ছাড়া, মৃত্যু ব্যাপারটাই বা কি? কোন ব্যক্তির যদি আত্মা না থাকত, তা হলে মৃত্যুতেই তার 'সবকিছু' শেষ হয়ে যেত। কিন্তু, এমন একটা সম্ভাবনার চিন্তাটাও ভয়ঙ্কর। সে যাই হোক, মৃত্যুতেই যদি জীবনের সব শেষ, তা হলে জীবনের কি-ই বা অর্থ থাকতে পারে? কিন্তু মানুষের কোন আত্মা যদি থেকেই থাকে, তা হলে তা দেখতে কেমন এবং তার অবস্থিতিই বা কোথায়? দেহের গঠনতন্ত্র (anatomy) সম্পর্কে আমরা যেটুকু জানতে পেরেছি তা থেকে এটা পরিষ্কার যে, কোন ব্যক্তিরদেহে অস্ত্রোপচারের সাহায্যে একজন শল্যচিকিৎসকের পক্ষে তার আত্মা আবিষ্কার করা এক অসম্ভব ব্যাপার। সুতরাং, মানুষের আত্মা যদি থেকেই থাকে, তা হলে তা কি? পুরো বিষয়টাই ছিল আমাদের কাছে খুবই রহস্যময়।

মানুষের চিন্তার ইতিহাসের সেই সুপ্রাচীন কাল হতেই এসব প্রশ্ন এবং সংশ্লিষ্ট সমস্যাবলী মানব-মনকে রহস্যাবৃত করে রেখেছে। আমরা জানি যে, পঁচিশ শত বছর আগেই প্রাচীন গ্রীসের অধিবাসীরা এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে চিন্তা-ভাবনা করেছেন। আর আমরা এ-ও জানি যে, তাদের উত্থাপিত অনেক মৌল প্রশ্নের উত্তর আজও পাওয়া যায় নি। নিজেকে, নিজের জগৎকে এবং জগতে নিজের অবস্থানকে বোঝার প্রচেষ্টায় মানুষ যেসব খুবই অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকে, এমন কতকগুলো সমস্যাই সেসব মৌল প্রশ্নের আলোচ্য বিষয়।

এ ধরনের কতিপয় প্রশ্ন সম্পর্কে অনুসন্ধান চালানো এবং সেগুলোর উত্তর লাভের প্রচেষ্টায় কতটা অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তা পর্যালোচনা করাই হচ্ছে এই গ্রন্থের লক্ষ্য।

আত্মা সম্পর্কে কতিপয় ধারণা

আত্মা জিনিসটা কি? এ ধারণাটির ইতিহাস সুদীর্ঘ। প্রাচীন ইহুদীরা (Hebrews) ছিল এই ধারণার আদি প্রণয়নকারী জাতিদের অন্যতম। তারা মনে করতেন, আত্মা দেহেরই অন্তর্গত এমন একটা-কিছু যার দরুন দেহ 'জীবন্ত' (alive) হয়েছে, যা একে মৃত বস্তু না করে একটি জীবিত বস্তুতে পরিণত করেছে। আত্মার উল্লেখ করতে গিয়ে তারা "নিঃশ্বাস" (breath) কথাটির হিব্রু প্রতিশব্দ ব্যবহার করেছিলেন সম্ভবতঃ এই কারণে যে, নিঃশ্বাস 'জীবন'-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ। এই প্রাণ-সঞ্চারকারী শক্তি (animating force) রক্তের মধ্যে থাকে বলে বিশ্বাস করা হত।

প্রাচীন গ্রীকেরা একটি নতুন বৈশিষ্ট্যের সংযোজন করেছিলেন। তাদের মতে, আত্মা দেহ থেকে পৃথক এবং দেহের ধ্বংসের পরও এর অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকে। ইহুদীরা মৃত্যু বলতে প্রাণ ও প্রাণ-সঞ্চারকারী শক্তি তথা আত্মার পরিসমাপ্তি ছাড়া আর কিছুকেই বুঝতেন না। গ্রীকদের মতে, মৃত্যুর অর্থ হল দেহ হতে প্রাণ-সঞ্চারকারী শক্তির 'প্রত্যাহার' (withdrawal)। গ্রীকদের মধ্যে কেউ কেউ, যেমন পিথাগোরীয়গণ [Pythagoreans] (তাঁরা গাণিতিক আবিষ্কারের জন্য বিখ্যাত ছিলেন), বিশ্বাস করতেন যে, একটি দেহ হতে প্রস্থানের পর আত্মা অপর একটি দেহে প্রবেশ করে; একে দেহান্তরপ্রাপ্তি (transmigration) বলা হয়। পিথাগোরীয়গণ বিশ্বাস করতেন যে, জীবন ধারণের ক্ষমতা রয়েছে এমন যে-কোন দেহ আত্মার বাসস্থান হিসাবে কাজ করতে পারে, এবং তাঁরা এও বিশ্বাস করতেন যে, সামান্য 'শিম' (bean) হল আত্মার প্রতি বিশেষ গ্রহণশীল (receptive) একটি বাসস্থান। এ কথা অবশ্যই বলতে হবে যে, শিমের প্রতি তাঁদের এরূপ সম্মান দেখানোর 'কারণগুলো' খুব জোরালো ছিল না; যেমন, উদগমোন্মুখ শিমের অঙ্কুর মানব-ভ্রূণের মত দেখায়, এবং রোদে-রাখা পেষা শিমের বীচি মানব-বীজের মত গন্ধ দেয়।

যদিও এ পর্যন্ত আমরা দেহ থেকে আত্মার পার্থক্যের এবং দেহ থেকে অপর একটি দেহে আত্মার দেহান্তরের ক্ষমতার ধারণা পেয়েছি, তবুও আত্মার স্বাভাবিক বাসস্থান যে কোন 'দেহ', এ ধারণা আমাদের মধ্যে এখনও বিদ্যমান রয়েছে। প্লেটোর লেখাগুলোতেই আমরা প্রথম এ কথার পরিষ্কার উল্লেখ দেখতে পাই যে, আত্মা এমন একটি জিনিস যা কোন দেহ ছাড়াই পৃথকভাবে অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে। বাস্তবিকপক্ষে, প্লেটোর মতে দেহহীন অস্তিত্ব হল আত্মার এমন একটি আদর্শ অবস্থা, যাতে আত্মা দেহের "বন্দীদশা"

("prison") থেকে মুক্ত হয়ে চিরকালের জন্য শাশ্বত ও পরম সত্তাগুলোর (Realities) মধ্যে বাস করতে পারে।

প্লেটোর ছাত্র এ্যারিস্টটল আত্মা সম্পর্কে প্লেটোর ধারণার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিকল্প মতবাদটি প্রদান করেন। দেহ থেকে পৃথক সত্তা হিসাবে আত্মার ধারণাকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং আত্মাকে তিনি দেহেরই সংগঠন ও কার্য হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন; অথবা, তাঁর ভাষায়, আত্মা হল সজীব মানব-দেহের "আকার" ("form")। যেহেতু দেহকে বাদ দিয়ে সেই দেহের আকার পাওয়া যেতে পারে না, সেজন্যই দেহহীন আত্মার অস্তিত্ব সম্ভব নয়।

আত্মা ও মন

"আত্মা" কথাটির যে বহুল প্রচলন পূর্বে ছিল এখন আর তা নেই, এবং কেবল আমাদের প্রাত্যহিক জীবনেই যে একথা সত্য তা নয়, মনোবিজ্ঞান ও দর্শনের ন্যায় পেশাগত (technical) বিষয়ের ক্ষেত্রেও এটি সত্য। এর কতকগুলো কারণ রয়েছে। প্রথমতঃ "আত্মা" কথাটিকে এক প্রকার ভৌত (physical) বস্তু বলে উল্লেখ করার প্রবৃত্তি বরাবরই ছিল; এটি যেন এক রকমের অতি সূক্ষ্ম গ্যাস, যেন একটি ঝিকিমিকি আলোকযুক্ত গোলক বিশেষ, যেন একটি হীরক-পিণ্ড। আজও এমন কিছু জাতি রয়েছে যারা আত্মার স্বচ্ছন্দ নির্গমনের জন্য মুমূর্ষু ব্যক্তির দেহের কাছাকাছি জানালা খোলা রাখার নিশ্চিত ব্যবস্থা রাখে। কিন্তু মানব দেহ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানবৃদ্ধির ফলে আমাদের দেহের ভেতরে এরূপ কোন ভৌত সত্তার অস্তিত্বের কথা সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ, "আত্মা" কথাটি বিশেষ কতকগুলো ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গে; বিশেষ করে স্বর্গীয় বা নারকীয় পরজীবনে বাস করতে পারে এমন একটি অবিনশ্বর আত্মার ধারণার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। এখানে কোন 'নশ্বর' (mortal) আত্মার কথা বলা হবে প্রায় সরাসরি বিরোধী উক্তির সামিল। যেহেতু, এসব ধারণা এখন আর এমন সাধারণ বিশ্বাস-সমূহের অন্তর্ভুক্ত নয় যেগুলো আমরা বিনা প্রশ্নেই মেনে নিই, সে-কারণেই আমাদের প্রবণতা হল কিছুটা ধর্মীয় অর্থজ্ঞাপক "আত্মা" কথাটির ব্যবহার পরিহার করা। পরিশেষে, "আত্মা" কথা দুটি প্রায় ভিন্নধর্মী ধারণাকে একত্রিত করেঃ সাধারণভাবে একটি 'সজীব' বস্তুর ধারণা, এবং এমন একটি 'বিশেষ শ্রেণীর' সজীব বস্তুর ধারণা, যা চিন্তাশক্তিসম্পন্ন এবং সম্ভবতঃ

নৈতিকভাবে সচেতন বা আধ্যাত্মিকভাবে সংবেদনশীল। নিম্নতর ও উচ্চতর পর্যায়ের সজীব বস্তুর মধ্যবর্তী বিরাট পার্থক্যসমূহ লক্ষ্য করার ফলেই আত্মা সম্পর্কে এই ধারণাগুলোর পার্থক্য নির্ণয়ের বিষয়টি ক্রমশঃ অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এসব কারণে এমন একটি শব্দের ব্যবহার অধিকতর বাঞ্ছনীয় যা আত্মার অমরত্ব অথবা জড়ত্বের অর্থ প্রকাশ করে না, এবং যা বুদ্ধিসম্পন্ন জীবকে অপরাপর সজীব বস্তু থেকে পৃথক করতে সহায়ক হবে। সম্প্রতি, "আত্মার" পরিবর্তে যে কথাটি সচরাচর ব্যবহৃত হয়ে থাকে তা হল "মন"। এ কারণেই এই গ্রন্থের এবং এতে আলোচিত বিষয়বস্তুর শিরোনাম এ রকম হয়েছে।

মন

আত্মাকে যেমন একটি 'ভৌত বস্তু' (physical thing) হিসাবে চিন্তা করার প্রলোভন জাগে, মনকেও ঠিক তেমনি একটি অ-ভৌত শ্রেণীর 'বস্তু' হিসাবে কল্পনা করার লোভ হয়। কিন্তু এভাবে মনকে চিন্তা করার অর্থ হবে মন সম্পর্কে একটি অত্যন্ত বিতর্কমূলক দার্শনিক মতবাদ গ্রহণ করা। সরাসরিভাবে কোন বিতর্কমূলক মতবাদের পূর্বধারণা নিয়ে আমরা এ অনুসন্ধানের কাজ শুরু করতে চাই না। "দিনের বেলা" কথাটিকে আমরা যেমন কোন বস্তু (object) হিসাবে কল্পনা না করেই ব্যবহার করতে পারি, তেমনি মনকেও একটা বস্তু হিসাবে চিন্তা না করে "মন" কথাটা ব্যবহার করতে পারি। কিন্তু এই কথাটি দ্বারা আমরা কি বুঝব?

"মন" কথাটি আমাদের ভাষায় কিভাবে ব্যবহৃত হয় তা বিবেচনা করা যাক। কারো মনের পরিবর্তনের কথা, কারো মনের কথা বলা, কারো মন হারিয়ে ফেলা, কোন কিছুকে মনের মধ্যে রাখা, কোন কিছু করতে মনস্থ করা, আধমনা হয়ে কাজ করা, কোন কাজ করতে মন দ্বিধা-বিভক্ত হওয়া —এসব আমরা বলে থাকি। কোন ব্যক্তি বলিষ্ঠ-মনা, কঠিন-মনা, দুর্বলমনা অথবা ক্ষীণ-মনা হতে পারে। কেউ খোলা-মন, ক্রীড়া-মনা, এক-মনা বিশুদ্ধ-মনা, উচ্চ-মনা, সরল-মনা অথবা কু-মনা হতে পারে। এসব নানাবিধ কথার মধ্যে আমরা কি কোন গূঢ় অর্থ অথবা সাধারণ বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়ার আশা কখনো করতে পারি?

ক্রিয়া হিসাবে "মন' কথাটির ব্যবহারের কতিপয় পদ্ধতি বিবেচনা করলে এ বিষয়ে অগ্রগতি সাধিত হতে পারেঃ

আমি বাইরে থাকলে শিশুটির দিকে অনুগ্রহ করে 'মন দিবেন' (দেখাশুনা করা, যত্ন লওয়া)। নীচু ছাদটির কথা 'মনে রাখবেন' (লক্ষ্য করা, সতর্ক হওয়া)। সে কি তার পিতামাতার প্রতি 'মন দেয়' (বাধ্য হওয়া)? তোমার নিজের কাজে 'মন দাও' (কোন কিছুতে মনোনিবেশ করা)। তোমার আচার-আচরণে 'মন দিও' (মনোযোগ দেওয়া)। তোমাকে কেউ নাচতে বলেনি বলে তুমি কি কিছু 'মনে করেছিলে' (ক্ষুণ্ণ হওয়া)?

যদিও বন্ধনীতে প্রদত্ত বিশেষ অর্থগুলো থেকে বোঝা যায় যে, মন কথাটির এসব প্রয়োগের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে, তবুও সেগুলোর মধ্যে একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে বলে মনে হয়। সেটা হচ্ছে কোন কিছু সম্পর্কে সচেতন অথবা সজাগ হওয়া শ্রবণ করা বা মনোযোগ দেওয়া, কোন কিছুর উপর বিশেষ নজর রাখা। এই সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল 'চেতনা' (consciousness), যাকে 'মন' প্রত্যয়টির একটি কেন্দ্রীয় উপাদান বলা যেতে পারে।

মনোদর্শন নামে অভিহিত দর্শনের শাখাটির একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্যের কথা যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, তা হলে আমরা বলতে পারি যে, এটি দর্শনের সেই শাখা যা বিশেষভাবে চেতনার স্বরূপ, কোন্ কোন্ ধরনের বস্তু সচেতন বা চেতনাক্ষম, এবং 'কেবল' চেতনাক্ষম জীব যেসব ঘটনার নিয়ন্ত্রণাধীন এমনসব ঘটনা (আমরা তাদের "মানসিক ঘটনা" [mental phenomena] বলি) নিয়ে আলোচনা করে। মানসিক ঘটনাবলী, যেমন সচেতন হওয়ার বিভিন্ন ধারা (শ্রবণ করা, স্মরণ করা, কল্পনা করা, বিবেচনা করা, আশা করা) এখানে প্রাসঙ্গিক। অপরাপর মানসিক ঘটনাবলী হল সচেতন বস্তুর ঘটনাকালীন প্রক্রিয়া বা অবস্থাসমূহ; সুখবোধ করতে হলে, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হলে, সিদ্ধান্ত অনুমান করতে গেলে, কিংবা অসতর্কতাবশতঃ কোন কিছু করতে হলে একজনকে সচেতন হতেই হবে। অন্যগুলো হচ্ছে এমন সব প্রক্রিয়া যেগুলোতে এরূপ আগাম ধারণা নেই যে, ব্যক্তি ঘটনা-কালে সচেতন; তাদের মধ্যে আগাম ধারণাটা কেবল এই যে, ব্যক্তি কোন এক সময়ে সচেতন ছিল। কেবল একটি সচেতন জীব সম্পর্কেই আমরা বলতে পারি যে, সে এখন প্রায় অজ্ঞানাবস্থায় রয়েছে, কিংবা সে বিশ্বাস করে যে সব মানুষকে সমান করে সৃষ্টি করা হয়েছে, কিংবা সে কৃপণ অথবা সে ইউরোপে যেতে চায়।

এ কথাটাকে আমরা সব চেয়ে সাধারণ ভাষায় এভাবে বলতে পারি যে, মনোদর্শন সব মানসিক ঘটনা নিয়ে আলোচনা করে, যখন "মানসিক ঘটনা" বলতে এমনসব ঘটনাকে বোঝাবে যা শুধু চেতনাক্ষম জীবসমূহের সঙ্গে

সম্পর্কযুক্ত। (এ বর্ণনা থেকে বিষয়টা অবশ্য খুব পরিষ্কার হচ্ছে না, কারণ "চেতনা"কি সে কথাটা এখনও সুস্পষ্ট করে বলা হয়নি।)

মানসিক ঘটনাবলীর প্রকারভেদ

যদি আমরা বলতে পারতাম যে, সব মানসিক ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণযোগ্য কয়েকটি শ্রেণীতে (categories) ভাগ করা যায়, তাহলে সেটা বেশ কাজে লাগত। যেমন, এটা বলা হয়েছে যে, তিনটি মৌলিক শক্তি, যাদের "বৃত্তি" ("faculties") বলা হত, মন-এর তা রয়েছে; যথা, "জ্ঞানক্রিয়া" (জানা) ["cognition" knowing)], "অনুভবক্রিয়া" (অনুভূতি) ["affection" (feeling)] এবং "ইচ্ছাক্রিয়া" (ইচ্ছাকরা) ["volition" (willing)]; প্রতিটি মানসিক ঘটনাকে এই তিনটি বৃত্তির কার্য-প্রক্রিয়ার ফল বলে মনে করা হত।* এভাবে (আমরা ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষণ, স্মৃতি, অন্তর্দর্শন, স্বজ্ঞা, অনুমান এবং জানার অন্যান্য উৎসকে জ্ঞান-এর অন্তর্ভুক্ত হিসাবে পেতে পারতাম। অনুভূতির অন্তর্ভুক্ত হিসাবে আমরা পেতাম সংবেদন, আবেগ, মেজাজ, ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য এবং অনুভূতির অপরাপর অভিব্যক্তি। ইচ্ছাক্রিয়ার অধীনে পাওয়া যেত উদ্দেশ্য, কামনা, বিচার-বিবেচনা, সঙ্কল্প, পছন্দ, কঠোর প্রয়াস ও প্রচেষ্টা এবং ক্রিয়া---এসব উপাদানের সবগুলোই ইচ্ছা-ক্রিয়াকে প্রভাবিত ও প্রকাশিত করে থাকে।

বিভিন্ন মানসিক ঘটনার অস্তিত্ব 'ব্যাখ্যা'র জন্যই এ বৃত্তিগুলোকে স্বীকার করে নেয়া হয়েছিল। ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষণ, স্মৃতি, প্রভৃতিকে এদের গোপন প্রক্রিয়াগুলোর ফল হিসাবে ধারণা করা হয়েছিল। যা হোক, দেখা গিয়াছে যে, এই পূর্বস্বীকৃতির কোন ব্যাখ্যা প্রদানকারী শক্তিই নেই; কেননা যেসব মানসিক ঘটনা ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে এ বৃত্তিগুলোকে স্বীকার করা হয়েছিল, সে-ঘটনাগুলো ছাড়া বৃত্তিগুলোর অস্তিত্বের আর কোন প্রমাণই আমরা পাই না। এরা আমাদের নতুন মানসিক ঘটনাবলীর ইঙ্গিত দেয় না; পূর্ব-পরিচিত মানসিক ঘটনাবলী সম্পর্কেও এরা অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট ধারণা প্রদান করে না। এ কারণেই আধুনিক চিন্তায় মনের মৌলিক বৃত্তির ধারণা পরিত্যক্ত হয়েছে।

মানসিক ঘটনাবলীর 'শ্রেণীবিভাগ' হিসাবেও এই ত্রিবিধ বিভাগ তেমন কার্য-করী নয়। এমন-সব প্রক্রিয়াও রয়েছে যেগুলো সঠিকভাবে এই তিন শ্রেণীর কোনটিতেই পড়ে না। উদাহরণস্বরূপ, 'বিশ্বাস করা' (*believing*) কোন্ বৃত্তির অন্তর্ভুক্ত হবে? একে যদি আমরা জ্ঞানের শ্রেণীভুক্ত করি, তা হলে

* এর পর থেকে cognition, affection এবং volition-এর পারিভাষিক শব্দ হিসাবে যথাক্রমে জ্ঞান, অনুভূতি এবং ইচ্ছা-ও ব্যবহৃত হবে।

বিশ্বাস (faith), আস্থা (trust)), দৃঢ়-বিশ্বাস (confidence) প্রভৃতি যেসব প্রত্যয়ের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত তাদের আমরা কোন্ শ্রেণীতে ফেলব? দৃঢ়-বিশ্বাসের বা সন্দেহভঞ্জকতার বা নিশ্চয়তার 'অনুভূতি'-কে আমরা কোন্ শ্রেণীতে রাখব? অবিশ্বাস (disbelief), আস্থাহীনতা (distrust), সন্দেহ (suspicion) অথবা সংশয় (misgivings)—এদের সম্পর্কেই বা কি বলা যায়? কোন ইঙ্গিত (hunch), পূর্বাভাস (foreboding) অথবা কোন অমঙ্গলের পূর্ব-ধারণা (presentiment) পাওয়া কি জ্ঞান-এর অনুশীলন? কোন কিছু ঘটেছে বলে যদি আমি দুঃখবোধ করি, আমি কি তখন এরূপ দুটি অবস্থায় পড়ি যাদের একটি হল এই বিশ্বাস যে এটা ঘটেছে (জানা) এবং অপরটি হল দুঃখবোধ (অনুভূতি)? কিন্তু অংশ দুটি যে পৃথক ও স্বাধীন 'নয়', তা লক্ষ্য করা যায় যখন আমরা বিশ্বাসটাকে 'ছাড়া' দুঃখের অনুভূতিটাকে কল্পনা করার চেষ্টা করি। তদুপরি, কথিত দুঃখের অনুভূতিটা, কিছু যে ঘটেছে, শুধু সে-বিশ্বাসের সহগামী না হয়ে যদি এরূপ বিশ্বাসের সঙ্গেও যুক্ত থাকে যে, দুয়ে দুয়ে চারের সমান হয়, তাহলে কি আমি এজন্যও দুঃখবোধ করি যে, দুয়ে দুয়ে চারের সমান হয়? অধিকন্তু, কথিত দুঃখের অনুভূতিটি বিশ্বাস দ্বারা সংঘটিত হবেই, একথা যোগ করাও সহায়ক হবে না, কারণ, শিক্ষক যখন "জোন্স্" বলে ডাকেন, তখন আমার নাম যে জোন্স্ তাতে আমার দুঃখ না করা সত্ত্বেও আমার বিশ্বাস দ্বারা আমার দুঃখবোধ সংঘটিত হতে পারে। কিংবা, কিছু একটা যে ঘটবে তার 'খুবই তীব্র অনুভূতি'-কে কি কোন গভীর অনুভূতি বা প্রবলভাবে দাগ কাটা জ্ঞানের কোন ঘটনা বলা যায়? কোন কিছু ভুল—এ ধরনের কোন 'অস্পষ্ট' অনুভূতি সম্পর্কেই বা কি বলা যায়? তা কি একটা অস্পষ্ট অনুভূতি বা অস্পষ্ট জ্ঞানের কোন ঘটনা? এই শ্রেণী বিভাগের আওতায় পড়ে না, এমন ঘটনাবলীর উদাহরণ দিতে গেলে গোটা বইটাই তাতে ভরে যাবে।

অধিকন্তু, খুবই ভিন্ন প্রকারের ঘটনাবলীকে আমরা একই শিরোনামে একত্রে মিশিয়ে ফেলেছি। উদাহরণস্বরূপ, ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত বর্তমান পারিপার্শ্বিক অবস্থাসমূহের জ্ঞান, স্মৃতির মাধ্যমে প্রাপ্ত অতীত সম্পর্কে জ্ঞান, অনুমানের সাহায্যে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জ্ঞান, অন্তর্দর্শনের মাধ্যমে মনের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান, এবং সিদ্ধান্তের মাধ্যমে অর্জিত আমাদের নিজস্ব ভবিষ্যৎ কর্ম সম্পর্কে জ্ঞান—এদের সবই জ্ঞান-এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এদের সবকটিকেই

এক জাতীয় ব্যাপার বলে ধরে নেয়া হবে নিতান্তই বিভ্রান্তিকর। কেননা, যেহেতু ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষণের জন্য আমাদের বিভিন্ন অঙ্গ (organ) রয়েছে, সেকারণেই স্মৃতির একটা অঙ্গ খুঁজে পাওয়ার জন্য আমরা (নিষ্ফল) অনুসন্ধান চালাতে পারি। যেহেতু, আমরা স্মৃতির মাধ্যমে আমাদের নিজস্ব অতীতকে জানি, কাজেই যে-ভবিষ্যৎ এখনও ঘটতে বাকী তাকে আমরা কিভাবে জানতে পারি সে-সম্পর্কে আমরা হতবুদ্ধি হয়ে যেতে পারি। যেহেতু ভবিষ্যৎকে আমরা জেনে থাকি শুধু প্রমাণের ভিত্তিতে, সে-কারণেই আমরা বিস্মিত হতে পারি এই ভেবে যে আমাদের এমন কি প্রমাণ আছে যার মাধ্যমে মনের নিজস্ব অবস্থাসমূহ আমরা জানতে পারি? এবং, যেহেতু অন্তর্দর্শনের সাহায্যে আমরা আমাদের নিজস্ব সিদ্ধান্তগুলো জানি, সেজন্যই, কি করব তা একবার যখন আমরা সিদ্ধান্ত করে ফেলেছি, তখন আমরা যা করতে চাই তার সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানকে হয় ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত থেকে গৃহীত কোন অনুমান হিসাবে, অথবা, তার চেয়েও মন্দভাবে, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোন অন্তর্দর্শন বলে ব্যাখ্যা করতে পারি। অনুরূপ জগাখিচুড়ির সৃষ্টি হবে, যদি আমরা অনুভূতি বা ইচ্ছার শিরোনামের অন্তর্গত ঘটনাবলীকে একই মৌলিক প্রকৃতির ঘটনা বলে বিবেচনা করি।

আসল বিষয়টি হল যে, জ্ঞান, অনুভূতি ও ইচ্ছা-সম্বলিত ত্রিবিধ বিভাগটি অথবা (নিরাপদে বলা যায়) কোন সাধারণ শ্রেণীবিন্যাসও "মনোদর্শন" নামটির অন্তর্গত বিষয়বস্তুর প্রতি সুবিচার করতে পারবে না। একথা বলার এই অর্থ নয় যে, মানসিক ঘটনাবলীর কোন শ্রেণীবিন্যাসই কার্যকর প্রমাণিত হবে না; তবে কোন নির্দিষ্ট শ্রেণীবিন্যাসের প্রচেষ্টা এড়ানোর দিকেই মনোদর্শনের বর্তমান ঝোঁক। এই বিষয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অত্যাধুনিক অবদানগুলো হল ওইসব ঘটনার মধ্যকার প্রয়োজনীয় 'পার্থক্যসমূহ' প্রদর্শন করা যা এতদিন পর্যন্ত একই শ্রেণীর ঘটনাবলী বলে গৃহীত হয়েছে। একটি উদাহরণ নেয়া যেতে পারে ঃ সুখ ও ব্যথাকে প্রায়ই শুধু পরিমাণগতভাবে পৃথক সংবেদনের একই পরিসরের দুটি বিরুদ্ধ প্রান্ত বলে ধারণা করা হয়। এভাবে, নীতি-দর্শনে বেনথামের মত উপযোগবাদিগণ (utilitarians) বিশ্বাস করতেন যে, একটা বিশেষ কাজ থেকে যে সুখ ও ব্যথা উৎপন্ন হয়, গাণিতিকভাবে ধনাত্মক পরিমাপগুলো (সুখ) ও ঋণাত্মক পরিমাপগুলো (ব্যথা) একত্র করে তার সমষ্টিগত পরিমাণ নির্ধারণ করা যায় এবং এভাবে সে কাজের মূল্যায়ন

করা চলে। গিলবার্ট রাইল[১] প্রভাবিত সমকালীন দার্শনিকগণ দেখিয়েছেন যে, যেখানে "ব্যথা" (pain) কথাটি একটি দৈহিক সংবেদনের নাম, "সুখ" (pleasure), বৈশিষ্ট্যগতভাবে, কোন সংবেদনের নামই নয়। নৌকা চালানোর ফলে যদি ব্যথা হয়, তখন তার দেহের কোথায় সে ব্যথা অনুভব করে এ কথা জিজ্ঞাসা করা অর্থ-বোধক হবে। কিন্তু কেউ যদি নৌকা চালানোর ক্রিয়া থেকে সুখ পায়, তখন 'কোথায়' সে সুখ অনুভব করে তা জিজ্ঞাসা করার কোন অর্থ হয় না। এখানে "সুখ" অর্থ "আনন্দ" (enjoyment) এবং এর বিপরীত কথাটি হল "সুখের অভাব" (displeasure), "ব্যথা" নয়। এ কারণেই মর্ষকাম (masochism) কোন অসংগতিকে প্রকাশ করে না, যদিও এটা অস্বাভাবিকতাকে প্রকাশ করে। যে ব্যক্তি ব্যথাকে সুখ-প্রদ মনে করে সে তাকে উপভোগ্যও মনে করে; তবে এর অর্থ এই নয় যে, সে ব্যথাকে 'ব্যথাদায়কের' বিপরীত বলে দেখতে পায়।

মানসিক ঘটনাবলীকে অনেকগুলো রাস্তার একটি বৃহৎ জাল-সদৃশ ব্যবস্থা (network) বলে কল্পনা করা যেতে পারে, যেখানে রাস্তাগুলো কোন কোন জায়গায় আড়াআড়িভাবে, একটি অংশতঃ অপরটির উপরে বা পরস্পর সমান্তরালভাবে থাকে, এবং অন্যান্য জায়গায় কেন্দ্রবিন্দু থেকে ক্রমশঃ দূর-পথে চলে যায়। এ ধরনের একটি ঘটনা-জালের মধ্যে এমন কিছু অঞ্চল থাকবে যেখানে অনেকগুলো রাস্তা গুচ্ছবদ্ধভাবে একই কেন্দ্রের দিকে গমন করে। সুতরাং জ্ঞান, অনুভূতি ও ইচ্ছার পূত ত্রিত্বকে (hallowed trinity) অনেকগুলো মানসিক ঘটনার এক-কেন্দ্রাভিমুখী হওয়ার প্রবণতা হিসাবে আমরা কল্পনা করতে পারি। জ্ঞানবৃত্তির কাছাকাছি চিন্তা ও বিশ্বাস, বোধশক্তি (understanding), কল্পনা, মনোনিবেশ এবং পর্যবেক্ষণ, প্রত্যক্ষণ, স্মরণ এবং জানার অন্যান্য ঘটনা, প্রভৃতি আমরা দেখতে পাই। অনুভূতির কাছাকাছি রয়েছে দৈহিক সংবেদন, অনুভূতি, আবেগ, মেজাজ, এবং মনের সাময়িক অবস্থা (frame of mind)। আর ইচ্ছা হল কামনা, উদ্দেশ্য, সঙ্কল্প, অভিপ্রায়, পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টা, ক্রিয়া, ভণ্ডামি, এবং আচরণের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের অন্তর্গত। (এসব অধিকতর বিস্তৃত ঘটনাবলীকে পৃথক পৃথক রাস্তা মনে না করে সেগুলোকেই ঘটনা-জাল হিসাবে চিন্তা করা

---

১ *The Concept of Mind* (New York : Barnes and Noble, 1949 ; Penguin paperback, 1963), ৪র্থ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৬ ; *Proceedings of the Aristotelian Society*-র সম্পূরক খণ্ড ২৮ (১৯৫৪)-এ "Pleasure" শীর্ষক সিম্পোজিয়ামে রাইলের লেখাটিও দেখুন।

উচিত)। যদিও এ জাতীয় সব ঘটনা পরীক্ষা করা (মনোদর্শনের পূর্ণাঙ্গ আলোচনাতেই কেবল তা সম্ভব) এই গ্রন্থের আওতা থেকে অনেক দূরের ব্যাপার, তবুও এসব প্রত্যয়ের কতকগুলোকে নিয়ে আমরা আলোচনা করব, এবং বিশেষ করে, পঞ্চম অধ্যায়ে অভিপ্রায়, ক্রিয়া এবং তৎসংশ্লিষ্ট প্রত্যয় সম্পর্কিত কিছু সমস্যার প্রতি আমরা মনোনিবেশ করব।

অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে মনোদর্শনের সম্পর্ক

ঘটনা-জালের উপমাটি শুধু মানসিক ঘটনাবলীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, বরং মনোদর্শনের নিজস্ব ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য হবে, কারণ তা অনুসন্ধানের অন্যান্য ক্ষেত্রের সঙ্গেও সম্পর্কিত। দর্শনের অন্যান্য ক্ষেত্রের সঙ্গে বহু জায়গায় মনোদর্শনের প্রতিচ্ছেদ সংঘটিত হয় (crisscrosses)। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, যেহেতু কলা-দর্শন সৌন্দর্য-বিষয়ক 'অভিজ্ঞতা', নীতি দর্শন নৈতিক 'অনুভূতি', জ্ঞান-তত্ত্ব ইন্দ্রিয়-'অভিজ্ঞতা', আইন-দর্শন 'উদ্দেশ্যে' ও 'অভিপ্রায়' এবং ধর্ম-দর্শন স্বজ্ঞাভিত্তিক 'অভিজ্ঞতা' নিয়ে আলোচনা করে, সে-কারণে মনোদর্শনের সঙ্গে এরা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এছাড়া আরও অনেক ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে এদের একটির সঙ্গে অপরটির প্রতিচ্ছেদ সংঘটিত হয়। কিন্তু বোধ হয় তত্ত্ববিদ্যার সাথেই মনোদর্শনের আলোচনা অধিকাংশ সময় অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হয়ে পড়ে, কারণ মনোদর্শনের সবচেয়ে মৌলিক প্রশ্নসমূহ সত্তার অপরাপর অংশের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত মানসিক ঘটনাবলীর মর্যাদা ও প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করে; অর্থাৎ, সে-গুলোর আলোচনা মানসিক ঘটনাবলীর 'তাত্ত্বিক' মর্যাদা সম্পর্কিত। পুরোপুরি না হলেও, এসব প্রশ্নই বর্তমান বইটিতে আলোচনায় প্রাধান্য পেয়েছে।

মনোদর্শন, যা আজকাল প্রায়ই দার্শনিক মনোবিজ্ঞান (Philosophical Psychology) নামে অভিহিত হয়, তার সঙ্গে অভিজ্ঞতামূলক বিজ্ঞান হিসাবে মনোবিজ্ঞান কিভাবে সম্পর্কযুক্ত? পূর্বোক্ত বিষয়টির প্রধান কাজ হল চেতনার এবং বিশেষ মানসিক ঘটনাবলীর 'প্রত্যয়গুলোর বিশ্লেষণ'। শেষোক্ত বিষয়টির প্রধান কাজ হল প্রত্যয়গুলোরই ধারণামূলক বিশ্লেষণের চেয়ে ঐ প্রত্যয়গুলো যে-'ঘটনাবলীর' উল্লেখ করে সে-গুলোর 'অভিজ্ঞতামূলক অনুসন্ধান'। উদাহরণ হিসাবে স্মৃতি কথাটি লওয়া যাক ঃ দার্শনিক প্রশ্ন করেন—একজন লোক যখন বলে যে, সে কোন কিছু মনে রাখতে পারে অথবা সে কোন কিছু ভুলে যায়, তখন এতে কি 'বোঝায়', মনে রাখার 'ধারণা' এবং ভুলে যাওয়ার 'ধারণা' কিভাবে সম্পর্কিত, অতীতকে

জানা, শেখা এবং এরূপ অন্যান্য 'ধারণা'-র সঙ্গে এদের উভয়ই কিভাবে সম্পর্কিত। অপরপক্ষে, স্মৃতির 'ঘটনাবলী', কোন ব্যক্তি কোন কিছুকে যেসব বাস্তব ক্ষেত্রে স্মরণ করে বা ভুলে যায়, কোন্ কোন্ পরিস্থিতিতে কোন্ জিনিসকে ভালভাবে মনে রাখা যায় কিংবা সহজেই ভুলে যাওয়া হয়, স্মৃতির উপর বয়স, প্রচেষ্টা এবং পুরস্কারের প্রভাব, ইত্যাদি নিয়ে মনোবিজ্ঞানী আলোচনা করে থাকেন। এর অর্থ এই নয় যে, দুটি বিষয়ের মধ্যে কোনই সম্পর্ক নেই। যে কোন প্রত্যয়কে বুঝতে হলে প্রয়োজন কতকগুলো অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ জ্ঞান। আর, কোন্ জিনিসের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে তার কিছু ধারণা, অর্থাৎ, "স্মৃতি" কথাটি দ্বারা কি বোঝায়, স্মৃতির স্বরূপ কি, এসব সম্পর্কে কিছু ধারণা না থাকলে কেউ কখনও বাহ্যিকভাবে স্মৃতির ঘটনাবলীকে অনুসন্ধান করতে পারে না। সুতরাং, এ দুটি বিষয়ের অগ্রগতি তখনই সাধিত হবে যখন এদের সঙ্গে যাঁরা পেশাগতভাবে জড়িত (practitioners) তাঁদের একে অন্যের ফলাফলের সাথে পরিচিত হয়ে কাজ করবেন।

চেতনা কাকে বলে?

চেতনা (পৃঃ ৫ দ্রষ্টব্য) মনোদর্শনের গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয়, একথা বলে আমরা খুব বেশী দূর অগ্রসর হতে পারি না। কারণ এই চেতনা কি তা এখনও আমাদের বলার বাকী রয়েছে। চেতনা সম্পর্কে যা বলা যায় তার একটি হল এই ঃ এটি এমন একটি জিনিস যা মানুষকে তার চারিপাশের জগতের আরও অনেক কিছু থেকে পৃথক করে। যদিও কিছু কিছু উচ্চতর প্রাণীও চেতনাসম্পন্ন, তবুও একথা সত্য যে, চেতনা একটি বিরল ব্যাপার, এবং পৃথিবীর উপরিভাগের বিরাট অংশে, পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগের বেশীরভাগ জায়গায়, এবং পৃথিবীর চারিদিকের বিশাল এলাকাগুলোর অধিকাংশ স্থানেই যখন আমরা এর অনুপস্থিতির কথা চিন্তা করি তখনই তা বোঝা যায়। যদি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিরাট এলাকার অন্যান্য জায়গায় চেতনার আবির্ভাব ঘটত, তা হলে এটি কোন বিস্ময়ের ব্যাপার হত না। তবে যেখানেই এর আবির্ভাব ঘটুক না কেন, অস্তিত্বশীল বস্তুসমূহের এক ক্ষুদ্রাংশই (a minuscule proportion) হয়ত এর অধিকারী হয়। কেবল মাত্র যা জীবিত তা-ই চেতনার অধিকারী হয়; মৃত জিনিস যা একসময় জ্যান্ত ছিল কিংবা কোন অজৈব পদার্থ যা আদৌ জীবিত ছিল না, তা চেতনার অধিকারী হতে পারে না। আর, জীবিতদের মধ্যেও উদ্ভিদ কিংবা নিম্নশ্রেণীর প্রাণীর

মধ্যে চেতনা পরিদৃষ্ট হয় না; যেমন, এ্যামিবার (amoebae) যে চেতনা আছে তা মনে হয় না। উচ্চ থেকে উচ্চতর জীবিত প্রাণীদের দিকে যতই আমরা অগ্রসর হই, ততোই তা বলা আরও কঠিন হয়ে পড়ে। জেলি-ফিশ? ঝিনুক? কুকুর? পিপীলিকা? মাছি? বাদুড়? গোল্ড-ফিশ? ব্যাঙ? সাপ? গরু? পেঁচা? বাঘ? শিম্পাঞ্জী? যাদের চেতনা আছে এবং যাদের নেই, এই দুইয়ের ভেতর পার্থক্যের কোন সীমারেখা আমরা টানতে পারি কি? সম্ভবতঃ না।

অজৈব পদার্থ সুস্পষ্টভাবে চেতনাশূন্য, এবং চেতনাহীন ও চেতনাসম্পন্ন জীবের মধ্যে কোন সীমারেখা টানা যায় না—এ থেকে কোন কোন দার্শনিক সিদ্ধান্ত টেনেছেন যে, মানুষসহ অন্যান্য উচ্চশ্রেণীর প্রাণীরাও চেতনাসম্পন্ন নয়। মানুষ চেতনাসম্পন্ন এবং আমরা কোন সীমা রেখা টানতে পারি না—এ থেকে অন্যান্য দার্শনিক আবার সিদ্ধান্ত করেন যে, অজৈব শ্রেণীর পদার্থ সমূহও চেতনাসম্পন্ন। যাই হোক, উভয় যুক্তিই ভ্রমাত্মক। এই যুক্তিটা যেন অনেকটা এ রকম—বর্ণালীর কোথায় নীলের শেষ এবং কোথায় সবুজের আরম্ভ এই দুইয়ের মাঝখানে আমরা: কান সীমারেখা টানতে পারি না; সুতরাং বর্ণালীর গোটা নীল-সবুজ অংশ প্রকৃতপক্ষে একদিকে নীল অথবা প্রকৃত পক্ষে অপরদিকে সবুজ। আমরা যে কোন নির্দিষ্ট সীমারেখা টানতে পারি না, তার অর্থ এই নয় যে দুই প্রান্ত-সীমার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। অচেতন ও চেতন পদার্থের মধ্যে যে একটি পার্থক্য রয়েছে তা অনস্বীকার্য সত্য এবং তা-ই আমাদের অনুসন্ধানের প্রারম্ভিক বিষয়।

"চেতনা কি?", এ প্রশ্ন থেকেই আমাদের অনুসন্ধানের শুরু। মানুষের নিশ্চয়ই যা আছে, পাহাড় ও এ্যামিবার নিশ্চিতভাবে যা নেই, এবং যা সাপ ও ব্যাঙের সম্ভবতঃ আছে—এমন জিনিসটি কি?

এই প্রশ্নের উত্তরের চেষ্টা করতে গিয়ে আমরা চেতনার একটি বাস্তব উদাহরণের পরীক্ষার মাধ্যমে শুরু করতে পারি এবং কি ঘটছে তা লক্ষ্য করা যায় কিনা দেখতে চাই। এই পৃষ্ঠার উপরকার কোনকিছু, যেমন, কোন শব্দের দিকে তাকান, এবং নিজেকে এর আকার ও প্রকৃতি সম্পর্কে সচেতন রাখুন। এর পর লক্ষ্য করতে চেষ্টা করুন ওই শব্দ সম্বন্ধে আপনার 'চেতনা' কি। আপনি কি পেলেন? হয়ত আপনি দেখবেন যে, আপনি যা লক্ষ্য করলেন তা হল কাগজের উপরকার 'শব্দ' মাত্র, কাগজের উপরকার শব্দের 'চেতনা' নয়। যেমন জি, ই, ম্যুর (G.E. Moore) লিখেছেন (একটি নীল রঙের পোঁচকে চেতনার বস্তু হিসাবে ব্যবহার করে): "চেতনার উপর যে মুহূর্তে আমরা মনোযোগ

স্থাপনের চেষ্টা করি এবং তা স্পষ্টতঃ 'কি' দেখতে প্রয়াস পাই, তখনই তা যেন অদৃশ্য হয়ে যায়ঃ মনে হয় যেন আমাদের সামনে শুধু শূন্যতা বিরাজমান। যখন নীল-রঙের সংবেদনটি অন্তর্দর্শন করার প্রয়াস পাই, তখন যা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় তা হল নীল রঙটি, অপর উপাদানটি হল একটা স্বচ্ছ কিছু।"[১] আমার মনে হয়, আমরা যখন এ ধরনের পরীক্ষণের চেষ্টা করি, তখন আমাদের অনেকের বেলায়ই এরূপ ঘটবে। অবশ্য, তবুও আমরা বেশ ভালভাবেই জানি যে, পৃষ্ঠার উপরকার শব্দটি সম্পর্কে আমরা চেতনাশীল। তা হলে এই চেতনাটি কি?

ঊনবিংশ শতাব্দীর মনোবিজ্ঞানী জি, টি, ল্যাড (G. T. Ladd) চেতনাকে এভাবে বিশেষিত করেছেনঃ "আমরা যখন মাথায় প্রবল আঘাত পাই কিংবা গভীর এবং সম্পূর্ণরূপে স্বপ্নবিহীন নিদ্রায় মগ্ন থাকার পরিবর্তে জেগে থাকি, তখন আমরা যে-অবস্থায় থাকি 'তা'-ই হল চেতনাবস্থা। ক্রমশঃ স্বপ্নবিহীন নিদ্রাভিভূত অবস্থায় পতিত হলে অথবা ধীরে ধীরে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললে আমাদের যা ক্রমশঃ হ্রাস পায়ঃ এবং বাইরের ভীড়ের সোরগোলে আমাদের দিনের খাওয়ার পরের ঘুম হঠাৎ ভাঙ্গলে অথবা টাইফয়েড জ্বরের মধ্যরাত্রির সংকটাবস্থা থেকে আমরা যখন মুক্ত হতে থাকি তখন আমাদের যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়, 'তা'-কেই আমরা সচেতন হওয়া বলি।"[২]

চেতনা কি জিনিস তা বলা যে আমাদের পক্ষে খুব কঠিন তার কারণ, 'বিভিন্ন প্রকারের' এত ঘটনা রয়েছে যে-গুলোকে আপাত দৃষ্টিতে যুক্তিপূর্ণভাবে চেতনার অন্তর্ভুক্ত বলা যায় এবং এদের প্রত্যেক প্রকারের মধ্যে আবার খুব জটিলতাও দেখতে পাওয়া যায়। যেমন, কেউ একথা বলতে চাইবেনা যে, পাথরের বিশ্বাস থাকতে পারে; কেবল সচেতন জীবেরই বিশ্বাস থাকতে পারে। তবুও আমি যখন গভীর ও স্বপ্নবিহীন নিদ্রা-মগ্ন হয়ে পড়ি, তখন কি আমার বিশ্বাসের বিলুপ্তি ঘটে? আমি কি প্রতি রাত্রেই আমার বিশ্বাসগুলো হারাই এবং ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আবার সে-গুলো ফিরে পাই? অবশ্যই না। এবং এমন-কি যখন আমি জাগরিত ও সম্পূর্ণ সচেতনাবস্থায় থাকি, তখনও আমি আমার বিশ্বাসগুলো সম্পর্কে সজাগ না-ও থাকতে পারি। বাস্তবিক পক্ষে, এমন কতকগুলো বিশ্বাস থাকতে পারে যা আমি পোষণ করি ;-

---

১ G. E. Moore, *Philosophical Studies* (London : Routlege & Kegan Paul, Ltd., 1922), P. 25.

২ *Psychology, Descriptive and Explanatory* (1894), p. 30.

কিন্তু সে-গুলো সম্বন্ধে 'কখনও' সচেতন নই, আমার সমগ্র জীবনেও হয়ত সে-গুলো সম্পর্কে কখনও আমি সচেতন হব না। পীড়িত হলে কোন ব্যক্তি নিজের সম্পর্কে লজ্জাবোধ করতে পারে, কিন্তু সে কখনও বুঝে না যে তার এই লজ্জিত হওয়ার কারণ হচ্ছেঃ সে বিশ্বাস করে, পীড়িত হওয়া থেকে বোঝা যায় যে, সে 'নিকৃষ্ট'। এখন, বিশ্বাস-ক্রিয়া ও সামান্য-নয়-এমন ব্যথায় পতিত হওয়ার বৈপরীত্যটা লক্ষ্য করা যাক। এই ব্যথার সঙ্গেও চেতনা জড়িত, একটি পাথর-খণ্ড ব্যথা অনুভব করতে পারে না। কিন্তু তবুও গভীর ও স্বপ্নবিহীন নিদ্রামগ্ন কোন ব্যক্তি যে ব্যথায় পতিত তা বলার কোন অর্থ হবে না, আর একথা বলারও অর্থ হবে না যে, সারাজীবন এক ব্যক্তির এমন ব্যথা ছিল যা সামান্য নয়, অথচ সে-সম্পর্কে সে 'কখনও' সচেতন ছিল না। বিশ্বাস ও সংবেদন এই উভয়কে চেতনার ঘটনা হিসাবে ধরে নিয়ে, একজন কেন ভাববে যে বিশ্বাস ও সংবেদন এ দুটিরই কোন সাধারণ "সচেতন" উপাদান রয়েছে? ওই সাধারণ উপাদানটি কি সে বিষয়ে কেউ কিছু বলতে চেষ্টা করলে, সে যে হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে তাতে বিস্মিত হবার কিছুই নেই। স্বপ্নের কথা আলোচনা করা যাক। একজন ব্যক্তি সম্পূর্ণ নিশ্চলভাবে শুয়ে থাকতে পারে, এমন যে তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার দিকে কোনই ভ্রূক্ষেপ নেই এবং চেতনার কোন লক্ষণই সে দেখাচ্ছে না, কিন্তু তবুও সে কতকগুলো অত্যন্ত স্পষ্ট স্বাপ্নিক প্রতিচ্ছবি (dream-imagery) পেতে পারে। শিকার করার ন্যায় কোন কার্যে মনোনিবেশের সাথে চেতনার এরূপ অভিব্যক্তির বৈপরীত্য লক্ষ করা যাক। এখানে ব্যক্তি তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ এবং প্রতিটি পরিবর্তনের প্রতি সে সংবেদনশীল। এখানকার "সাধারণ" উপাদান সম্পর্কে কি বলা যায়? অথবা, মনের অবস্থাসমূহের কথা আলোচনা করা যাক। যে-ব্যক্তি কোন বিষয়ে নিবিষ্টচিত্ত সে তখন চিন্তায়, দিবা-স্বপ্নে (daydreams), জাগ্রত-স্বপ্নে (reveries) নিজেকে হারিয়ে ফেলতে পারে; যে-ব্যক্তি উত্তেজিত, সে দ্রুত ও অসলগ্ন ভাবে চলাফেরা করতে থাকে। এদের একটির সারধর্ম আভ্যন্তরীণ ঘটনাবলীর এবং অপরটির সারধর্ম বাহ্যিক ঘটনাবলীর অন্তর্গত বলে মনে হয়। আমরা এখানে কোন তাৎপর্যপূর্ণ সাধারণ নির্ধারক (denominator) পাওয়ার আশা করতে পারি কি?

জটিলতার কথা বলতে গেলে, এমন প্রত্যয় খুব কমই আছে যেগুলোতে বিশুদ্ধ মানসিক ঘটনাবলী পৃথকভাবে ধরা পড়ে। স্মৃতির কথা বিবেচনা করা যাক। একটি পাথর-খণ্ডের বেলায় অনেক কিছু সংঘটিত হতে পারে,

কিন্তু এর বেলায় যা ঘটল পাথর তা 'মনে রাখতে' পারে না (যদিও এর বেলায় যা ঘটল সে-চিহ্নগুলো পাথর বহন করতে পারে)। কিন্তু কোন কিছুকে স্মরণ করা কোন নিছক মানসিক অবস্থায় থাকার চেয়ে ঢের বেশী জটিল। এমন কি যেখানে কোন মানসিক অবস্থা উপস্থিত—যেমন কারুর পূর্বেকার বাড়ীটির কোন প্রতিরূপ (image)—সেখানেও সে-অবস্থা স্মৃতি বলে কথিত হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট নয়। একটি ব্যক্তির কিছু 'বিশ্বাস' থাকতেই হবে, যেমন এই বিশ্বাস যে, এটি তার পূর্বেকার বাড়ীটিরই একটি প্রতিরূপ। মন-বিবর্জিত কতকগুলো উপাদান থাকতেই হবে, যেমন, একজন যে প্রকৃতই এরূপ একটি বাড়ীতে বাস করত ; এবং এমন কতকগুলো উপাদান থাকতে হবে যা মন-সম্পর্কিত ও মন-বিবর্জিত উপাদান গুলোরই সমষ্টি—যেমন, কারও বর্তমান প্রতিরূপ তার পূর্বেকার বাড়ীটির কোন ছবি দেখার ফল নয়, বরং সেই বাড়ীটিই দেখার ফল। পরিশেষে, প্রতিরূপের উপস্থিতি এমন-কি প্রয়োজনীয়ও নয়। কোন প্রতিরূপ ছাড়াই শুধু পার্শ্ববর্তী এলাকার মধ্য দিয়ে গাড়ী চালিয়ে যাবার সময় অন্যান্য বাড়ী থেকে তার বাড়ীটাকে বেছে নিলেই কোন ব্যক্তি সম্পর্কে বলা যাবে যে, তার পূর্বেকার বাড়ীটিকে সে স্মরণ করেছে।

মানসিক ঘটনা সম্পর্কিত কতিপয় মতবাদ

মানসিক ঘটনাবলীর বিভিন্নতা এবং জটিলতার কারণেই মন ও চেতনার সারধর্মের বৈশিষ্ট্য কি, এ সম্পর্কে দার্শনিকদের মধ্যে যে গুরুতর মতভেদের সৃষ্টি হবে তাতে বিস্মিত হবার কিছুই নেই। আমাদের জানবার ও কোন কিছু বিচার করে দেখবার বিভিন্ন ক্ষমতাকে লক্ষ্য করে কিছু কিছু দার্শনিক এই সিদ্ধান্ত করেন যে, 'যৌক্তিকতা' (rationality) মনের প্রধান সারধর্ম। এটি 'হোমোসেপিয়েন্স্', বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ (the Intelligent Man), আমাদের প্রজাতির (species) এই নামটির মধ্যেই প্রতিফলিত হয়েছে। প্রতিরূপের কল্পনা করার, চিন্তা করার, সংবেদনবোধ এবং আবেগজনিত অভিজ্ঞতার ক্ষমতাসমূহের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করে অন্যান্য দার্শনিক সিদ্ধান্ত করেছেন যে, এক বিশেষ প্রকারের আভ্যন্তরীণ ও গোপনীয় বিষয়ের 'অনুধ্যানিক সচেতনতার' (contemplative awareness) মধ্যে মনের সারধর্ম নিহিত রয়েছে। এমন দার্শনিকগণও রয়েছেন যাঁরা বর্ণনা করা, স্মৃতিচারণ করা, বিচার করা, তর্ক করা, উদ্ভাবন করা, ভান করা এবং অনুসন্ধান করা প্রভৃতি বিশেষ মানবীয় কার্যাবলীর উপর গুরুত্ব আরোপ করে এই মতবাদ প্রদান করেন যে, 'প্রতীগায়ন',

'বিমূর্ত করণ' এবং 'ভাষা ব্যবহারের' ক্ষমতার মধ্যেই মনের সারধর্ম নিহিত। পরিশেষে, কেউ কেউ এই দেখে অভিভূত হয়েছেন যে, অন্যান্য প্রক্রিয়ার মধ্যে চিন্তা, বিশ্বাস, কামনা, প্রত্যাশা, আশা, ইচ্ছা এবং অনুসন্ধানের বিষয়বস্তু (objects) আছে, যেগুলো সম্পর্কে চিন্তা, বিশ্বাস, কামনা, প্রত্যাশা, ইত্যাদি করা যায়, যদিও এসব বিষয়বস্তুর প্রকৃতপক্ষে কোন অস্তিত্ব আদৌ নেই (যে কেউ একটি ইউনিকর্ণ [unicorn] সম্বন্ধে চিন্তা করতে পারেন, যদিও ইউনিকর্ণ বলে কোন কিছুই নেই)। এসব অস্তিত্বহীন বিষয়বস্তুর বিশেষ অবস্থান প্রকাশের জন্য 'অভিপ্রায়গত' (intentional) কথাটি ব্যবহার করে এই দার্শনিকেরা মানসিক ঘটনাবলী বলতে সেই-সব ঘটনা বুঝাতে চান যেগুলো নিজেদের ভেতরে 'অভিপ্রায়গতভাবে' (intentionally) কোন বিষয়বস্তুর ধারণাকে অন্তর্ভুক্ত করে।

হাতী ও কতিপয় অন্ধব্যক্তি সম্পর্কিত গল্পটির কথা এস্থলে কেউ চিন্তা না করে পারেন না, কারণ, মনের সারধর্মের এই মতবাদ গুলোর প্রত্যেকটি আপাতদৃষ্টিতে যুক্তিপূর্ণ হওয়ার জন্য দৃষ্টান্তের সীমিত নমুনার উপর নির্ভরশীল। প্রতিটি মতবাদ তার নিজস্ব সীমিত নমুনার জন্য কোন একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যকে বেছে নেয়, কিন্তু প্রতিটি মতবাদ সাফল্যলাভ করে কেবলমাত্র এমনসব ঘটনাকে উপেক্ষা করে যে-গুলো বিরুদ্ধ মতবাদসমূহের কোন একটির সঙ্গে অধিকতর সংগতিপূর্ণ। বড় জোর, প্রতিটি মতবাদ মানসতা (mentality) প্রমাণের জন্য একটি পর্যাপ্ত শর্তকে বেছে নেয়, কোন অপরিহার্য শর্তকে নয়।

মানসিক ঘটনাবলীর ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে, ঘটনাসমূহের অধিকাংশই বিভিন্নভাবে একটি আরেকটির সাথে এভাবে জড়িত হয়ে পড়ে যে, তাদের কোন একটি সাধারণ সারধর্ম পাওয়া যায় না। ভিটগেন্‌স্টাইনের সম্প্রত্যয়কে ব্যবহার করে আমরা বলতে পারি যে, এখানে আমরা বিভিন্ন বিষয়ের একটি "পরিবার"কে (family) পাচ্ছি যার সদস্যদের একটি "পারিবারিক সাদৃশ্য" (family resemblance) রয়েছে—ঠিক যেন এমন একটি পরিবারের সদস্যদের মত যাদের একজনের সঙ্গে অপরজনের সাদৃশ্য পরিদৃষ্ট হয়, যদিও তাদের মধ্যে কোন একটিবৈশিষ্ট্য (যেমন, নাকের গড়ন) সাধারণভাবে বিদ্যমান থাকে না।[১]

---

১ কতকগুলো বস্তুর একটি শ্রেণীর কোন সাধারণ সারধর্ম না-ও থাকতে পারে, কিন্তু তবুও তাদের মধ্যে একটি "পারিবারিক সাদৃশ্য" থাকতে পারে এ ধারণাটি Ludwig Wittgenstein কর্তৃক আলোচিত হয়েছে G.E.M. Anscombe অনূদিত *Philosophical Investigations*-এ (New York: The Macmillan Company, 1953, second edition, 1958), অনুচ্ছেদ ৬৬--৭১।

মন বা মানসিক ঘটনাবলী বলে আখ্যায়িত হতে পারে এমনসব বস্তুর সংগঠিত কোন যথার্থ পরিবার আদৌ আছে কি না, এ প্রশ্নও এখানে করা যেতে পারে। এটা স্বীকার্য যে, পাথর-খণ্ড স্বপ্ন দেখতে পারে না, অথচ মানুষ পারে; কিন্তু পাথর লবণ-পানিতে ভাসতে পারে না, অথচ মানুষ পারে; এবং এটা কেউ বলতে চাইবেন না যে লবণ-পানিতে ভাসার কার্য একটি "মানসিক ঘটনা"। উচ্চতর স্তন্যপায়ী জীবদের (higher mammals) এমন অনেক কিছুই আছে যা প্রকৃতি-রাজ্যের অবশিষ্টের নেই, যেমন, জীবদেহের এক বিশেষ ধরনের রাসায়নিক পরিবর্তন (metabolism); কিন্তু এই বিশেষ ধরনের রাসায়নিক পরিবর্তনের মধ্যে বিশেষভাবে "মানসিক" (mental) বলে কিছুই নেই। মানসিক ঘটনাবলী শুধু চেতনাক্ষম বিষয়ীরই বৈশিষ্ট্য হতে পারে বলে আমরা এর আগে যে-কথা বলেছিলাম তা যদি আমরা স্মরণ করি, তা হলে এমন অনেক জিনিসকে মানসিক ঘটনার অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যাদের বিশেষভাবে মানসিক ঘটনা বলে সাধারণতঃ চিন্তা করা যায় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, নিম্নের সবকটির জন্যই ব্যক্তির সচেতনতা আবশ্যক ঃ তোতলামি (stuttering), ভ্রূকুটি (scowling), বিবাহ-বিচ্ছেদপ্রাপ্তি (getting a divorce), বল গর্তে ফেলার সুযোগ হারানো (missing a putt)। কিন্তু তবুও এগুলো কি 'মানসিক' ঘটনা?

উত্তরে একথা স্বীকার করতেই হবে যে, এখানে "মানসিক" কথাটিকে আমরা কিছুটা প্রসারিত করছি; কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি যে, এর ফলে আমরা উপকৃতই হব। যেমন, তোতলামি কেবল কতকগুলো উচ্চশব্দের দৈহিক ফল নয়—আলঙ্কারিক অর্থ ছাড়া, একটি বাষ্পীয় ইঞ্জিন যে তোতলামি করছে তা বলা যেতে পারে না। চেতনাক্ষম জীব যে বিশেষ অভিপ্রায়েই ভাষা ব্যবহার করে, সে-প্রেক্ষিতেই তোতলামির তাৎপর্য অনুধাবন করা উচিত। ভ্রূকুটি মুখের কতকগুলো মাংসপেশীর খেলা মাত্র নয়; অসন্তোষ অথবা অসম্মতিজনিত 'অনুভূতিগুলোর' প্রেক্ষিতেই একে বোঝা যেতে পারে। এসবের কর্তা যে চেতনাসম্পন্ন জীব সে-বিষয়টি যদি আমরা বাদ দিই, তা হলে এ ঘটনাগুলোর কোন অর্থ আমরা করতে পারি না। এবং সে-কারণেই এগুলো, অন্যান্য যেসব ঘটনা চেতনাক্ষম জীবের প্রকৃতির সঙ্গে আরও বেশী সম্পর্কিত বলে স্বীকৃত, তাদেরই সাথে একই শ্রেণীভূক্ত বলে গণ্য হওয়ার যোগ্য।

পরবর্তী অধ্যায় গুলোতে আমরা মনোদর্শনের মূল সমস্যাগুলোর আরও সবিস্তার আলোচনা করব। চেতনা তার বিভিন্ন প্রকাশের যে-কোন একটির

বেলায় এমন কোন গোপনীয়, আভ্যন্তরিক ঘটনা কি না যা কেবল ব্যক্তির নিজেরই নাগালের মধ্যে রয়েছে, অথবা এ মূলতঃ এমন একটি প্রকাশ্য ঘটনা কি না যা জ্ঞাতার নিজের দ্বারা যেমন ঠিক তেমনি অপরাপর ব্যক্তির দ্বারাও প্রত্যক্ষণযোগ্য—এ হল দ্বিতীয় অধ্যায়ের সমস্যা। যাকে চেতনা বলা যায় তা 'কি' —এ বিষয়টি আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে পরীক্ষা করব এবং এখানে আমরা দেহ, মন এবং ব্যক্তি, এ তিনটি বিকল্পের বিবেচনা করব। চতুর্থ অধ্যায়ে প্রচলিত দেহ-মন সমস্যা ও মানসিক ঘটনা এবং পরজীবন সম্পর্কিত প্রশ্নাবলীর আলোচনা করা হবে। চেতনায় যেভাবে আমাদের অভিপ্রায়মূলক (ইচ্ছামূলক) ক্রিয়াসমূহের প্রকাশ ঘটে, পঞ্চম অধ্যায়ে তা আলোচনা করা হবে।

২
চেতনা

আমাদের জানা পুঁথি-পত্রের পঁচিশ শত বছরের ইতিহাসে 'চেতনা' সম্পর্কে উত্থাপিত বিভিন্ন তত্ত্বের পর্যালোচনা করা হলে আমরা দেখব যে, সেগুলো দুটি সাধারণ শ্রেণীতে পড়ে। এদের একটিকে আমরা বলব উত্তম-পুরুষ বিবরণ (first-person account): ব্যক্তির 'নিজের' ক্ষেত্রে কোনকিছু যে কিভাবে ঘটছে তার প্রতি মনোনিবেশ করা থেকেই এর উদ্ভব। আর, যখন 'অন্য কেউ' কোনভাবে সচেতন হয়, তখন কোন কিছু কিভাবে ঘটে থাকে তার প্রতি মনোনিবেশের ফলশ্রুতি হচ্ছে নাম-পুরুষ বিবরণ (third-person account)। এ পদগুলো আমি ব্যাকরণ থেকে নিচ্ছি; কোন ব্যক্তি বিশেষভাবে ব্যাকরণের উত্তম পুরুষকে (first-person) ব্যবহার করেন 'নিজের' সম্পর্কে কিছু বলার জন্য এবং তিনি বিশেষভাবে ব্যাকরণের নাম-পুরুষকে (third-person) ব্যবহার করেন 'অন্যের' সম্পর্কে কিছু বলার জন্য। [এ-গুলোকে আমরা যথাক্রমে "বিষয়ীগত" ("subjective") এবং "বিষয়গত" ("objective") বিবরণ বলতে পারতাম; কিন্তু এসব শব্দ আজকাল এত বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে যে, তাহলে আমরা অপ্রাসঙ্গিক আলোচনার ঝুঁকির সম্মুখীন হতাম।] এসব আলোচনা-পদ্ধতি থেকে চেতনা সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের বিবরণ পাওয়া যায়।

নাম-পুরুষ বিবরণ

মাথায় আঘাত পেয়েছে এমন একজন লোক সম্পর্কে যখন আমরা জানতে চাই সে 'সচেতন' কি-না, তখন আমরা কি বুঝি? আচ্ছা, যদি আমাদের বলা হয় যে, সে সচেতন নয়, তা হলে তখন আমরা কি দেখার আশা করতে পারি? আর, যদি বলা হয় যে, সে সচেতন, তা হলেই বা আমরা কি দেখার আশা করতে পারি? আমরা আশা করি যে, সচেতন না হলে সে কোন উত্তেজকে সাড়া দেবে না; যেমন, নিকটবর্তী কোন বিরাট শব্দে সে পিছিয়ে আসবে না। অপরপক্ষে, আমরা আশা করি যে, যদি সে সচেতন থাকে, তা হলে সে শব্দ শুনে পিছিয়ে আসবে। অর্থাৎ, কোন বিশেষ উত্তেজকের প্রভাবে আমরা কোন বিশেষ ধরনের আচরণ আশা করি। যেমন, আমরা আশা করি যে,

তার সঙ্গে যখন কথা বলা হবে তখন সে চোখ খুলবে, সম্ভবতঃ ওঠার চেষ্টা করবে, তার কি হয়েছে তা জিজ্ঞেস করবে, ইত্যাদি আরও অনেক কিছু। যদি সে কোন দৈহিক আঘাত না পেয়ে থাকে, তা হলে আমরা আরও বেশী জটিল আচরণ আশা করব। অনুরোধক্রমে সে যদি উঠতে সক্ষম হয়, কোন জিনিসে ধাক্কা না খেয়ে হাঁটতে পারে, প্রশ্নের জবাব দেয়, আদেশ পালন করে, তা হলে সে তখনও সচেতন কি-না সে বিষয়ে কৌতূহলবোধ করা হাস্যকর ব্যাপার হবে। যখন আমরা বলি যে, কোন ব্যক্তি তার চেতনাকে ফিরে পেয়েছে, তখন আমরা ঠিক এ ধরনের আচরণই নির্দেশ করে থাকি। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারতাম যে, কতকগুলো বিশেষ ধরনের উত্তেজকের সাহায্যে যে-রকমের দৈহিক আচরণের উদ্ভব হয় "চেতনা"-কে তার মাধ্যমেই সজ্ঞায়িত করতে হবে। সচরাচর যাকে আচরণবাদ (Behaviourism) বলা হয় এ ধরনের সংজ্ঞা তারই শিরোনামের অন্তর্গত।

সাম্প্রতিক মনোবিজ্ঞানে আচরণবাদ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বিংশ শতাব্দীর মনোবিজ্ঞানে একটি প্রধান আন্দোলনের নাম (label) হিসাবে এটি গৃহীত হয়েছে, এবং বর্তমান কালের অধিকাংশ মনোবিজ্ঞানী এর কাছে যথেষ্ট ঋণী। দুর্ভাগ্যবশতঃ পদ্ধতিগত আচরণবাদ (methodological behaviourism) ও আধিবিদ্যিক আচরণবাদ (metaphysical behaviourism) নামে অভিহিত এর দুটি বিভাগের মধ্যে পার্থক্য দেখাতে তাঁরা প্রায়ই অকৃতকার্য হয়েছেন। প্রথমোক্তটি মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন সমস্যা আলোচনার একটি পদ্ধতি ; এটি হচ্ছে, মনোবৈজ্ঞানিক তত্ত্বসমূহ এবং সেসব তত্ত্বের মূল্যায়নের পদ্ধতিগুলোকে পর্যবেক্ষণীয় আচরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা। এ ধরনের একটি প্রয়োগ-পদ্ধতি মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন সমস্যার আলোচনায় খুবই ফলপ্রসূ হয়েছে। আধিবিদ্যিক আচরণবাদ চেতনার 'প্রকৃতি' এবং চেতনা-নির্দেশক প্রত্যয়গুলোর 'বিশ্লেষণ' সম্পর্কিত একটি মতবাদ। পদ্ধতিগত আচরণবাদ নয়, আধিবিদ্যিক আচরণবাদই এখানে আমাদের আলোচনার বিষয়।

আচরণবাদ হল একটি বিশেষ ধরনের নাম-পুরুষ বিবরণ, কেননা এর মতে আমরা চেতনা সম্পর্কিত সকল সম্প্রত্যয়কে সংজ্ঞায়িত করি সেইসব দৈহিক আচরণের মাধ্যমে, যেগুলো সহজেই, একজনের নিজের বেলায় যেমন, ঠিক তেমনি 'অন্যের' বেলাতেও পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে। কিন্তু এ রকম একটি মতবাদকে সতর্কতার সহিত প্রণয়ন করতে হবে ; কেননা এ কথাটা অতি স্পষ্ট যে, যে-ব্যক্তি সচেতন অথবা যে চেতনার কোন-এক বিশেষ অবস্থায়

আছে, সে তার আচরণ দ্বারা নিজের আসল অবস্থা প্রকাশ না-ও করতে পারে। সে শুধু চোখ বুঁজে সটান শুয়ে থাকতেও পারে। কিন্তু তবুও সংবেদন, চিন্তা প্রভৃতিসহ তখনও সে সচেতন থাকতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কোন রকম মোচড়ানি, গোঙানি, অভিযোগ ছাড়াই সে ব্যথাগ্রস্ত থাকতে পারে। আচরণবাদী তাঁর মতবাদে এ বিষয়টিকে কিভাবে স্থান দেবেন?

একদিকে, আচরণবাদী মনে করতে পারেন যে, আজ রাতে একজন লোক তার ডায়েরীতে কি লিখবে, কাল অত্যাচারের মুখে সে কি স্বীকার করবে, তার মৃত্যুশয্যায় সে কি বলবে, 'ভবিষ্যতের' অন্তর্গত এ জাতীয় আচরণ এখানে প্রাসঙ্গিক। কিন্তু এটা পরিষ্কার যে তা যথেষ্ট নয়, কারণ যে-ব্যক্তি এখন ব্যথাগ্রস্ত সে বর্তমান ব্যথাগ্রস্ত অবস্থার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ কোন ভবিষ্যৎ আচরণ 'কখনও প্রকাশ না-ও করতে' পারে।

কোন কোন আচরণবাদী 'বাহ্যিক' ও 'আভ্যন্তরীণ' আচরণের মধ্যে পার্থক্য করেন। শেষোক্ত আচরণ হচ্ছে এমন-সব গতিবিধি যেগুলো লক্ষ্য করা যায় না, কারণ, হয় সে-গুলো নিতান্ত ক্ষীণ, নয়তো সে-গুলো শরীরের এমন জায়গায় সংঘটিত হয় যেখানে খুব সহজে তাদের দেখা যায় না। যেমন, চিন্তনকে ঠোঁটের নিতান্ত মৃদু নাড়াচাড়ার সাথে অথবা, আরও সঙ্গতভাবে, জিহ্বার কিংবা স্বরনালীর (vocal chords) মৃদু আন্দোলনের সাথে সংযুক্ত করা যেতে পারে। যা হোক, অসুবিধা দূরীকরণের এ প্রচেষ্টা নতুন অসুবিধার সৃষ্টি করে। প্রথমতঃ, সাময়িক অবশতার সৃষ্টিকারী কিউরেয়ার (curare) ঔষধটি নিয়ে আধুনিক গবেষণা থেকে জানা যায় যে, মানসিক ঘটনা প্রবাহে আভ্যন্তরীণ আচরণও অনুপস্থিত থাকতে পারে। পেশী-সমূহের পূর্ণ অবশতা সৃষ্টির জন্য প্রচুর কিউরেয়ার দেয়া হয়েছে এমন রোগীরাও ঔষধের প্রভাব কমে যাওয়ার পর বলে যে, অবশ-অবস্থার সময়ে তাদের মধ্যে চেতনা, চিন্তন, সংবেদন, চিন্তন-ক্ষমতা, প্রতিচ্ছবি (image) বা তদ্রূপ কিছুর অনুপস্থিতি থাকে না। সুতরাং কোন অর্থেই মানসিক ঘটনাবলীকে বাহ্যিক বা আভ্যন্তরীণ আচরণের সাথে এক করে দেখা সম্ভব না-ও হতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, ধরা যাক, লোকে যখন চিন্তা করে তখন আমরা তাদের স্বরনালীতে পেশীর মৃদু আন্দোলন লক্ষ্য করেছি। তা হলেই কি এ যুক্তি দেয়া যেত যে, কোন ব্যক্তি সম্পর্কে আমরা যখন বলি যে, এইমাত্র সে একটা কিছু চিন্তা করেছিল, তখন এ শব্দগুলোর দ্বারা আমরা তার স্বরনালীর কোন পেশী সংক্রান্ত আন্দোলনকে বুঝাই? অবশ্যই না। স্বরনালীর পেশীসমূহ সম্পর্কে সামান্যতম জ্ঞান

না থাকা সত্ত্বেও একজন পুরোপুরিভাবে এ রকম মন্তব্য বুঝতে পারে। সুতরাং, মানসিক বৈশিষ্ট্য-প্রকাশক শব্দাবলীর অর্থ বাস্তব আচরণের মাধ্যমে যে বিশ্লেষিত হতে পারে তা খুব সম্ভাব্য বলে মনে হয় না।

কোন ব্যক্তি যে একটি বিশেষ মানসিক অবস্থায় একটি বিশেষ ভঙ্গিতে আচরণ না-ও করতে পারে, তা আলোচনার একটি প্রচলিত আচরণবাদী কৌশল হল 'আচরণ-প্রবণতার' (disposition to behave) ধারণার অবতারণা করা। প্রবণতা বস্তুর সেই গুণ যা কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রবণতাসূচক গুণসম্পন্ন সেই বস্তুটির মধ্যে কোন-একটি পরিবর্তন ঘটাতে পারে। যেমন, ভঙ্গুরত্ব একটি প্রবণতাসূচক গুণ ঃ একটা বস্তু ভঙ্গুর হবে যদি এবং কেবল যদি উপযুক্ত পরিস্থিতিতে তা খণ্ড খণ্ড হয়ে যায়। কোন একটি বস্তুর ভঙ্গুরত্বের প্রবণতাসূচক গুণটি থাকতে পারে এবং তবুও তা কখনও ভাঙ্গতে না-ও পারে ; সে-কারণেই আমরা ভঙ্গুর দ্রব্যাদি সাবধানে নাড়াচাড়া করি। প্রবণতাসূচক গুণাবলীর এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই আচরণবাদী তার বিশ্লেষণে সে-গুলো ব্যবহার করতে পারেন। কারণ, আমরা যদি চিন্তন, অনুভূতি, ইচ্ছা ইত্যাদির সংজ্ঞায়ন আচরণের মাধ্যমে না করে আচরণের প্রবণতার মাধ্যমে করি, তাহলে যে-লোকটি তার চিন্তা, অনুভূতি ও ইচ্ছাকে কোন প্রকাশবিহীন মুখাবয়ব (poker face) এবং প্রকাশবিহীন আচরণের (poker behaviour) পিছনে লুকিয়ে রাখে তারও বিশেষভাবে আচরণ করার 'প্রবণতা' থাকবে। সুতরাং চেতনা অথবা চেতনার কোন বিশেষ অবস্থাকে আরোপ করার অর্থ নির্দিষ্টভাবে আচরণ করার প্রবণতা আরোপ করা।

কিন্তু এখানে একটা অসুবিধা দেখা দেয় যখন আমরা জিজ্ঞেস করতে চাইঃ 'কোন্' প্রবণতাগুলো এ-বিষয়টার সঙ্গে জড়িত? যে লোকটি সচেতন তার কথা বিবেচনা করা যাক। তার বেলায় আমরা কি কি প্রবণতা আরোপ করতে পারি? শুরুতেই আমরা বলতে পারি যে, যা জড়িত তার অংশবিশেষ হল প্রশ্নোত্তরের প্রবণতা। কিন্তু এটা স্পষ্ট যে, প্রশ্নের উত্তর দেয়ার প্রবণতা না থাকলেও একটি লোক সচেতন থাকতে পারে। কোন কিছুতে সে এত বেশী নিবিষ্ট থাকতে পারে যে, প্রশ্নগুলো সে না-ও শুনতে পারে; ভাষাটা সে না-ও বুঝতে পারে; প্রশ্নের উত্তর দিতে সে ইচ্ছুক না-ও হতে পারে; দৈহিক দিক থেকে সে প্রশ্নের উত্তর দিতে সমর্থ না-ও হতে পারে। এবং, সাধারণভাবে, যেসব শর্তাধীনে প্রবণতা থেকে আচরণের উৎপত্তি ঘটে সেগুলো আমরা যত বিস্তৃতভাবেই বর্ণনা করি না কেন তাতে কিছু আসে যায় না, লোকটি

সম্পূর্ণভাবে সচেতন থাকলেও আচরণের উদ্ভব হবে না এমন-সব ঘটনার কল্পনা তবুও করা যায়। সুতরাং, মনে হয় যেন আচরণবাদীর দাবীকে প্রমাণিত করা যায় না ; আচরণ করার প্রবণতার মাধ্যমে আমরা কোন বিশ্লেষণের শুরুও করতে পারি না।

কিন্তু আচরণবাদী এ অসুবিধার ফলে দমে যান না। তিনি যুক্তি দেবেন যে, আচরণের প্রাসঙ্গিক প্রবণতাগুলোর সঠিক উল্লেখ করতে সক্ষম না হলেও আমরা সবাই প্রাসঙ্গিক আচরণের রকম সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা করতে পারি। তা না হলে 'কেউ যে এখন সচেতনাবস্থায় রয়েছে সেকথা আমরা কিভাবেই বা বলতে পারি'? মোটকথা, কেবল মাত্র আচরণের মাধ্যমেই আমাদের কাজ চালাতে হবে। সঠিক আচরণের পর্যাপ্ত নমুনা থেকে আমরা একথা প্রতিষ্ঠিত করতে পারি যে, একজন মানুষ সচেতন রয়েছে। আর, আচরণবাদীর মতে এ রকমের আচরণই হল সচেতনাতার 'সংগঠক', যদিও একে পরিষ্কারভবে বর্ণনা করা যায় না।

আচরণবাদীর সমর্থনে প্রবণতাসূচক পদগুলোর একটি 'সাধারণ' বৈশিষ্ট্য স্বীকার করতেই হবেঃ বিভিন্ন অবস্থায় প্রবণতাসম্পন্ন বস্তুর ক্ষেত্রে কি ঘটতে পারে সে-কথা কখনও আমরা বিস্তারিতভাবে বলতে পারি না ; কারণ, অনিশ্চিতভাবে অনেক অচিন্তনীয় জটিল ঘটনা প্রবণতাগুলোর বোধগম্যতায় বাধার সৃষ্টি করতে পারে। তত্ত্বের অশুদ্ধতা নয়, বরং এ ঘটনাই আচরণবাদীর পক্ষে অসুবিধার সৃষ্টি করে ; সুতরাং, কোন সঠিক প্রবণতামূলক বিশ্লেষণ প্রদানে তাঁর অকৃতকার্যতাকে তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড় করানো যায় না।

নাম-পুরুষ বিবরণের সুবিধা

প্রারম্ভেই তা হলে একথা বলা দরকার যে, কেবল সচেতন জীবের বেলায় প্রযোজ্য এমন অনেক সম্প্রত্যয়ের প্রতি এই নাম-পুরুষ বিবরণ বাস্তবিকপক্ষে অনেকটা সুবিচার করে। যদি আমরা কোন লোক সম্পর্কে বলি যে, সে উদ্ভাবনক্ষম বা বুদ্ধিমান, দক্ষতাসম্পন্ন বা পরিশ্রমী, উচ্চাকাঙ্ক্ষী বা বিবেচক, তখন সে যা বলে এবং করে আমরা প্রধানতঃ তাই নির্দেশ করে থাকি। ল্যাটিন জানা, অতীতকে স্মরণ করা, একটি বিড়ালের আচরণকে পর্যবেক্ষণ করা, এবং রাগান্বিত হওয়ার ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে। এ পদগুলোর প্রয়োগ সম্পর্কিত চরম পরীক্ষা (crucial test) এবং, বাস্তবিকপক্ষে, তাদের

মৌলিক আধেয়, আচরণ ও আচরণমূলক প্রবণতাগুলোতেই নিহিত।[১]

যেমন, 'ল্যাটিন জানার' অর্থ হল কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে কতকগুলো অনুমোদিত উপায়ে কার্য-সম্পাদনের ক্ষমতা। অন্ততঃ, একজনকে অবশ্যই বেশ কিছু সংখ্যক বাক্যকে ল্যাটিনে এবং ল্যাটিন থেকে অন্য ভাষায় অনুবাদ করতে সক্ষম হতে হবে; এবং, এটা আরও উত্তম হবে যদি সে ব্যাখ্যা করতে পারে বাক্যের এরকম গঠনের ব্যবহার সে 'কেন' করেছে। 'লোভী হওয়ার' অর্থ হল নিজের সম্পদ বাড়ানোর জন্য সুযোগের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়া, অথবা অন্ততঃপক্ষে সত্যিকার প্রয়োজনের চেয়ে বেশী সুযোগের প্রতি ঝুঁকে পড়ার প্রবণতা থাকা। আর, 'প্রজ্ঞা বা বুদ্ধি প্রয়োগের' অর্থ হচ্ছে যুক্তিযুক্তভাবে এবং ফলপ্রদ পদ্ধতিতে সামান্যতম পরিশ্রমে সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতিকে এড়িয়ে এবং বাধা-বিঘ্নকে অতিক্রম করে কার্য-সম্পাদন করা।

সাধারণভাবে একথা বলা যেতে পারে যে, যা-কিছুকে মন, ব্যক্তিত্ব এবং চরিত্রের, নিপুণতা, সক্ষমতা ও দক্ষতার (অথবা তাদের অনুপস্থিতির), অভ্যাস, প্রবণতা, মনোবৃত্তি এবং ঝোঁকের, উদ্দেশ্য ও দৃষ্টিভঙ্গির, মেজাজ, মনের সাময়িক অবস্থা ও রসিকতার গুণাবলী বলে শ্রেণীবিন্যাস করা যায় এবং আর যা-কিছুকে তাদের প্রয়োগ অথবা প্রকাশ বলে শ্রেণীকরণ সম্ভব হয়, সেগুলোতেই এই নাম-পুরুষ বিবরণটি প্রয়োগ করা যেতে পারে।

এসব সম্প্রত্যয়ের বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে নাম-পুরুষ বিবরণটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য কেন? এটা কোন আগতিক কিছু নয়। যখন আমরা কাউকে জিজ্ঞেস করি কিসের বলে সে এসব সম্প্রত্যয়ের কোন একটিকে তার নিজের প্রতি প্রয়োগ করে থাকে, তখনই এ বিষয়টি লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, ল্যাটিন জানার কথাটা ধরা যাক। আমি যে ল্যাটিন জানি, 'আমার' এই ধারণাটি এ সম্পর্কে অন্যের ধারণার তুলনায় কোন বিশেষ মূল্য বহন করে না। ল্যাটিন জানে বলে যদি কেউ দাবী করে তা হলে তার 'প্রমাণ' থাকতেই হবে, এবং সেকথা আমার বেলায়ও প্রযোজ্য। এখানে যে-ধরনের প্রমাণটি প্রাসঙ্গিক তা এমন যে, সেটি শুধু আমার নয়, যে-কোন ব্যক্তিরই থাকতে পারে। অতএব, আমি যে ল্যাটিন জানি, এটা বলার মত আমি যেমন সুবিধাজনক অবস্থায় থাকি অন্যেরাও ঠিক তাই থাকেন। 'উচ্চাকাঙ্ক্ষার' ন্যায় এমনকিছু সংখ্যক

---

১ গিলবার্ট রাইল-এর *The Concept of Mind* (New York : Barnes and Noble, 1949) বইটির একটি বড় গুণ এই যে, চেতনা সম্পর্কিত এক বিচিত্র শ্রেণীর সম্প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে বার বার রাইল এ-তত্ত্বের প্রয়োগ দেখিয়েছেন।

সম্প্রত্যয়কে জানার ক্ষেত্রে অন্যেরা প্রায়ই এর চেয়েও সুবিধাজনক অবস্থায় থাকেন, কারণ, আমি আমার আচরণকে যেভাবে দেখি অন্যেরা তার চেয়েও নিরপেক্ষভাবে তা দেখতে পারেন।

নিজের অবস্থা বর্ণনার ব্যাপারে আমি যে নীতিগতভাবে অন্যের চেয়ে আরও সুবিধাজনক অবস্থায় নেই তা শুধু এটাই নির্দেশ করে যে, নিজের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে আমি আমাকে মূলতঃ 'নাম-পুরুষ'-এর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে থাকি, এবং তখন এমনসব জিনিস আমি বিবেচনার মধ্যে আনি, কোন সিদ্ধান্ত করার সময় অন্য কোন ব্যক্তি যেগুলো বিবেচনার মধ্যে আনবেন। সুতরাং, নাম-পুরুষ বিবরণ এসব অবস্থার বিশ্লেষণের সাথে স্বভাবতঃই সুসামঞ্জস্যপূর্ণ হবে এবং তার থেকে এদের একটি সঠিক বিশ্লেষণ পাওয়া যাবে।

লক্ষ্য করুন যে, এমন-কি আচরণবাদী বিশ্লেষণের পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী সম্প্রত্যয়ের বেলায়ও এটা অচিন্তনীয় যে, আমরা তাদের কোন সুস্পষ্ট প্রবণতাসূচক 'সংজ্ঞা' (dispositional definition) দিতে পারব। ঠিক কোন্ কোন্ প্রবণতা এখানে জড়িত আমরা বিস্তারিতভাবে বলতে পারি না। তা থেকে কেউ কেউ সিদ্ধান্ত নিতে পারেন যে, এমন-কি এখানেও নাম-পুরুষ বিবরণ অনুপযোগী। কিন্তু সে-বিবরণের একজন সমর্থক আমাদের স্মরণ করিয়ে দেবেন যে, এটা প্রবণতাসূচক পদগুলোর একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য।

নাম-পুরুষ বিবরণ চেতনা সম্পর্কিত সবগুলো সম্প্রত্যয়ের ব্যাখ্যায় সুবিচার করে কি না তা এখনও দেখা হয় নি। এখন আমরা এমন কতকগুলো সম্প্রত্যয়ের প্রতি নজর দেব, নাম-পুরুষ বিবরণের সমর্থনকারীকে অসুবিধার সম্মুখীন করে বলে যাদের বিশেষ খ্যাতি আছে।

নাম-পুরুষ বিবরণের কতিপয় অসুবিধা

ল্যাটিন জানা বা উচ্চাকাঙ্ক্ষী হওয়ার ন্যায় নাম-পুরুষ বিবরণের অনুকূল ক্ষেত্রগুলোর একটা বৈশিষ্ট্যের উল্লেখপূর্বক আমরা এগুলোর গুরুত্বপূর্ণ দিক প্রকাশ করতে পারি। 'গভীর ঘুমে নিমগ্ন' এমন একজন ব্যক্তির বেলায় একথা বলা ঠিক হতে পারে যে, সে ল্যাটিন জানে অথবা সে লোভী; এটা বলার দরকার নেই যে, কোনকিছু যেন (যেমন আমরা বলে থাকি) 'তার মনের সামনে ভাসছে' অথবা 'তার চেতনাকে ঘিরে রয়েছে'। যখন এসব অবস্থার প্রয়োগ অথবা প্রকাশের কথা আসে, তখন তাকে অবশ্যই বিশেষভাবে সজাগ থাকতে হবে (আমি "বিশেষভাবে"কথাটা বলছি, কারণ কেউ তর্ক করতে

পারেন যে, যে-ব্যক্তি ঘুমে ল্যাটিন বলছে সে তখন তার ল্যাটিনের জ্ঞানকেই প্রয়োগ করছে এবং যে-ব্যক্তিটি ঘুমে চীৎকার দিয়ে বলে ওঠে "আমি গোটা রুটিটা চাই", তখন সে তার লোভই প্রকাশ করছে)। যদিও এ বিষয়টি অনুধাবন করা সহজ নয়, কিন্তু তবুও চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, আমাদের সাধারণ জাগ্রতাবস্থায়ও এটি প্রয়োজনীয় নয় যে, সে যখন তার লোভকে অথবা তার ল্যাটিনের জ্ঞানকে প্রকাশ করছে তখন একটা বিশেষ কিছু 'তার মনের সামনে ভেসে বেড়াবে', অথবা 'তার চেতনাকে ঘিরে থাকবে'। সে স্বতঃস্ফূর্তভাবে একটি ল্যাটিন কবিতা আবৃত্তি করতে পারে অথবা, কোন চিন্তা না করেই, পাওয়া মাত্রই সে গোটা রুটিটাকে আবেগ-বশে হঠাৎ চেপে ধরতে পারে। সন্দেহ নেই যে, বাহ্যিকভাবে কবিতাটি আবৃত্তি করার সঙ্গে সঙ্গে মনে মনেও 'হয়ত' সে তা আবৃত্তি করতে থাকবে, এবং রুটিটাকে হঠাৎ চেপে ধরার সময় মনে মনে সে গোটা রুটিটাকে খাওয়ার চিন্তাকেও 'হয়ত' উপভোগ করবে। কিন্তু এ ধরনের আভ্যন্তরীণ অভিজ্ঞতাগুলো আবশ্যক নয়। বাহ্যিকভাবে কি করা হল তাতেই লোভ বা জ্ঞান-প্রকাশের সারবত্তা নিহিত থাকে, যা 'আভ্যন্তরীণভাবে' করা হয় তাতে নয়।

নাম-পুরুষ বিবরণে অসুবিধার সৃষ্টি করে এমন-সব ঘটনা দেখতে গেলে, আমাদেরকে সেসব ঘটনারই সন্ধান করা উচিৎ হবে যেখানে 'আভ্যন্তরীণভাবে' যা ঘটে তার মধ্যে সারবত্তাটি নিহিত থাকে। নাম-পুরুষ বিবরণের অনুগামীদের মতটা এই যে, এমন কোন ঘটনাই 'নেই', এবং চেতনার সঙ্গে জড়িত কোন কিছুকে প্রকাশ্যভাবে পর্যবেক্ষণযোগ্য আচরণ কিংবা এ ধরনের আচরণের প্রতি প্রবণতার মাধ্যমেই বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

এখন আমরা সেই-সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি যেখানে এটা মনে হবে যে, আলোচ্য বিষয়টির একটি প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কোন কিছুর এমন একটি 'আভ্যন্তরীণ' ঘটনা যা (যেমন আমরা বলি) "ব্যক্তির মনের সামনে ভেসে বেড়ায়" অথবা "তার চেতনাকে ঘিরে থাকে"। এখানে সবচেয়ে সম্ভাব্য আলোচ্য বিষয়গুলো হল সংবেদন (যেমন, ব্যথা অনুভব করা), মানসিক প্রতিচ্ছবি (যেমন, মনশ্চক্ষুতে একটি দৃশ্য দেখা), এবং চিন্তারাজি (যেমন, ঘুম থেকে জেগে চিন্তা করা যে, আজ ছুটির দিন)। সংবেদন-প্রাপ্তির ব্যাপারে মনোনিবেশ করা যাক; যেমন, একটি 'ব্যথার সংবেদন'। আমরা কোন ব্যক্তির পায়ে একটি ভারী বস্তু পড়তে দেখি। আমরা তখন তাকে মলিন হতে, মুখ-ভংগী করতে, কেঁদে ফেল্‌তে, পা-টাকে দৃঢ়ভাবে ধরতে,

এদিক-ওদিক লাফাতে, সাহায্য চাইতে এবং খুঁড়িয়ে হাঁটতে দেখি। সে স্পষ্টতঃই ব্যথা অনুভব করছে। কিন্তু এই ব্যথা-অনুভব করাটা কি? নাম-পুরুষ বিবরণ হিসাবে এসব পরিস্থিতিতে ঠিক এভাবে আচরণ করা, অথবা অন্ততঃপক্ষে এভাবে আচরণ করার প্রবণতা প্রদর্শন করাই দুঃখ অনুভব করা। এসবই নীতিগতভবে পর্যবেক্ষণযোগ্য এবং এজন্য শুধু এ সবই ব্যথার অনুভূতিটির সঙ্গে জড়িত।

কিন্তু এ ধরনের বিশ্লেষণ কি ঠিক সেই অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যটিকে বাদ দিচ্ছে না যা তীক্ষ্ণ, বেশ অস্বস্তিকর 'সংবেদন' হিসাবে চেতনার সামনে খুবই প্রকটভাবে বিদ্যমান এবং অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়কভাবে দুঃখময়? নিশ্চয়ই আভ্যন্তরীণ সংবেদনটি মুখ-ভংগী, কান্না ও খুঁড়িয়ে হাঁটার বাহ্যিক আচরণের প্রত্যক্ষ কারণ। ওই আভ্যন্তরীণ কারণটিকেই নাম-পুরুষ বর্ণনায় বাদ দেয়া হয়ে থাকে। কোন বিশেষ আচরণ অথবা আচরণের প্রবণতাসমূহ সংবেদনের কোন আবশ্যিক বা পর্যাপ্ত শর্ত নয়। আবশ্যিক নয় এজন্য যে, একটি ব্যথাকে কেউ অবশকারিতার দিক থেকে এতই প্রকট অথবা এতই সামান্য বলে কল্পনা করতে পারেন যে আচরণের কোন প্রবণতা একেবারেই না থাকতে পারে; আবার, একজন এমন স্টোয়িকদের কথা ভাবতে পারেন যারা এসব আচরণ-প্রবণতাকে একেবারে নির্মূল করে ফেলেছেন। এবং পর্যাপ্ত নয় এজন্য যে, কারও নিজের প্রতি মনোনিবেশ করার, অন্যকে প্রতারিত করার অথবা কোন ব্যথাগ্রস্ত লোকের অনুকরণ করার ইচ্ছা প্রভৃতি অন্যান্য কারণ থেকে এসব প্রবণতা উদ্ভূত হয়েছে বলেও কেউ কল্পনা করতে পারেন; এবং আপনি এ-ও কল্পনা করতে পারেন যে, 'আদৌ কোন কারণের জন্য নয়', বরং হঠাৎ এবং দুর্জ্ঞেয়ভাবেই আপনি কোন মুখ-ভঙ্গী করার, কান্নার এবং খুঁড়িয়ে চলার ইচ্ছার বশবর্তী হয়ে পড়তে পারেন। এ রকম একটি ঘটনা হতবুদ্ধিকর হতে পারে, এবং এর দ্বারা কি বুঝতে হবে আমরা তা না-ও জানতে পারি, কিন্তু নিঃসন্দেহে এটি ঘটতেও পারে। অন্যেরাও প্রতারিত হতে পারেন এবং বিশ্বাস করতে পারেন যে, আপনি ব্যথা অনুভব করছিলেন। কিন্তু 'আপনি' জানেন যে আপনি ব্যথা অনুভব করছিলেন না, যদিও আপনি যে 'কেন' ব্যথা অনুভব করার মত আচরণ করছিলেন তা আপনি ব্যাখ্যা করতে পারেন নি। সুতরাং ব্যথা অনুভব করা এক জিনিস, এবং বিশেষ পদ্ধতিতে আচরণ করার প্রবণতা থাকা অন্য জিনিস। অনুভূতি আচরণ প্রবণতার সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু আমরা একথা বলতে পারি না যে এ দুটি একই জিনিস; আবার, একথাও বলতে পারি না যে এদের একটি অপরটির আবশ্যিক কিংবা পর্যাপ্ত শর্ত।

সংবেদনের সংজ্ঞাকে আচরণের বাইরে পর্যন্ত বিস্তৃত করে কেউ এ আপত্তি নিয়ে আলোচনার চেষ্টা করতে পারেন। নাম-পুরুষ বর্ণনার সাথে সংগতি রেখে তা করার একটি উপায় হল প্রকাশ্যভাবে পর্যবেক্ষণযোগ্য কোন 'কারণ'কে উপস্থাপিত করা; যেমন, একটি ভারী বস্তু যা তার পায়ের উপর পড়ে তার মুখ-ভংগী করার, চীৎকার করার এবং খুঁড়িয়ে চলাফেরা করার প্রবণতার উদ্রেক করে। দেহে একটি বিশেষ ধরনের আঘাতের 'ফলে' প্রাসঙ্গিক উপায়ে আচরণ করার প্রবণতা হিসাবে আমরা ব্যথার অনুভূতিকে সংজ্ঞায়িত করতে পারি। এভাবে, আমরা সেসব ঘটনাকে বাদ দিব যেখানে আচরণের প্রবণতা কোন একটি বাসনা দ্বারা সংঘটিত হয় (যেমন, ব্যথাগ্রস্ত কোন লোককে অনুকরণ করা) অথবা যেখানে আচরণের প্রবণতার আদৌ কোন জ্ঞাত কারণ নেই।

নাম-পুরুষ বর্ণনাকে সমর্থন করার এ প্রচেষ্টার অসুবিধা হচ্ছে এই যে, এটি কারণকে "সংবেদন"-এর 'সংজ্ঞার' একটি অংশ বলে মনে করে; আর, প্রত্যেক সংবেদনের একটি কারণ আছে—এ বচনটি তখন পরিণত হয় একটি পুনরুক্তিতে (tautology)। কিন্তু প্রত্যেক সংবেদনের একটি কারণ আছে একথা স্পষ্টতঃই কোন পুনরুক্তি 'নয়'; এটি একটি অভিজ্ঞতামূলক প্রকল্প। যেহেতু কারণহীন সংবেদনের কথাটি স্ববিরোধী নয়, সে-কারণেই এই প্রস্তাবিত বিশ্লেষণটি (যা একে স্ববিরোধী করে তুলবে)-কে প্রত্যাখ্যান করতে হবে।

ডেভিড কে, লুইস,[১] এই অসুবিধা এড়ানোর একটি উপায়ের কথা বলেছেন। তাঁর মতে, সংবেদনকে আমরা সংজ্ঞায়িত করি এর বৈশিষ্ট্যমূলক (typical) কার্য ও কারণের মাধ্যমে, কিন্তু স্বীকার করি যে এতে অবৈশিষ্ট্যমূলক (atypical) দৃষ্টান্তের একটা ক্ষুদ্র অবশিষ্টাংশ থেকে যেতে পারে। যাই হোক, এ ধারণা আমাদেরকে এ মতের দিকেই যেতে বাধ্য করে যে, 'অধিকাংশ সংবেদনের কারণ আছে' এ বচনটি একটি পুনরুক্তি। এবং আমি বলতে প্রলুব্ধ হচ্ছি যে, যদিও এটি খুবই সম্ভবপর, এমন-কি সম্ভবতঃ নিশ্চিত যে, অধিকাংশ সংবেদনের কারণ আছে, তবুও তা একটি পুনরুক্তি নয়। উদাহরণস্বরূপ, মাথা ব্যথার কথা ধরা যাক; এটা কি যৌক্তিক অর্থে

---

১ "An Argument for the Identity Theory", *The Journal of Philosophy*, খণ্ড-৬৩, নং-১ (জানুয়ারী-৬, ১৯৬৬), ১৭-২৫, বিশেষ করে ২২।

সম্ভব নয় যে, এ-গুলো এলোমেলোভাবে ঘটবে? অধিকাংশ মাথা ব্যথারই যে কারণ আছে তা নিঃসন্দেহে একটি অভিজ্ঞতামূলক প্রকল্প। সুতরাং, "মাথা ব্যথা" শব্দটিকে সংজ্ঞায়িত করার জন্য আমরা তাদের কারণসমূহের, এমন-কি বিশেষ কারণসমূহেরও, অবতারণা করতে পারি না।

তা হলে আমি এই সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, এ রকম নাম-পুরুষ বিবরণসমূহ সংবেদনের ন্যায় মানসিক ঘটনাবলীর একটি সঠিক বর্ণনা দেবে না। এ ধরনের মানসিক ঘটনাবলী ও তাদের কারণিক পূর্বগসমূহ, তাদের আচরণগত ফলাফল, এবং এমন-কি আচরণগত প্রবণতার মধ্যে কেবল একটি সম্ভাব্য যোগসূত্র রয়েছে বলে মনে হয়। এবং সেজন্যই, বিস্তৃত করার পরেও, নাম-পুরুষ বিবরণ চেতনার বিশ্লেষণ হিসাবে আর কোন কাজে আসবে না। এখন তা হলে এর বিকল্প উত্তম-পুরুষ বিবরণের দিকে ফিরে আসা যাক।

উত্তম-পুরুষ বিবরণ

এ পর্যন্ত আমরা চেতনাকে নাম-পুরুষ তত্ত্বের ভাষায়, অর্থাৎ অন্যদেরকে আমরা যে মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করতে পারি তারই প্রেক্ষিতে, সংজ্ঞায়িত করার প্রয়াস পেয়েছি। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমরা চেতনাকে এমনভাবে দেখেছি যেন চেতনা কেবল ছিদ্রময়তা, তেজস্ক্রিয়তা অথবা ভঙ্গুরত্বের মত এমন একটা প্রকাশ্য ও বিষয়গত ব্যাপার যাকে আমরা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে জানতে পারি। এবং তার ফলে চেতনাকে বোঝার ক্ষেত্রে আমরা আচরণ ও আচরণ-প্রবণতা এবং আচরণের পর্যবেক্ষণক্ষম কারণগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে বাধ্য হই, কারণ এ ধরনের জিনিসই বৈশিষ্ট্যগতভাবে আমাদের 'দেখায়' যে, অন্য কেউ সচেতন, এবং আর যাই হোক, 'কেবল' এগুলোই হল সে-ধরনের জিনিস যা অন্যের চেতনার ব্যাপারে পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে।

কিন্তু উত্তম-পুরুষ বিবরণের একজন সমর্থক যা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাইবেন এমন একটি খুবই সুস্পষ্ট অথচ প্রয়োজনীয় ঘটনাকে আমরা পাশ কাটিয়ে গিয়েছি ঃ শুধু অন্যেরাই নয়, আমরা 'নিজেরাও' সচেতন। সুতরাং, চেতনা জিনিসটা কি তা বুঝবার চেষ্টা করতে গিয়ে আমাদেরকে কেবল 'অন্যদের' মধ্যে যা পর্যবেক্ষণ করা যায় তার মধ্যেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখার প্রয়োজন নেই। উত্তম-পুরুষ বিবরণের অনুগামীদের বক্তব্য হল যে, 'আমাদের নিজদের ক্ষেত্র থেকেই' আমরা জানতে পারি চেতনা কি। নিজে সচেতন থাকা অবস্থায় নিজের ভেতরে কি ঘটছে, আমাদের প্রত্যেকে যদি

সেদিকে তার মনোযোগ নিবদ্ধ করেন, তা হলে তিনি দেখবেন যে সচেতন হওয়ার অর্থ কোন বিশেষ (যেমন, সচেতন) উপায়ে আচরণ করা নয়; আচরণ আমাদের আভ্যন্তরীণ অবস্থার বাহ্যিক প্রকাশ মাত্র। আমি সচেতন 'বলেই' আমার আচরণ আমার চেতনাকে প্রকাশ করে থাকে। এবং এই আভ্যন্তরীণ চেতনাই হল সেই জিনিস যা আমার নিজের ক্ষেত্রে আমার দ্বারা পর্যবেক্ষিত হয়।

উত্তম-পুরুষ বিবরণ অনুসারে, চেতনা জিনিসটা কি তা আমাদের নিজেদের ক্ষেত্র থেকেই আমরা জানতে পারি। যেমন, সকাল বেলায় আমরা যখন স্বপ্নবিহীন গভীর নিদ্রা থেকে জাগি, তখন একটু আগে যা ঘটে গেল তার চেয়ে গুণগতভাবে পৃথক একটি অবস্থার উপস্থিতি আমরা লক্ষ্য করতে পারি; সেই নতুন অবস্থাটি হল সচেতন হওয়ার অবস্থা। যখন আমাদের চোখ খুলি, আমরা তখন লক্ষ্য করি যে আমরা বিভিন্ন বর্ণ ও আকৃতি সম্পর্কে সচেতন; সেটিই হল চাক্ষুষভাবে সচেতন হওয়ার ঘটনা। একটি কাঁটা যখন আমাদের ত্বককে বিদ্ধ করে, তখন লক্ষ্য করি যে আমরা একটি অস্বস্তিকর সংবেদন অনুভব করছি; সেটিই হল ব্যথার সংবেদন-বোধ। যখন অপমানিত হই, তখন ক্রোধের একটি ক্রমবর্ধমান সংবেদন সম্পর্কে আমরা সচেতন হই; সেটিই হল আবেগময় অনুভূতির অভিজ্ঞতা। রাতে বিভিন্ন রকমের প্রতিচ্ছবি দেখেছিলাম বলে যখন আমরা স্মরণ করি, তখন আমরা বুঝতে পারি স্বপ্নাবিষ্ট হওয়াটা কি। হঠাৎ করে যখন আমাদের মনে খেলে যায় যে, কোন একটি উক্তি সত্য, তখনই আমরা বুঝি চিন্তার অর্থ কি। কোন কিছুকে পুনরায় স্মরণ করা, কোন উত্তর-প্রতিরূপের (after-image) অভিজ্ঞতা লাভ করা, কোন অভিপ্রায়ের সৃষ্টি করা, কোন সিদ্ধান্ত নেয়া, মনে মনে যোগ করা, এবং আমাদের অন্যসব সচেতনাবস্থা—এসব ব্যাপারেই, অন্যের সযত্ন পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নয়, বরং আমাদের নিজেদের অবস্থার অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই আমরা আসল অবস্থাটিকে জেনে থাকি। তারপর আমরা জানি কোন্ কোন্ অবস্থার সঙ্গে কোন্ কোন্ শব্দের সংযোজন করতে হবে; আর এটাই হল সেসব অবস্থার নির্দেশক উক্তিসমূহের 'অর্থ'। উত্তম-পুরুষ বিবরণের অনুসারীগণ এভাবে তাদের তত্ত্বকে প্রকাশ করতে পারেন: "সচেতন হওয়া", "ব্যথার কোন সংবেদন থাকা", "ক্রোধ অনুভব করা" প্রভৃতি কথার অর্থ আমরা আভ্যন্তরীণ অভিজ্ঞতালাভ এবং ওই ধরনের বিভিন্ন আভ্যন্তরীণ অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঠিক শব্দ সংযোজন করতে শেখা মাধ্যমেই বুঝতে পারি।

অভিপ্রায়তত্ত্ব

রূপবিদ্যা (phenomenology) নামে এরূপ একটি দার্শনিক চিন্তাধারা রয়েছে, যার মতে সতর্ক পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে চেতনার আভ্যন্তরীণ প্রকৃতিকে (যাকে জি, ঈ, ম্যুর "স্বচ্ছ" ["diaphanous"] বলে উল্লেখ করেছেন) পর্যালোচনা এবং এর স্বরূপকে ব্যাখ্যা করা যায়। এ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এই চিন্তাধারা জার্মান দার্শনিক এডমাণ্ড হুসার্ল (Edmund Husserl) প্রতিষ্ঠিত করেন, এবং এর অনুসারীদের অনেকেই আজও ইউরোপে আছেন (যদিও এর প্রতি বেশ জোরালো এবং, বাস্তবিকপক্ষে, ক্রমবর্ধমান আগ্রহ রয়েছে উত্তর আমেরিকায়)। হুসার্ল মনে করেন ঃ

> আমরা চিন্তা, মূল্য ইত্যাদি মুহূর্তের বিষয়বস্তুর উপর মনোনিবেশ করতে অভ্যস্ত, সেসব মানসিক "অভিজ্ঞতার ক্রিয়া"-য় নয় যেগুলোতে এদের উপলব্ধি করা হয়। এই "ক্রিয়া" একটি "চিন্তন"-এর (reflection) মাধ্যমে ব্যক্ত হয়; এবং চিন্তনকে যে-কোন অভিজ্ঞতার উপর ব্যবহার করা যায়। মূল্য, উদ্দেশ্য, উপযোগিতা ইত্যাদি বিষয়ের পরিবর্তে, যেসব বিষয়ীগত অভিজ্ঞতায় (subjective experiences) এদের "উপস্থিতি ঘটে," আমরা তাদেরই বিবেচনা করি।[১]

চেতনা সম্পর্কিত আমার নিজস্ব অবস্থা-সমূহের উপর আমি যদি সঠিক চিন্তা করি (এবং এ কাজের জন্য অনুসরণযোগ্য কিছু নিয়ম হুসার্ল দিয়েছেন), তা হলে আমি "যা মানসিক তার প্রকৃতি কি তা এভাবে জানতে এবং আত্মার সত্তাকে উপলব্ধি করতে থাকব", এবং আমি যদি শেষ পর্যন্ত এ পদ্ধতি অনুসরণ করি, তা হলে "অবশেষে আমি চেতনার মৌলিক গঠনের মুখোমুখি হব"।[২]

হুসার্ল এবং তাঁর অনুসারীরা চেতনার বিভিন্ন অবস্থার অনেক সযত্ন ও বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন; সে যা হোক, যখন চেতনার কোন সাধারণ বৈশিষ্ট্য-বর্ণনা প্রদানের কথা ওঠে তখন তাঁরা পূর্ববর্তী চিন্তাবিদ্ ফ্রেঞ্জ ব্রেন্তানোর (Franz Brentano) দেয়া একটি তত্ত্বের শরণাপন্ন হন। ব্রেনতানো যদিও হুসার্লের

---

১ Edmund Husserl, "Phenomenology", Encyclopaedia Britanica, ১৪ শ সংস্করণ, ১৯২৯, যা Roderick M. Chisholm-এর *Realism and the Background of Phenomenology* (New York : The Free Press, 1960) নামক পুস্তকটিতে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে, পৃষ্ঠা ১১৯।

২ ঐ, পৃ : ১২০, ১২৫।

শিক্ষক ছিলেন এবং ওই আন্দোলনের অগ্রগতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব খাটিয়েছিলেন, তবুও কিন্তু তিনি নিজে একজন রূপবাদী ছিলেন না।

ব্রেন্‌তানো লক্ষ্য করেছিলেন যে, চেতনাকে শুধু অচেতনা (unconsciousness) থেকেই পার্থক্য করা হয় না; আমরা এর কিংবা ওর 'সম্বন্ধে' সচেতন হওয়ার কথাও বলি, যেমন বলি "সে তার মাথার চামড়াতে তীব্র যন্ত্রণা সম্বন্ধে সচেতন ছিল"। ব্রেন্‌তানো এ দাবী করতেন যে, চেতনা সর্বদাই কোন 'কিছুর' চেতনা, তা সব সময় কোনকিছু 'সম্বন্ধে' এবং সে-জিনিসটির 'দিকেই চালিত'। এই 'সাম্বন্ধিকতা' (aboutness)-কেই তিনি চেতনার মৌলিক বৈশিষ্ট্য বলে মনে করতেন; যে-কোন মানসিক অবস্থার এই বৈশিষ্ট্য থাকতেই হবে, এবং কোন দৈহিক অবস্থার তা থাকতে পারে না।

বর্তমানে অভিপ্রায়তত্ত্ব (The thesis of intentionality) নামে কথিত ব্রেন্‌তানোর দাবীটি সাম্প্রতিক বিতর্কের একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।[১] অনেক দার্শনিক বিশ্বাস করেন যে, "সাম্বন্ধিকতা"র এই বৈশিষ্ট্য চেতনার আবশ্যিক কিংবা পর্যাপ্ত শর্তের কোনটিই নয়।[২] তবে আমাদের বর্তমান আলোচনার উদ্দেশ্যে এটুকু মনে রাখা যথেষ্ট যে, নাম-পুরুষ বিবরণ এবং উত্তম-পুরুষ বিবরণের মধ্যকার বিতর্কের ব্যাপারে কোন কিছুই এখানে আমাদের সাহায্য করে না। কারণ, অভিপ্রায়তত্ত্বটি যদি সঠিকও হয়, তবুও "সাম্বন্ধিকতা"-র প্রকৃতি কি?—এ প্রশ্নটি থেকে যায়। এবং এমন লোকও আছেন যাঁরা বলবেন, যেমন, "নেব্রাস্কায় তাঁর শৈশবকাল সম্বন্ধে চিন্তা"-র অর্থকে আচরণ অথবা আচরণ-প্রবণতার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করতে হবে; আবার, এমন লোকও আছেন যাঁরা বলবেন যে, যিনি নিজে ঐ চিন্তার অবস্থায় আছেন তাঁর দ্বারা পরিচালিত অন্তর্দর্শনমূলক পরীক্ষার মাধ্যমেই কেবল এর অর্থ দেয়া যেতে পারে। সুতরাং, আলোচ্য মতবাদটি সঠিকই হোক অথবা ভ্রান্তই হোক, আমরা এখানে

---

১ Chisholm সম্পাদিত *Realism and the Background of Phenomenology*-র পৃঃ ৩৯-৬১-তে Brentano-র উক্তিটি দেখতে পাওয়া যাবে। Chisholm-এর *Perceiving*-এ (Ithaca, N. Y.: Cornell University Press. 1957), ২য় অধ্যায়ে একে বিস্তৃত ও সমর্থিত করা হয়েছে।

২ যেমন: Herbert Heidelberger-এর "On Characterizing the Psychological", *Philosophy and Phenomenological Research*, ২৬তম খণ্ড, সংখ্যা-৪: ৫২৯-৩৬ দ্রষ্টব্য।

'অ-জড়' (non-material) বস্তুতে ঘটে থাকে। এ মতের প্রবক্তারা এসব অ-জড় বস্তু ছাড়াও বিশুদ্ধ 'জড়' (material) বস্তুর অস্তিত্ব সাধারণতঃ স্বীকার করে থাকেন, এজন্য এদেরকে দ্বৈতবাদী (Dualists) বলা হয়। (২) পরবর্তী মতবাদটি হচ্ছে যে, সে-গুলো বিশুদ্ধ জড় বস্তুতে ঘটে থাকে; একে আমরা জড়বাদ (materialism) বলব। (৩) আর একটি মতবাদ হল যে, সে-গুলো ওইসব বস্তুতে ঘটে থাকে যা পুরোপুরি জড়ও নয়, আবার পুরোপুরি অ-জড়ও নয়; একে আমরা ব্যক্তিতত্ত্ব (Person theery) বলব। এদের প্রত্যেকটিকে পর্য্যয়ক্রমে আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হবে।

দ্বৈতবাদ

ফরাসী দার্শনিক দেকার্তের দেয়া তত্ত্বটিই হচ্ছে সবচেয়ে সুসংবদ্ধ (systematic) দ্বৈতবাদী তত্ত্ব। তিনি বলেছেন, চেতনার কর্তা হল 'মন' এবং মন হল দেহ থেকে পৃথক এবং সুষ্ট একটি বস্তু বা সত্তা। দেহ হল একটি বস্তু বা সত্তা যার সারধর্ম (সংজ্ঞায়নের বৈশিষ্ট্য) হল স্থান দখল করা, অর্থাৎ, স্থানে আকৃতি, আয়তন ও অবস্থিতি থাকা; এবং এটি কোন অর্থেই চেতন নয়। অপরদিকে, প্রকৃতির দিক থেকে মন সম্পূর্ণরূপে পৃথক। এটি একেবারেই অ-বিস্তৃত, এবং আকৃতি, আয়তন বা অবস্থান এসবের কোনটিই এর নেই। শুধু চেতনা থাকা, অর্থাৎ চিন্তা, অনুভূতি, স্মৃতি, প্রত্যক্ষণ, কামনা, আবেগ ইত্যাদি থাকা এর সারধর্ম (সংজ্ঞায়নের বৈশিষ্ট্য)।

দেকার্ত বলেছেন যে, যেহেতু মন এবং দেহ পৃথক সত্তা সে-কারণেই এদের প্রত্যেকটিই অপরটিকে ছাড়া অস্তিত্বশীল থাকতে পারে। একথা স্পষ্ট ও অনস্বীকার্য যে, 'কতকগুলো' বস্তু, যেমন পাথর এবং হ্রদ, মন ব্যতিরেকেই প্রকৃতপক্ষে অস্তিত্বশীল থাকে--দেকার্তের এ মত অন্ততঃ ঠিক। দেকার্ত নিজেও বিশ্বাস করতেন যে, জীব-জন্তু ও (মানুষ ছাড়া) মনহীন দেহের দৃষ্টান্ত। কেউ কেউ এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে একমত না হতে পারেন, এবং মন যে দেহ ব্যতিরেকেই অস্তিত্বশীল হতে পারে তাঁর এ মতের সাথেও একমত না হতে পারেন। দেকার্ত বিশ্বাস করতেন যে, মন হল অমর, এবং দেহের মৃত্যুর পরে অশরীরী অবস্থায় মনের অস্তিত্ব বজায় থাকতে পারে।

দেকার্তের বর্ণনার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ফাঁক (gap) রয়েছে, যা এইমাত্র-প্রদত্ত সংক্ষিপ্তসারে লক্ষ্য করা যেতে পারে। চেতনাসম্পন্ন মনের সারধর্ম হল এক জিনিস, এবং স্থান দখলকারী দেহের সারধর্ম হল অন্য জিনিস —এ থেকে এটা অনুসৃত হয় না যে, মন এবং দেহ হচ্ছে 'দুটি পৃথক সত্তা'। একই জিনিসের এ 'দুটি' গুণ থাকতে পারে, একই জিনিস এক সঙ্গে চিন্তাশীল বস্তু এবং বিস্তৃত বস্তু 'উভয়ই' হতে পারে—এর সম্ভাবনা নাকচ হতে পারে কিভাবে? স্বামী হওয়ার সারধর্ম অর্থাৎ সংজ্ঞায়নের বৈশিষ্ট্য হল বিবাহিত হওয়া, এবং পিতা-মাতা হওয়ার সারধর্ম হল সন্তানের অধিকারী হওয়া, কিন্তু একই ব্যক্তি একই সঙ্গে স্বামী 'এবং' পিতামাতা উভয়ই হতে পারে (এবং ঘটতঃই এদের একটি না হয়েও অপরটি হতে পারে)। দেকার্তের যুক্তির এ ফাঁকটি প্রথম দেখিয়েছিলেন স্পিনোজা (Spinoza), যিনি দেকার্তের অনুসারী ছিলেন। স্পিনোজা উপলব্ধি করেছিলেন যে, "যদিও দুটি গুণকে প্রকৃতপক্ষে পৃথক বলে ধারণা করা যেতে পারে"—এবং এখানে তিনি চিন্তা ও বিস্তারের (thinking and extension) কথা মনে করেছেন—"তবুও আমরা তা থেকে এ সিদ্ধান্তে আসতে পারি না যে, তারা দুটি সত্তা অথবা দুটি পৃথক দ্রব্য (substances)"।[১] এরপর, দেকার্ত থেকে সম্পূর্ণরূপে ভিন্নমত পোষণ করে স্পিনোজা বলেন যে, মানুষের ক্ষেত্রে (এবং, প্রকৃতপক্ষে, স্পিনোজার বেলায়, অন্যসব ক্ষেত্রেও) চিন্তন এবং স্থান-দখল উভয়ই একই বস্তুর গুণাবলী। এ মতবাদটি দ্বিমুখী তত্ত্ব (Double aspect theory) শিরোনামে পরে আলোচিত হবে।

তথাপি, দেকার্ত এ ধারণা পোষণ করতেন যে একই বস্তু স্থান-দখলকারী ও চিন্তাশীল বস্তু উভয়ই হতে পারে না। তিনি হয়ত ভেবেছিলেন, এসব বৈশিষ্ট্য তাদের প্রকৃতিতে স্পষ্টতঃই এত পৃথক যে একই বস্তু উভয়ের অধিকারী হতে 'পারে' না। তিনি বিষয়টিকে এভাবে উল্লেখ করেন—বিস্তৃত বস্তু বিভাজ্য, কিন্তু চিন্তাশীল বস্তু বিভাজ্য নয় (দেকার্তের ষষ্ঠ 'অনুধ্যান' দ্রষ্টব্য)। কিন্তু এটি হল একটা খুবই দুর্বল যুক্তিপদ্ধতি। যেহেতু চিন্তন এং স্থানদখল পৃথক ধরনের বৈশিষ্ট্য, সেহেতু স্বাভাবিকভাবেই তাদের মধ্যে পার্থক্য থাকবে। বিস্তৃত বস্তু অনিবার্যভাবেই (necessarily) বিভাজ্য হবে (আমার মনে হয়, দেকার্ত এখানে দৈশিকভাবে কোন কিছুর বিভাজনের কথা

১ *Ethics* খণ্ড-১, প্রতিজ্ঞা-১০, টীকা।

মনে করেছেন), এবং অ-বিস্তৃত বস্তু, যেমন অশরীরী (disembodied) মন, এভাবে বিভাজ্য হবে না। কিন্তু তা বলার অর্থ হচ্ছে, এখানে আমাদের পৃথক বৈশিষ্ট্যাবলী রয়েছে। যে বস্তু চিন্তা করে তা যদি একই সাথে একটি বিস্তৃত বস্তু হত তা হলে সেটি বিভাজ্য হত। সুতরাং, বিস্তৃতি ও চিন্তনের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করতে এটা বোঝায় না যে, বস্তুর একটি গুণ থাকলে অপরটি থাকতে পারে না। সম্ভবতঃ দেকার্তের মনে এ ধারণ ছিল যে, বিস্তৃতি ও চিন্তন খুবই পৃথক, মৌলিকভাবেই পৃথক। অবশ্য, তিনি বলতে পারেন যে একটি বস্তু লাল ও গোল উভয়ই হতে পারে, কিন্তু কোন বস্তু কি লাল ও চিন্তাশীল উভয়ই হতে পারে? এখানেও আবার যুক্তির পদ্ধতিটি দুর্বল। লাল হওয়া, মূল্যবান হওয়া এবং পবিত্র হওয়া খুবই ভিন্ন ধরণের গুণাবলী, কিন্তু তবুও একই বস্তু, যেমন কোন নির্দিষ্ট মণি, এ তিনটিই হতে পারে। সুতরাং, আমরা এখনও একথা ভাববার কোন জোরালো যুক্তি পাই না যে, চিন্তাশীল বস্তু বিস্তৃত হতে, কিংবা বিস্তৃত বস্তু চিন্তাশীল হতে পারে না।

চিন্তা-গুণান্বিত বস্তু ও বিস্তৃত বস্তু যে 'পৃথক' সত্তা তার সপক্ষে কোন যুক্তি দিতে দ্বৈতবাদী যদিও ব্যর্থ হন, তবুও এ ধরনের একটি মতবাদ সত্য হতে পারে। এবং তা যে সঠিক নয় এমন মনে করার মত কোন কারণ আমরা এখনও দেখি নি। সুতরাং, সে-গুলো যে পৃথক সত্তা, দ্বৈতবাদীর এই দাবী, এ মুহূর্তে, অনুমোদন করা যাক। আমরা যদি এরূপ করি, তাহলে এ প্রশ্নটি উঠবে যে, এই পৃথক সত্তা দুটির মধ্যে আদৌ যদি কোন সম্পর্ক থেকে থাকে তাহলে সে সম্পর্কটা কি রকমের। এখানেই আমরা দর্শনে ঐতিহ্যগতভাবে দেহ-মন সমস্যা নামে পরিচিত সমস্যাটির সম্মুখীন হয়ে পড়ছি।

প্রচলিত দেহ-মন সমস্যা

দেহ-মন সমস্যার একটি পূর্ণাঙ্গ আলোচনা চতুর্থ অধ্যায়ের জন্য সংরক্ষিত রাখা হবে। কিন্তু দ্বৈতবাদ সম্পর্কে একটা অপেক্ষাকৃত উত্তম ধারণালাভের জন্য প্রস্তাবিত বিভিন্ন তত্ত্বের (theories) প্রতি আমরা এখানে সংক্ষিপ্ত দৃষ্টি নিবদ্ধ করব। দেকার্ত নিজেই বিশ্বাস করতেন যে, কখনো কখনো মন দেহকে কারণিকভাবে (causally) প্রভাবিত করে, এবং কখনো কখনো দেহ মনকে কারণিকভাবে প্রভাবিত করতে পারে ; এই মতবাদকে পারস্পরিক ক্রিয়াবাদ (Interactionism) বলা হয়। প্রথমোক্তটির একটি দৃষ্টান্ত এমন একটি ঘটনা হতে পারে যে, চিন্তা করার পর আমি

বোতাম টেপার কথা ঠিক করি (একটি মানসিক ঘটনা) এবং তখন আমার হাত তা করার জন্য সম্প্রসারিত হয় (একটি দৈহিক ঘটনা); শেষোক্তটির একটি দৃষ্টান্ত এমন একটি ঘটনা হতে পারে যে, গতিশীল হাত (একটি দৈহিক ঘটনা) বোতামের সংস্পর্শে আসে এবং বোতামটিতে আমি চাপ দিলে যে কি ঘটতে পারে সে-সম্পর্কে আমার মধ্যে একটি ভয়ের অনুভূতি (একটি মানসিক ঘটনা) সৃষ্টি করে।

পারস্পরিক ক্রিয়াবাদ দেহ-মন সম্বন্ধের একমাত্র দ্বৈতবাদী তত্ত্ব নয়। কোন কোন দার্শনিক বলেছেন যে, দেহ থেকে মনের দিকে শুধু একটি এক-মুখী কার্য-কারণ সম্পর্ক (causality) থাকতে পারে; এই মতবাদ উপ-ঘটনাবাদ (Epiphenomenalism) নামে পরিচিত। উপ-ঘটনাবাদী পারস্পরিক ক্রিয়াবাদের মতের সেই অর্ধাংশ গ্রহণ করেন যেখানে বলা হয় যে দৈহিক ঘটনা মানসিক ঘটনাকে সংঘটিত করতে পারে। কিন্তু উপ-ঘটনাবাদী অপর অর্ধাংশকে অস্বীকার করেন; মানসিক ঘটনা যে কখনো দৈহিক ঘটনার কারণ হতে পারে তা তিনি স্বীকার করেন না। মনে যা-ই ঘটে তা দৈহিক ক্রিয়ার (খুব সম্ভব, মস্তিষ্ক-ক্রিয়ার) একটি উপজাত (by-product) মাত্র। যে মতটিকে, অর্থাৎ দৈহিক ঘটনা 'সর্বদাই' মানসিক ক্রিয়ার ফলশ্রুতি মাত্র, আমরা বিপরীতমুখী উপ-ঘটনাবাদ (reverse epiphenomenalism) বলতে পারি, সে-সম্পর্কে কোন নাম করা দার্শনিক কখনো কিছু বলেন নি। খ্রীস্টীয় বিজ্ঞানের ধর্ম এ মতবাদের কিছুটা কাছাকাছি এসে পড়ে, এবং এই ধর্মমতানুসারে দৈহিক ঘটনাবলী, বিশেষ করে স্বাস্থ্য ও রোগ-সম্পর্কিত ঘটনাসমূহ, মানসিক ক্রিয়ার ফলশ্রুতি। অনেক খ্রীস্টীয় বৈজ্ঞানিক এও বলবেন যে, 'সকল' দৈহিক ঘটনাবলী, উদাহরণস্বরূপ প্রত্যক্ষণের সময় আমাদের ইন্দ্রিয়ের কার্যাবলী, সম্পূর্ণভাবে মানসিক ক্রিয়া দ্বারা সংঘটিত হয়। এটি অঠারো শতকের আইরিশ দার্শনিক জর্জ বার্কলির (George Berkeley) মতবাদ, যাঁর মতে যা-কিছু কখনো ঘটে থাকে তা শুধু মনের মধ্যেই ঘটে। বার্কলির মতবাদ কোন দ্বৈতবাদ নয়; তিনি বলেন যে, শুধু মনই অস্তিত্বশীল, এবং জড় পদার্থ, বিশেষভাবে জড়বস্তুসমূহ, মন ব্যতিরেকে আদৌ অস্তিত্বশীল নয়।

সবশেষে রয়েছে সমান্তরালবাদ (Parallelism) নামে পরিচিত দ্বৈতবাদী তত্ত্বটি। সমান্তরালবাদী মানসিক ঘটনা ও দৈহিক ঘটনার নিকট সম্পর্ক স্বীকার করেন, কিন্তু তিনি একথা বলতে চান না যে সম্পর্কটি হচ্ছে কোন কারণিক সম্পর্ক। কারণ, তিনি মনে করেন যে, মন ও দেহ একেবারে এতই পৃথক যে কারণিকভাবে একটি অপরটির উপর ক্রিয়া করতে সক্ষম নয়। সুতরাং, সমান্তরালবাদী মনে করেন যে, মন ও দেহ হচ্ছে দুটি ঘড়ির মত, যেখানে দুটিরই নিজস্ব কার্য-পদ্ধতি (mechanism) রয়েছে এবং তাদের মধ্যে কোন কারণিক সম্পর্ক নেই, তবুও এরা সবসময়ই পর্যায়ক্রমে (in phase) একই সময় দিচ্ছে।

দ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ

আজকাল দ্বৈতবাদী মতগুলোকে বেশী পছন্দ করা হয় না। সে-গুলো সম্পর্কে অপছন্দের দুটি প্রধান উৎস রয়েছে। (১) বস্তু বা সত্তা হিসাবে মনের ধারণাকে বোধগম্য করা যেতে পারে কিনা সে-সম্পর্কে অনেক দার্শনিকেরই সবিশেষ সন্দেহ রয়েছে। (২) এমন-কি, একে বোধগম্য করা গেলেও এ থেকে জগৎবিষয়ক যে মতবাদ পাওয়া যায় তা অনেকের কাছেই অনাবশ্যকভাবে জটিল বলে মনে হয়। অপছন্দের এ দুটি উৎস নিয়ে আমরা পর্যায়ক্রমে আলোচনা করব।

(১) দ্বৈতবাদীরা আমাদিগকে বলেন যে, দৈনন্দিন জীবনের পরিচিত বস্তু, যেমন টেবিল, পাথর, চুল, মেঘ, বাতাস, সংক্ষেপে জড়বস্তু—এগুলো ছাড়াও মন বলে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের বস্তুসমূহের অস্তিত্ব রয়েছে। এই মনগুলো হচ্ছে বাস্তব জিনিস, বাস্তব বস্তু, বাস্তব সত্তা, কিন্তু এগুলো জড়বস্তু থেকে মৌলিকভাবে ভিন্ন প্রকৃতির। তাহলে মন জিনিসটা কি? এটি কি কোন বিশেষ ধরনের উপাদান, অ-জড় বস্তু, অবাস্তব পদার্থ (insubstantial substance), অশরীরী দেহ? এর কোন বিস্তার নেই বলে মনে করা হয়, অর্থাৎ, কোন আকার, আকৃতি বা স্থান-দখলের ক্ষমতা নেই; একে চোখে দেখা যায় না, স্পর্শে অনুভব করা যায় না,—কিংবা কোন অনুবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমেও দেখা যায় না, সে যন্ত্র যতই শক্তিশালী হোক, এবং নিরীক্ষণকারী যন্ত্রগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সূক্ষ্ম যন্ত্রের কাছেও এ স্পর্শযোগ্য নয়। মন সম্ভবতঃ কোন মাধ্যাকর্ষণমূলক, চুম্বকশক্তিপূর্ণ বা বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের[১] মত? কিন্তু তা হতে পারে

---

১ a gravitational, magnetic or electrical field.

না, কারণ দ্বৈতবাদীর প্রকল্প (hypothesis) অনুযায়ী মন কোনভাবেই ভৌত কিছু নয়; যদি এটি ওসবের মত হত বা কোন ধরনের ভৌত শক্তির মত হত, তাহলে এ একটি 'ভৌত' ঘটনা হত, এবং তখন আমরা আর দ্বৈতবাদী থাকতাম না। তবুও যদি এটি একেবারেই সে-রকম কোন জিনিস না হয়, তাহলে কি অর্থে মনকে আদৌ একটি বস্তুরূপে গণ্য করা যায়? অস্তিত্বশীল বস্তু হিসাবে মনের ধারণার আমরা কি অর্থ সংযোজন করতে পারি?

সমস্যাটি দুটি বিশেষ পদ্ধতিতে দেখা দেয়ঃ সনাক্তকরণের (identification) এবং স্বতন্ত্রীকরণের (individuation) সমস্যায়। প্রথম সমস্যাটি হল এ রকমঃ আমরা যখন 'খ'-এর পরিবর্তে 'ক' নামক কোন মনের নিকটবর্তী হই—অথবা, এমন-কি, অন্য যে-কোন মনেরই নিকটবর্তী হই না কেন—তখন আমরা সে-কথা কিভাবে বলতে পারি? যেহেতু দ্বৈতবাদী ব্যাখ্যানুযায়ী, আমাদের কোন পর্যবেক্ষণ দ্বারা অন্য কোন মনকে উদ্‌ঘাটন করা যায় না, সেহেতু একথা চিন্তা করার কোন যুক্তি থাকা অসম্ভব যে আমরা অন্য কোন মনকে 'ক' বা 'খ' হিসাবে চিহ্নিত করতে পারি। সুতরাং, আমরা কখনই যথাযথভাবে এটা বিশ্বাস করতে পারি না যে আমরা অন্য কারো সাথে কথা বলছি। এবং মনের কোন ধারণা, যা যথাযথভাবেই অন্য কোন বস্তুর প্রতি সেই ধারণার প্রয়োগকে অসম্ভব করে তোলে, তা বোধগম্য হলেও সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়।

দুটি পৃথক মন থাকতে পারে একথা ধরে নিলেও, কোন্ জিনিসটি দুটি মনকে পৃথক করে তা-ই হচ্ছে স্বতন্ত্রীকরণের সমস্যাটির আলোচ্য বিষয়। একটি উত্তর হতে পারে যে, প্রত্যেকেরই কোন কোন সময়ে পৃথক মানসিক ঘটনা ছিল বলে তাদের পৃথক পৃথক মানসিক ইতিহাস রয়েছে। একথা মনে করা সম্পূর্ণরূপে বোধগম্য হবে যে, মানসিক ঘটনাবলীর সঠিক ইতিহাস সম্বলিত আমাদের দুটি পৃথক মন (এদের প্রত্যেকটি ঠিক একই পদ্ধতিতে গড়ে উঠে থাকতে পারে) কোন সময়ে থাকতে পারে। আর, দুটি সম্পূর্ণ অনুরূপ মনের এ ধারণা যদি বোধগম্য হয়, তা হলে কোন্ জিনিসটি তাদেরকে একই মনের পরিবর্তে দুটি পৃথক মন করবে? এখানে দ্বৈতবাদীর কোন উত্তর আছে বলে মনে হয় না। তাঁকে অবশ্যই বলতে হবে যে তারা পৃথক, এবং তবুও কিভাবে বা কোন দিক থেকে তারা পৃথক একথা তিনি বলতে পারেন না। এর কি কোন অর্থ আছে?

(২) মনের যে অস্তিত্ব আছে এ দাবীর প্রতি আমরা যদিও কোন 'অর্থ' আরোপ করতে সমর্থ হই, তবুও অনেক সমসাময়িক দার্শনিক মনের যে প্রকৃতই অস্তিত্ব আছে সে দাবীকে প্রত্যাখ্যান করেন। তারা সে-মন্তব্যই করেন, যা জগতে ঈশ্বরের ভূমিকা প্রসঙ্গে নেপোলিয়ানের (Napoleon's) প্রশ্নের উত্তরে ফরাসী জ্যোতির্বিদ লাপ্‌লাস্ (Laplace) করেছিলেন। লাপ্‌লাস্ বলেছিলেন ঃ "মহাশয়, সে প্রকল্পের কোন প্রয়োজন নেই"। এভাবে অনেক দার্শনিক যুক্তি দিবেন যে, জগতে যা কিছু ঘটে তার সব কিছুতেই মনের ধারণাকে ব্যবহার না করেই শুধু ভৌত ঘটনা ও প্রাকৃতিক নিয়মের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করা যায়।

মনের আদৌ অস্তিত্ব নেই এবং যা কেবল ভৌত তা-ই অস্তিত্বশীল--এই মতবাদকে জড়বাদ (Materialism) বলা হয়। আমরা এখন এ মতবাদটি নিয়ে আলোচনা করব।

জড়বাদ

প্রাচীনতম তত্ত্বগুলোর মধ্যে জড়বাদ একটি। খ্রীস্টপূর্ব চার ও পাঁচ শতকের প্রাচীন গ্রীকদের নিকট এটি ছিল একটি পরিচিত মতবাদ। এ মতবাদের প্রবক্তা ডেমোক্রিটাস (Democritus) বলেছিলেন যে, জড়-পরমাণু (material atoms) ও শূন্যতা (the void) ছাড়া আর কিছুই অস্তিত্বশীল নয়, এবং জগতের সব কিছুই শূন্যের মধ্যে বিচরণশীল এসব পরমাণুর পারস্পরিক ক্রিয়া (interactions) ব্যতীত আর কিছুই নয়। এমন-কি মানুষের অতি জটিল আচরণকেও পরমাণুগুলোর পারস্পরিক-ক্রিয়াতে পর্যবসিত করা যায়। একজন আধুনিক জড়বাদী "পরমাণু ও শূন্যতা"-র চেয়ে অধিকতর জটিল অবস্থার কথা সমর্থন করবেন। এখানে তিনি উন-আণবিক কণার (subatomic particles) এবং বিপরীত কণার (antiparticles), বৈদ্যুতিক চুম্বক প্রবাহের (electromagnetic waves), "শূন্যতা" সম্পর্কিত একটি আপেক্ষিক মতবাদের (a relativized view of "the void"), বিভিন্ন ধরনের বল (forces) ও শক্তির (energies) এবং সমকালীন পদার্থবিদ্যার অপরাপর প্রত্যয়গত সরঞ্জামের (conceptual apparatus) প্রসঙ্গ তুলবেন। কিন্তু তবুও তিনি বলবেন যে, এ ধরনের ভৌত ঘটনাবলী (physical phenomena) ছাড়া আর কিছুরই অস্তিত্ব নেই ; "চিন্তা", "অনুভূতি", "ইচ্ছা" ইত্যাদি শব্দের কোন অর্থ যদি আদৌ থাকে, তাহলে চূড়ান্ত বিশ্লেষণে সেগুলো ভৌত ঘটনাবলীকে

নির্দেশ করবেই। তথাকথিত মানসিক ঘটনাবলী আসলে ভৌত বস্তুতে (physical objects) সংঘটিত ভৌত ঘটনা (physical events) ব্যতীত আর কিছুই নয়।

এখানে বর্ণিত জড়বাদকে, প্রারম্ভেই, উপঘটনাবাদ নামক অপর যে মতবাদটির কথা পূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি (উপরে পৃষ্ঠা ৫২ দ্রষ্টব্য) তা থেকে আমাদের পৃথক করে দেখা উচিত। শেষোক্তটি হল একটি দ্বৈতবাদী মতবাদ যা মনকে দেহ থেকে পৃথক ও সম্পূর্ণ আলাদা গণ্য করে, কিন্তু সেই সঙ্গে একথার উপরও জোর দেয় যে, মন কারণিকভাবে দেহের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল এবং মনে যা কিছু ঘটে তার সবই দেহাভ্যন্তরস্থ ঘটনার ফল এবং দেহকে কোনভাবে প্রভাবিত করার পক্ষে মন সম্পূর্ণভাবে শক্তিহীন। এ ধরনের মতবাদকে প্রায়শঃই জড়বাদ বলা হয়, কেননা, এটি বস্তুর জড় দিকের উপর সর্বাধিক 'গুরুত্ব' আরোপ করে থাকে। এই অর্থেই কার্ল মার্ক্স্ (Karl Marx) জড়বাদী ছিলেন, কারণ তিনি বলেছিলেন যে, "ধারণা, চিন্তা, মানুষের মানসিক যোগাযোগ প্রভৃতি মানুষের জড় আচরণের (material behaviour) প্রত্যক্ষ নিঃসরণ (efflux) হিসাবে (আদিতম) স্তরে দেখা দেয়"।[১] এটা লক্ষ্য করতে হবে যে, কার্ল মার্ক্স্ একথা বলেন না যে মানুষের ধারণা চিন্তা, মানসিক যোগাযোগ তাদের জড় আচরণ ছাড়া 'আর কিছুই নয়'। ও কথা বললে সেটা, আমরা এখানে জড়বাদের যে বিবরণ দিয়েছি সে-অনুসারে, জড়বাদ হত। তিনি বলেন যে, এসব হচ্ছে নিঃসরণ, অর্থাৎ এমন একটি 'পৃথক', 'অ-জড়' বহির্প্রবাহ (outflow) যা জড় আচরণ থেকে জন্ম নেয় ও ও উৎসারিত হয়। এ ধরনের মতবাদ আমাদের অর্থে জড়বাদী মতবাদ নয়।

জড়বাদীরা মনে করেন, বস্তু, শক্তি এবং শূন্যতা—এসব ভৌত বস্তু ছাড়া আর কোন কিছুরই অস্তিত্ব নেই। কিন্তু তাহলে চিন্তা, অনুভূতি, ইচ্ছা এবং অন্যান্য তথাকথিত মানসিক ঘটনাবলী প্রকৃতপক্ষে কি? এখানে চারটি বিভিন্ন উত্তর গুরুত্ব সহকারে প্রস্তাবিত হয়েছে। খুবই কম সংখ্যক অনুসারী কর্তৃক সমর্থিত সবচেয়ে চরম মতবাদটি হল যে, এ ধরনের শব্দাবলীর আদৌ কোন প্রকৃত অর্থ নেই, এবং সে-গুলোকে ভাষা থেকে বাদ দেয়া উচিত। এগুলো হচ্ছে আমাদের ভাষার এমন পরিবৃদ্ধি (accretion) যা ধর্মের কায়েমী স্বার্থ

---

১ Karl Marx and Friedrich Engels, *The German Ideology* (New York: International Publishers, 1947), P. 14.

এবং যাদুবিদ্যা (black arts) দ্বারা লালিত-পালিত কুসংস্কার ও অজ্ঞতার ভেতর দিয়ে গড়ে উঠেছিল এবং আলস্যবশতঃ মানুষ যার ত্রুটি উপেক্ষার চোখে দেখেছে। এই মতবাদানুযায়ী মননধর্মী শব্দাবলীকে (mentalistic terms) যাদুবিদ্যা (witchcraft) ও ভূতাবেশ-এর (demonic possession) ভাষার দুর্দশা ভোগ করতে দেয়া উচিত। আমরা একে অ-বোধগম্যতার মতবাদ (unintelligibility thesis) বলতে পারি।

এই অ-বোধগম্যতার মতবাদ সমকালীন দার্শনিদের মাঝে তেমন সমর্থন পায়নি। প্রথমতঃ, একথা স্পষ্ট যে যাদুবিদ্যা এবং ভূতাবেশ-এর ভাষা কেন অবলুপ্ত হয়েছে—বিজ্ঞান মোটামুটি চূড়ান্তভাবেই দেখিয়েছে যে বাস্তবে এ ধরনের কোন ব্যাপারের অস্তিত্ব নেই। হয়ত যাদুকরী (witches) ছিল, এবং, সে ক্ষেত্রে, এমন একটি বিজ্ঞান থাকতে পারত যা তাদের সম্পর্কে এবং তারা কিভাবে তাদের কাজকর্মে সাফল্যলাভ করে তা নিয়ে চর্চা করে; কিন্তু প্রামাণিক তথ্য (evidence) থেকে বোঝা যায় যে, এমন কোন ব্যাপার নেই। কিন্তু, মননধর্মী শব্দাবলীর ক্ষেত্রে একথা বলা কঠিন। কি প্রকারের আবিষ্কার থেকে দেখা যাবে যে, চিন্তা, অনুভূতি, ইচ্ছা, বা এ ধরনের কোন কিছু নেই? অপরপক্ষে, এটা কি খুবই পরিষ্কার নয় যে এ রকম কোন জিনিস থাকতে পারে? এবং দ্বিতীয়তঃ, আমাদের তত্ত্বসমূহও যদি নির্দেশ করে যে মননধর্মী শব্দাবলীকে বর্জন করা বাঞ্ছনীয়, তবুও আমরা এদের বর্জন করতে পারি না, এবং অদূর ভবিষ্যতেও যে আমরা তা পারব তাও মনে হয় না। এর কারণ, আমরা প্রায়ই আমাদের চিন্তার কথা অন্যকে বলতে, অনুভূতিকে বর্ণনা করতে, ইচ্ছাকে প্রকাশ করতে চাই, এবং, এইমাত্র আমি চিন্তা করলাম ··· আমি অনুভব করি·····, আমি ইচ্ছা করি···, এ রকম বলা ছাড়া এসব করার অন্য কোন পথ আমাদের নেই। এরূপ উক্তিগুলোকে বাদ দেয়ার অর্থ হবে আমাদের ভাষাকে এমন দরিদ্র করে ফেলা (impoverish) যা আমাদেরকে দেউলিয়া করে তুলবে।

"চিন্তা, অনুভূতি, ইচ্ছা এবং এরূপ অন্যান্য জিনিস কি?"—এ প্রশ্নের আর একটি জড়বাদী উত্তরকে স্বীকারোক্তিসূচক তত্ত্ব (Avowal theory) বলা হয়। এই তত্ত্বানুসারে, "আমি বিরক্ত বোধ করছি," এ ধরনের বাক্যের অর্থ আছে ঠিকই, কিন্তু কোন 'উক্তি' করার জন্য, কোন কিছুকে বর্ণনা,

প্রতিবেদন বা সমর্থন করার জন্য এদের ব্যবহার করা হয় না। এরা আচরণের অংশ মাত্র, কতকগুলো আভ্যন্তরীণ (ভৌত) অবস্থার ফল। আমি যদি হাই তুলি (yawn), আমার বৃদ্ধাঙ্গুলিকে ঘুরাই-ফিরাই (twiddle) অথবা "ওহে হুঁ" ("Ho hum") বলি, তখন আমি কোন কিছুকে বর্ণনা, প্রতিবদন বা সমর্থন করছি না; আমি এমন কোন উক্তি করছি না যা সত্য বা মিথ্যা। স্বীকারোক্তিসূচক তত্ত্ব "আমি বিরক্তবোধ করছি" উক্তিটিকে (শিক্ষালব্ধ) আচরণর একটি অংশ বলে মনে করে—"ওহে হুঁ" কথাটির মতই, যা কতকগুলো আভ্যন্তরীণ (ভৌত) অবস্থার ফল এবং যা আদৌ কোন উক্তি, বর্ণনা, প্রতিবেদন বা সমর্থন নয়। এবং "এইমাত্র আমি চিন্তা করলাম যে,·····", "আমি ইচ্ছা করি যে·····,"এবং এরূপ অন্যান্য উক্তির ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য।

একথা অস্বীকার করা যায় না যে, স্বীকারোক্তিসূচক তত্ত্বে কিছুটা সত্য রয়েছে। এ ধরনের উক্তিগুলোকে কোন কোন সময় অবশ্যই আভ্যন্তরীণ অবস্থার প্রকাশ হিসাবে এভাবে ব্যবহার করা হয়—"আমি ক্লান্ত বোধ করছি", কখনো কখনো "ঈশ্বর! আমি ক্লান্ত।" অথবা এমন-কি "ঈশ্বর, কি ক্লান্তি!" ("Oh God, what boredom!")—এর মত উচ্চারিত হয়, এবং অন্ততঃ শেষোক্ত বিষয়টির বেলায় এটা স্পষ্ট যে, এখানে কোন উক্তি, বর্ণনা, প্রতিবেদন বা নিশ্চিত উক্তি করা হচ্ছে না। তবুও স্বীকারোক্তিসূচকতত্ত্ব দুটি গুরুত্বপূর্ণ দিক থেকে ভেঙ্গে পড়ে। প্রথমতঃ, "সে ক্লান্ত"এরূপ নাম-পুরুষ উক্তির ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ একেবারেই অযৌক্তিক বলে মনে হয়। এ ধরনের একটি মন্তব্যকে কিছুতেই আভ্যন্তরীণ অবস্থার প্রকাশ বলে গ্রহণ করা যায় না। দ্বিতীয়তঃ এ ধরনের উক্তির উত্তম-পুরুষ ব্যবহারেও এগুলোকে প্রায়শঃই শুধু প্রতিবেদন বা বর্ণনা করার জন্য ব্যবহার করা হয়। যদি কেউ আমাকে প্রশ্ন করে আমি কেন আমার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে থাকি, তা হলে আমি বলতে পারি "কারণ আমি ক্লান্ত" এবং এভাবে এমন একটি প্রতিবেদন করতে পারি যার মধ্যে আমার আচরণের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। অধিকন্তু, মিথ্যা উক্তি করার জন্য, যেমন, মিথ্যা কথা বলার সময় আমি এ ধরনের উক্তির ব্যবহার করতে পারি। "ওহে হু"—কে কোন কিছু ব্যাখ্যা করার জন্য বা কোন কিছু সম্পর্কে মিথ্যা বলার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে না। সুতরাং, স্বীকারোক্তিসূচক তত্ত্বটি খাটবে না।

আর একটি জড়বাদী মতবাদ স্বীকার করে যে, চিন্তা, অনুভূতি, ইচ্ছা ইত্যাদি সম্পর্কিত উক্তিগুলোর অর্থ আছে, কিন্তু একই সঙ্গে এমত জোর দিয়ে বলে যে, সে-গুলোর অর্থকে বিশুদ্ধ ভৌতধর্মী শব্দাবলীর সাহায্যে ব্যক্ত করা যেতে পারে। কোন্ ভৌতধর্মী শব্দাবলী? আপাতদৃষ্টিতে সবচেয়ে উপযুক্ত হচ্ছে সেই শব্দ-সমষ্টি যেগুলো দৈহিক (physical) 'আচরণ' নির্দেশ করে। আচরণবাদ নামে পরিচিত এই মতবাদ সম্পর্কে দ্বিতীয় অধ্যায়ে (২০-২৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) আলোচনা করা হয়েছে।

জড়বাদের এই আচরণবাদী ব্যাখ্যার প্রতি অনেক বছর পর্যন্ত দার্শনিকদের জোরালো সমর্থন ছিল। অ-বোধগম্যতা মতবাদের তুলনায় এটি মননধর্মী শব্দ-সম্বলিত বাক্যগুলোকে অর্থপূর্ণ বলে স্বীকার করে এবং স্বীকারোক্তিসূচক তত্ত্বের তুলনায় এটি ওইসব বাক্যকে সেসব পরিস্থিতিতে সত্য বা মিথ্যা বলে গ্রহণ করে যেখানে সেগুলো ব্যবহৃত হয়। এবং 'আচরণ করার প্রবণতার' ধারণাকে ব্যবহার করে এ মতবাদটি স্বীকার করে যে, যেখানে নির্দিষ্ট মুহূর্তে ব্যক্তি কোন বিশেষ পদ্ধতিতে আচরণ করছে না সেখানেও এ ধরনের বাক্যগুলো সত্য হতে পারে। তবুও অর্থকে 'আচরণের' সাথে যুক্ত করে এ মতবাদ মনে করে যে, মননধর্মী শব্দ-সম্বলিত বাক্যগুলোকে খোলা ও প্রকাশ্য উপায়ে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে পরীক্ষা করা যেতে পারে। কারো মাথা-ব্যথা আছে কিনা তা নির্ধারণ করার ব্যাপারে আমাদের শুধু দেখা দরকার উপযুক্ত পরিবেশে সে সঠিকভাবে আচরণ করে কিনা।

যাই হোক, আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করেছি যে, এ মতবাদটি একটি মৌলিক আপত্তির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। যে-কোন প্রকারেরই আচরণ বা আচরণ-জনিত প্রবৃত্তিগুলোকে একটি বিশেষ মানসিক ঘটনার কথিত সংগঠন বলে কল্পনা করি না কেন, আমরা সর্বদাই ওই মানসিক ঘটনা 'ব্যতিরেকেই' ঠিক সেই আচরণ অথবা প্রবৃত্তিগুলোর কল্পনা করতে পারি। আমরা কল্পনা করতে পারি যে, ওই আচরণটি 'অন্য' কোন কারণ হতে এসেছে অথবা তা ব্যাখ্যাতীত ভাবেই 'স্বতঃপ্রণোদিত' (spontaneous)। সুতরাং আচরণ ও আচরণজনিত প্রবৃত্তিগুলো এসব মননধর্মী শব্দের কোন পূর্ণ বিশ্লেষণ প্রদান করে না। এ ধরনের বিবরণে কিছু কথা বাদ থেকে যায়।

জড়বাদের যে সর্বশেষ ব্যাখ্যাটি আমরা আলোচনা করব এবং অধুনা যা সর্বাধিক গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হয়, তা অভিন্নতা তত্ত্ব (Identity theory)

নামে পরিচিত। এটি এমন একটি তত্ত্ব যে, চিন্তা, অনুভূতি, ইচ্ছা এবং অন্যান্য তথাকথিত মানসিক ঘটনাসমূহ 'দেহের' বিভিন্ন অবস্থা ও প্রক্রিয়ার সাথে (এবং সম্ভবতঃ অধিকতর নির্দিষ্টভাবে, স্নায়ুতন্ত্রের অথবা এমন-কি কেবল মস্তিষ্কের অবস্থা ও প্রক্রিয়াসমূহের সাথে) একই ব্যাপার হিসাবে অভিন্নভাবে সম্পর্কিত। এভাবে কোন চিন্তা থাকার ব্যাপারটি হচ্ছে অমুক অমুক দৈহিক কোষের এরূপ এরূপ অবস্থায় অথবা অন্যান্য কোষের অপরাপর অবস্থায় থাকার সাথে অভিন্ন।

একদিক থেকে অভিন্নতা তত্ত্ব ও আচরণবাদ খুবই সাদৃশ্যপূর্ণ। এটা তখনই বোঝা যায় যখন আচরণবাদীর "প্রবণতাসমূহ" কি তা আমরা নিজেদেরকে জিজ্ঞাসা করি। যদি একটি বস্তুর কোন "প্রবণতা" থাকে, তা হলে বস্তুটা এমন 'একটি বিশেষ অবস্থায়' থাকে যে, যখন এতে কোন কিছু সংঘটিত হয় তখন অন্য কিছুও তাতে সংঘটিত হবে। যেমন, কোন জিনিস যদি ভঙ্গুর হয় তাহলে তা এমন একটি বিশেষ অবস্থায় থাকে যে, যখন হঠাৎ এতে কোন বল প্রয়োগ করা হবে তখনই তা চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে। এবং একইভাবে, কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে একটি বস্তুর আচরণ করার দৈহিক প্রবণতাসমূহ হচ্ছে 'ওই দেহেরই অবস্থা'। সুতরাং একথা যথার্থই বলা চলে যে অভিন্নতা-তত্ত্বীরা এবং আচরণবাদীরা উভয়ই মানসিক অবস্থাকে 'দৈহিক অবস্থার' সাথে অভিন্ন মনে করেন। কিন্তু যে-একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক থেকে তারা ভিন্নমত পোষণ করেন তা হচ্ছে, কিভাবে ওইসব অবস্থাকে সংজ্ঞায়িত অথবা বিশেষিত করতে হবে। আমরা দেখেছি যে, স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা যায় (specifiable) এমন কিছু পরিস্থিতির উদ্ভব হলে ওই অবস্থাগুলো যেসব পরিবর্তন ঘটায় সেগুলোর মাধ্যমেই আচরণবাদী অবস্থাগুলোকে সংজ্ঞায়িত করতে চান। অভিন্নতা-তত্ত্বীরা সেগুলোকে সনাক্তকরণযোগ্য (identifiable) দৈহিক গঠনাবলী, দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোর চালু প্রক্রিয়া (ongoing processes) ও অবস্থাসমূহ এবং চূড়ান্ত বিশ্লেষণে, যে সব কোষ নিয়ে ওই অঙ্গ-প্রতঙ্গগুলো গঠিত তাদের মাধ্যমে সংজ্ঞায়িত করতে ইচ্ছা করেন।

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক থেকে অভিন্নতা তত্ত্বকে আচরণবাদ থেকে পৃথক করা যায়। মননধর্মী শব্দাবলীর অর্থের বিশ্লেষণ হিসাবেই আচরণবাদী কতকগুলো উপায়ে আচরণ করার প্রবণতা সম্পর্কে তাঁর ধারণা প্রদান করেছেন। কিন্তু অভিন্নতা-তত্ত্বীর মতে, আমি যখন, উদাহরণস্বরূপ, বলি যে এইমাত্র

 বইটিকে যত্ন সহকারে ব্যবহার করুন।

আমার একটি বিশেষ চিন্তার উদ্রেক হয়েছিল তখন এ দাবী করা খুবই অযৌক্তিক যে, এর দ্বারা আমি যা 'বুঝাই' তা হচ্ছে, আমার স্নায়ুতন্ত্রে কিছু ঘটনা ঘটছিল। কারণ, ওই ঘটনাগুলো যে কি সে সম্পর্কে আমার কোন ধারণা নেই, এমন-কি বর্তমান কালের অত্যাধুনিক কোন স্নায়ু-শরীরতত্ত্ববিদেরও (neuro-physiologist) ওই ঘটনাগুলো সম্পর্কে কোন ধারণা নেই; অথচ আমি জানি আমি কি বুঝাই, যখন আমি বলি যে এইমাত্র আমার একটি বিশেষ চিন্তার উদ্রেক হয়েছিল। সুতরাং, যেহেতু আমি জানি ওই শব্দাবলী দ্বারা আমি কি বুঝাই, তাই আমি এগুলো দ্বারা এমন কিছু বুঝাতে পারি না যার সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না (যেমন, আমার স্নায়ুতন্ত্রের অজ্ঞাত ঘটনাবলী)। অতএব আচরণবাদের ব্যাখ্যানুযায়ী অভিন্নতা তত্ত্বকে মননধর্মী পদগুলোর 'অর্থের' কোন বিশ্লেষণ বলে মনে করা হয় না। তাহলে, দেহের সাথে মানসিক ঘটনাবলী যে "অভিন্ন" সে মতবাদটি দ্বারা কি বুঝানো হয়?

"অভিন্নতা"-র অর্থ এখানে সেভাবেই প্রাসঙ্গিক, যে অর্থে, উদাহরণস্বরূপ, আমরা বলি যে, ভোরের তারা (morning star) আর সন্ধ্যা তারা (evening star) অভিন্ন বস্তু। এর অর্থ এই নয় যে "ভোরের তারা" কথাটি "সন্ধ্যা তারা" কথাটির সমার্থক; বরং এ কথাগুলো ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। কিন্তু এ দুটি কথা যে-বস্তুকে উল্লেখ করে তা একই জিনিস; এটি কেবল একটি জ্যোতিষ্ককে (heavenly body) অর্থাৎ শুক্র গ্রহটিকে (Venus) 'বুঝায়', যাকে ভোরের বেলায় দেখলে বলা হয় ভোরের তারা এবং সন্ধ্যা বেলায় দেখলে বলা হয় সন্ধ্যা তারা। ভোরের তারা আর সন্ধ্যা তারা অভিন্ন; এ দুটি একই জিনিস।

অবশ্য, যা মানসিক তার সাথে দৈহিক জিনিসের অভিন্নতা ঠিক এ ধরনের নয়, কারণ একে এক সময়ের একটি বস্তুর সাথে পরবর্তী কোন সময়ের সেই একই বস্তুর অভিন্নতা মনে না করে যুগপৎভাবে উপস্থিত অভিন্নতা (simultaneous identity) বলে গণ্য করা হয়। আরও কাছাকাছি ধরনের একটি উদাহরণ নেয়া যাক; কেউ বলতে পারেন যে বিদ্যুৎ চমকানো (lightning) হচ্ছে এক মেঘ থেকে অন্য মেঘে অথবা পৃথিবীতে একটি বিশেষ প্রকাণ্ড বৈদ্যুতিক ক্ষরণ (electrical discharge)। একথা ঠিক নয় যে "বিদ্যুৎ চমকানো" কথাটির 'অর্থ হচ্ছে' "একটি বিশেষ প্রকাণ্ড বৈদ্যুতিক ক্ষরণ....." বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন (Benjamin Franklin) যখন আবিষ্কার করেন যে বিদ্যুৎ

চমকানো হল বৈদ্যুতিক, তিনি তখন শব্দের অর্থ সম্পর্কে কোন আবিষ্কার করেন নি। কিংবা যখন আবিষ্কার করা হয়েছিল যে পানি হচ্ছে H_2O, তখনও শব্দের অর্থ সম্পর্কে কোন আবিষ্কার করা হয়নি; কিন্তু তবুও পানি এবং H_2O অভিন্ন।

একইভাবে, অভিন্নতা-তত্ত্বী মনে করতে পারেন যে চিন্তা, অনুভূতি, ইচ্ছা এবং ইত্যাকার অনেককিছু আর দৈহিক অবস্থাসমূহ অভিন্ন। এ অর্থে "অভিন্ন" নয় যে, মননধর্মী শব্দাবলী অর্থের দিক থেকে ভৌতধর্মী শব্দাবলীর সমার্থক, বরং এ অর্থে "অভিন্ন" যে, মননধর্মী শব্দাবলী দ্বারা নির্দেশিত বাস্তব ঘটনাবলী আর ভৌতধর্মী শব্দাবলী দ্বারা নির্দেশিত ঘটনাবলী হচ্ছে একই জিনিস।

লক্ষ্য করা দরকার যে, অভিন্নতা তত্ত্বটি সঠিক হওয়ার কোন সম্ভাবনাই থাকবে না; যদি মানসিক ঘটনাবলী ও দৈহিক ঘটনাবলীর মধ্যে কোন রকম অনুরূপতা (correspondence) না থাকে, অর্থাৎ, যখনই কোন মানসিক ঘটনা ঘটবে তখনই কোন এক বিশেষ ধরনের দৈহিক ঘটনা ও (অথবা কয়েকটি বিশেষ ধরনের মধ্যে অন্ততঃ একটি) ঘটবে, এবং, তেমনিভাবে, যখনই কোন দৈহিক ঘটনা ঘটবে তখনই কোন এক বিশেষ ধরনের মানসিক ঘটনাও (অথবা কয়েকটি বিশেষ ধরনের মধ্যে অন্ততঃ একটি) ঘটবে। যদি ব্যাপারটি এমন হত যে, কোন মানসিক ঘটনা ঘটলে কি কি দৈহিক ঘটনা ঘটল কিংবা আদৌ কোন দৈহিক ঘটনা ঘটল কিনা-এ বিষয়টা অথবা এর উল্‌টো বিষয়টা আকস্মিক কিছু বলে মনে হয়, তাহলে অভিন্নতা তত্ত্বটি সত্য হত না। এ বিষয়ে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে কি কি সত্য জানা যায়, আমাদের জ্ঞানের বর্তমান অবস্থায় তা বলার সময় এখনও আসেনি, যদিও একথা অবশ্যই বলতে হবে যে অনেক বিজ্ঞানী বিশ্বাস করেন যে অভিন্নতা তত্ত্বীদের প্রয়োজনীয় অনুরূপতার অস্তিত্ব আছে। কিন্তু এ ধরনের অনুরূপতা যদি থেকে থাকে, তাহলেও এর অর্থ এই হবে না যে অভিন্নতা তত্ত্বটি সঠিক। কেননা, অভিন্নতা তত্ত্বীরা কেবল এ ধারনাই করেন না যে, মানসিক ও দৈহিক ঘটনাবলী কোন বিশেষভাবে সম্পর্কিত, বরং তাঁরা এও বলবেন যে সে-গুলো একই ঘটনা, অর্থাৎ, ঠিক বিদ্যুৎ চমকানো বা বজ্রপাতের মত নয় (এরা নিয়মমাফিক সম্পর্কিত, কিন্তু

অভিন্ন নয়), তবে বিদ্যুৎ চমকানো এবং বৈদ্যুতিক ক্ষরণের মত (এরা সর্বদাই একই সাথে চলে, কারণ তারা একই জিনিস)।

অভিন্নতা তত্ত্বের সুবিধাগুলো কি ? জড়বাদের একটি প্রকার হিসাবে, এর এমন একটি জগতের সাথে প্রতিযোগিতা করতে হয় না যেখানে মানসিক ঘটনাবলী ও ভৌত ঘটনাবলী উভয়ই রয়েছে, এবং কিভাবে তারা সম্পর্কিত হতে পারে তা-ও একে চিন্তা করতে হয় না। কেবল ভৌত ঘটনাবলীরই অস্তিত্ব আছে, যদিও এ ধরনের ঘটনাবলী সম্পর্কে কথা বলার দুটি পৃথক উপায় রয়েছে ঃ ভৌতধর্মী পারিভাষিক শব্দাবলী এবং, অন্ততঃপক্ষে কিছু কিছু ক্ষেত্রে, মননধর্মী পারিভাষিক শব্দাবলীর ব্যবহার। আমরা এখানে ভাষার দ্বৈততার (dualism) সাক্ষাৎ পাই, কিন্তু এ দ্বৈততা সত্তা, ঘটনাবলী কিংবা গুণাবলীর দ্বৈততা নয়।

অভিন্নতা তত্ত্বের কতকগুলো অসুবিধা

কিন্তু আমাদের কি কেবল ভাষার দ্বৈততাই আছে এবং অন্য কোন প্রকারের দ্বৈততা কি নেই? শুক্র গ্রহের কথা বললে, আমরা বাস্তবিকই একটিমাত্র বস্তুকে নির্দেশ করি ; কিন্তু "ভোরের তারা" কথাটি ওই বস্তুটির ইতিহাসের একটি দিককেই বেছে নেয়, অর্থাৎ শুক্রকে ভোরের বেলাতেই দেখা যায়, এবং "সন্ধ্যাতারা" কথাটি বস্তুটির ইতিহাসের অন্য দিকটিকে বেছে নেয়, অর্থাৎ শুক্রকে সন্ধ্যাবেলাতেই দেখা যায়। ওই বস্তুটির যদি এ দুটি পৃথক দিক না থাকত, তাহলে ভোরের তারা এবং সন্ধ্যা তারা যে বাস্তবিক পক্ষে একই বস্তু, এই তথ্যটিকে একটা আবিষ্কারই বলা যেত না, এবং তদুপরি, একে উল্লেখ করার বিভিন্ন উপায়ের কোন প্রশ্নই উঠত না।

অভিন্নতা-তত্ত্বীরা এখন একথা স্বীকার করবেন যে, ভৌতধর্মী এবং মননধর্মী শব্দাবলী একই বস্তুর ইতিহাসের বিভিন্ন দিক উল্লেখ করে না। তাহলে উদ্দিষ্ট অভিন্নতটা কি ধরনের? এর সঙ্গে অপেক্ষাকৃত নিকট সাদৃশ্য আছে বলে দাবী করা হয় এমন একটা বিষয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক,--বিদ্যুৎ চমকানো এবং কোন বিশেষ ধরনের বৈদ্যুতিক ঘটনার মধ্যকার অভিন্নতা। এখানেও আবার আমরা পার্থক্যযোগ্য দুটি দিক পাই; একদিকে খালি চোখের সামনে কোন কিছুর উপস্থিতি এবং অন্যদিকে ভৌত সংগঠন (composition)।

এবং এটাও মানসিক ঘটনা ও ভৌত ঘটনার মধ্যকার আপাতসম্ভাব্য অভিন্নতার মত কোন অভিন্নতা নয়। 'খালি চোখের সামনে' কোন স্নায়ুতাত্ত্বিক ঘটনার উপস্থিতি কোন চিন্তা বা ব্যথার অভিজ্ঞতা থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক।

কখনো কখনো একথা বলা হয় যে, ভৌত দিক হচ্ছে একটি বিশেষ ঘটনাকে "বাইরে থেকে" দেখার ফল, আর মানসিক হচ্ছে দিক একই ঘটনাকে "ভেতর থেকে" দেখার ফল। যখন কোন মস্তিষ্কের শল্যচিকিৎসক আমার মস্তিষ্ককে পর্যবেক্ষণ করেন তখন তিনি তা বাইরে থেকে দেখেন, অথচ আমি যখন কোন মানসিক ঘটনার অভিজ্ঞতা অর্জন করি তখন আমি "ভেতর থেকে" আমার মস্তিষ্ককে "দেখছি"।

এই ধরনের বিবরণ আমাদের মানসিক ও দৈহিক, এই দুই-এর সম্বন্ধের কোন সঠিক বৈশিষ্ট্য-বর্ণনা (characterization) না দিয়ে বরং কেবল একটা বিভ্রান্তিকর (misleading) সাদৃশ্যই দেখায়। যে লোক তার বাড়ীটাকে ভেতর থেকে জানে, এজন্য যে, এর ভেতরে স্বাধীন ভাবে সে চলাফেরা করতে পারে, জিনিসগুলোকে বিভিন্ন দিক থেকে দেখতে পারে, সেগুলোকে স্পর্শ করতে পারে ইত্যাদি, কিন্তু বাইরে থেকে দেখতে বাড়ীটি কেমন তা দেখার জন্য সে কখনো বাইরে যেতে পারে না, এবং এমন একটি লোক যে ভেতরে ঢুকতে পারে না এবং সে-কারণে কেবল বাড়ীটির বহির্দৃশ্যের জ্ঞানলাভ করে, এবং হয়ত ততটুকু জানতে পায় যা সে জানালার ফাঁক দিয়ে দেখতে পারে—এমন দুটি লোকের অবস্থার যে পার্থক্য, উপরোক্ত তুলনাটা (analogy) তার ইঙ্গিত দেয় মাত্র। কিন্তু মস্তিষ্কের সাথে এর কি সম্পর্ক? মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে ঘুরে বেড়াবার আমার কি কোন স্বাধীনতা আছে, যাতে আমি এমনকিছু পর্যবেক্ষণ করতে পারি যা মস্তিষ্কের শল্যচিকিৎসক কখনো দেখতে পারেন না? আমার মস্তিষ্কের "আভ্যন্তরীণ" দিকটাতে মস্তিষ্কের শল্য-চিকিৎসকের প্রবেশাধিকার আমার চেয়ে বেশী নয় কি? আমার মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে প্রবেশের জন্য তাঁর এক্স-রে, ক্ষত-পরীক্ষার শলাকা, তড়িৎ-শলাকা (electrodes), ক্ষুদ্র ছুরি, কাঁচি ইত্যাদি রয়েছে। যদি জবাবে বলা যায় যে, এটা কেবল একটা তুলনা মাত্র এবং একে আক্ষরিক অর্থে নিলে চলবে না, তাহলে মানসিক ও দৈহিক বিষয়গুলো কিভাবে সম্পর্কিত এই প্রশ্নটি থেকে যায়।

সাধারণতঃ এ পর্যায়ে অভিন্নতা-তত্ত্বীরা এই সম্বন্ধের এমন-কি এর চেয়েও অস্পষ্ট বিবরণ দিতে চলে যান। তাঁরা "বিশ্লেষণের বিভিন্ন পর্যায়" (levels of analysis)-এর অথবা বিভিন্ন "প্রেক্ষিত" (perspectives)-এর অথবা বিভিন্ন "ধারণাগত পরিকল্প" (conceptual schemes)-এর অথবা বিভিন্ন "ভাষা সম্পর্কিত খেলার" (language games)কথা বলেন। এরূপ বক্তব্যগুলোর মূল কথা হচ্ছে, মানসিক ও দৈহিক এই দুই-এর মধ্যের পার্থক্য কোন মৌলিক, গুরুত্বপূর্ণ অথবা অপরিহার্য পার্থক্য নয়, বরং এমন একটি পার্থক্য যা কেবল মানুষের বিভিন্ন উদ্দেশ্য ও দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সম্পর্কযুক্ত। পার্থক্যটি বস্তুর মধ্যেই নিহিত নয়, বরং দর্শকের চোখে নিহিত বলে ধারণা করা হয়।

কিন্তু এগুলো কেবল ইঙ্গিত মাত্র। মানসিক ও দৈহিক কিভাবে পৃথক এবং কিভাবে সম্পর্কিত সে-কথা তাঁরা আমাদের সঠিকভাবে এবং স্পষ্ট ভাষায় (literal terms) বলেন না। তাঁরা আমাদের কেবল এই তথ্য সম্বন্ধে নিশ্চিত করতে চান যে, এই পার্থক্য বস্তুর আসল প্রকৃতিকে প্রভাবিত করে না। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত বিবেচনার জন্য আমাদের কোন তত্ত্ব প্রদান করা না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা অভিন্নতা-তত্ত্বীদের এ আশ্বাসদান মেনে নিতে পারি না যে, যে-কোন তত্ত্বই চলবে, যদিও তিনি জানেন সে তত্ত্বটি কি।

নেতৃস্থানীয় অভিন্নতা-তত্ত্বীদের অন্যতম জে, জে, সি, স্মার্ট (G.G.C. Smart)-এর মতে, যে বিষয়ে শারীরবৃত্তীয় শব্দাবলী ব্যবহার করে অধিকতর স্পষ্টভাবে কথা বলা যেতে পারে, মননধর্মী শব্দাবলী হচ্ছে সে বিষয়ে অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট এবং অধিকতর অনির্দিষ্টভাবে কথা বলার একটি পন্থা মাত্র। আমি যখন আমার মধ্যে একটি লাল উত্তর-প্রতিচ্ছবি (after-image) ঘটছে বলে প্রতিবেদন করি, তখন আমি (মোটামুটিভাবে) বুঝাই যে, এমন একটি-কিছু ঘটছে যা, আমি যখন প্রকৃতপক্ষে একটি লাল রঙের পোঁচ দেখি, তখন যা ঘটে ঠিক তার মত। আমি প্রকৃতপক্ষে এটা 'বুঝাই' না যে একটি বিশেষ ধরনের মস্তিষ্ক-প্রকিয়া ঘটছে; কিন্তু আমি যখন বলি কিছু একটা ঘটছে তখন আমি ঠিক ওই মস্তিষ্ক-প্রক্রিয়াতেই তা আরোপ করি (বলতে গেলে, অত্যন্ত অস্পষ্টভাবেই)। এভাবে কোন উত্তর-প্রতিচ্ছবি সম্পর্কে আমার প্রতিবেদনে যে-বস্তুর উল্লেখ করা হয় তা হচ্ছে একটা মস্তিষ্ক-প্রক্রিয়া। তাই

এখানে কোন অশরীরী বৈশিষ্ট্য আরোপের প্রয়োজন পড়ে না। এভাবে দ্বৈতবাদের দোষকেও এড়ানো যায়।

দ্বৈতবাদের তাৎপর্যকে কৌশলে পরিহার করার এই যে সুনিপুণ প্রচেষ্টা, তা কি দার্শনিক পর্যালোচনায় টিকতে পারে? আমার ধারণা যে সেটা টিকবে না। লাল উত্তর-প্রতিচ্ছবির প্রতিবেদনকারী ব্যক্তিটির কথায় ফিরে আসা যাক। কোন একটা কিছু ঘটার ব্যাপারে, কোন-না-কোন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সে সচেতন ছিল। এখন আমার স্পষ্ট মনে হয় যে, তার ওই সময়কার মস্তিষ্কের অবস্থা সম্পর্কে সে অবশ্যই সচেতন ছিল না (আমাদের অনেকেই তাদের নিজেদের মস্তিষ্ক সম্বন্ধে কখনও সচেতন থাকে বলে আমার সন্দেহ আছে), এমন-কি, সাধারণভাবে, ওই সময়ে তার দেহের কোন দৈহিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও সে অবশ্যই সচেতন ছিল না। সে অবশ্য ঘটনাক্রমে কোন দৈহিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সচেতন থাকতেও পারে, কিন্তু সেটা ঠিক তার লাল উত্তর প্রতিচ্ছবি সম্পর্কে সচেতন থাকার মত নয়। তথাপি কোন কিছু সম্পর্কে সে নিশ্চয়ই সচেতন ছিল, অন্যথায় কিভাবে সে সেই প্রতিবেদনটি করল? সুতরাং, কোন অশরীরী বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তাকে অবশ্যই সচেতন থাকতে হয়েছিল। সে যে কিভাবে কোন কিছু সম্পর্কে আদৌ সচেতন ছিল তা ব্যাখ্যার এটাই হচ্ছে একমাত্র পন্থা।

অবশ্য, যে জিনিসটি সম্পর্কে আমাদের উত্তর-প্রতিচ্ছবির প্রতিবেদনকারী সচেতন ছিল সেটির আরও এমনসব বৈশিষ্ট্য থাকতেও পারে যেগুলো সম্পর্কে সে সচেতন ছিল 'না'; এ প্রসঙ্গে, বিশেষভাবে, দৈহিক বৈশিষ্ট্যগুলোর কথা বলা যায়। আমি একটি বস্তুর কতকগুলো বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সচেতন না থেকেও অন্য কতকগুলো সম্পর্কে সচেতন থাকতে পারি। সুতরাং এমন সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় না যে, আমাদের প্রতিবেদক যে-ঘটনা সম্পর্কে সচেতন তা এমন একটি ঘটনা হতে পারে যেখানে দৈহিক বৈশিষ্ট্যসমূহের প্রাধান্য রয়েছে—কথাটা কেবল এই যে, সে ওই ঘটনাগুলোকে লক্ষ্য করে না। কিন্তু তাকে এর কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সচেতন হতেই হবে, অন্যথায় একথা বলা সঠিক হবে না যে সে 'ওই' ঘটনাটি সম্পর্কে সচেতন ছিল। এবং সে যদি কোন দৈহিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সচেতন না হয়ে থাকে, তা হলে তাকে অন্য কিছু সম্পর্কে সচেতন হতেই হবে। এবং এ থেকে দেখা যায়, আমরা স্মার্টের প্রস্তাবিত অর্থে ওই অশরীরী বৈশিষ্ট্যগুলো থেকে রেহাই পেতে পারি না।

অভিন্নতা-তত্ত্বীরা তাঁদের মতবাদের এ অংশটিকে যে সমস্যামুক্ত করতে পারবেন না, নির্বিচারীভাবে একথা কেউ বলতে চাইবেন না। বর্তমানে এ সমস্যার উপর অনেক কাজ হচ্ছে, কারণ মনোদর্শনে এবং দর্শনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও সমস্যাটি উত্থাপিত হচ্ছে। বিশেষভাবে বিজ্ঞানের কিছু দার্শনিক এ সমস্যার সাথে সংশ্লিষ্ট। আমরা দেখেছি যে অভিন্নতা-তত্ত্ব এরূপ সাদৃশ্যসমূহের ব্যবহার করেছে, যেমন ঃ বৈদ্যুতিক ঘটনাবলীর সাথে বিদ্যুৎ চমকানোর অভিন্নতা এবং হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন সমন্বয়ে গঠিত অণুগুলোর সাথে পানির অভিন্নতা। কিন্তু যে প্রশ্নটি উঠতে পারে তা হচ্ছে, এসব ঘটনায় আমরা কি ধরনের অভিন্নতা নিয়ে আলোচনা করছি। এসব ঘটনায় আমরা কি কেবল বিভিন্ন পদের দ্বিত্ব, বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য, গুণ অথবা দৃষ্টিভঙ্গির (aspects) দ্বিত্ব পাই? সম্পূর্ণভাবে একই ধরনের সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে। সুতরাং এমন হওয়া বেশ সম্ভব যে, মানসিক ও দৈহিক ঘটনার এই অভিন্নতা-তত্ত্বকে পরিষ্কারভাবে বুঝানোর ব্যাপারে অভিন্নতার সমস্যার উপর আরও কাজের প্রয়োজন। কিন্তু বর্তমানে বিষয়টি যত সুস্পষ্ট হওয়া উচিত কোনক্রমেই তত সুস্পষ্ট নয়।

যদিও-বা অভিন্নতা-তত্ত্বী তাঁর মতবাদে ব্যবহৃত "অভিন্নতা" কথাটির অর্থ পরিষ্কার ব্যাখ্যা করতে পারেন, তাহলেও তাঁকে আরো দুটি সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। এ সমস্যাগুলো হচ্ছে দেশ ও কাল-এর সহাবস্থানের সমস্যা। অভিন্নতার কথা বলতে গেলে, দেশ ও কালে সহাবস্থানের শর্তাবলী পূরণ করতে হবে। অর্থাৎ, আপাতদৃষ্টিতে পৃথক দুটি বস্তুকে একই বস্তু হওয়ার জন্য, এগুলোকে অবশ্যই একই সময়ে এবং একই স্থান থাকতে হবে। যদি আমরা দেখাতে পারতাম 'ক' সাহেব এমন এক সময়ে ছিলেন যখন 'খ' সাহেব ছিলেন না, অথবা 'ক' সাহেব এমন এক স্থানে ছিলেন যেখানে 'খ' সাহেব ছিলেন না, তাহলে এ থেকে দেখা যাবে 'ক' সাহেব ও 'খ' সাহেব ভিন্ন লোক। অভিন্নতা সম্পর্কিত এসব সত্য বিষয়ের কারণে, কোন ঘটনা ঘটার সময়ে অনুপস্থিত থাকার ওজর (an alibi) একজন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে দোষমুক্ত করতে পারে ঃ যদি 'ক' সাহেব ওই সময়ে শিকাগোতে না থেকে থাকেন, তাহলে যিনি শিকাগোতে হীরক চুরি করেছিলেন তার সঙ্গে তিনি একই ব্যক্তি বলে গণ্য হতে পারেন না।

সুতরাং, মানসিক ঘটনাবলীকে যদি দৈহিক ঘটনাবলীর সাথে অভিন্ন হতে হয়, তাহলে সেগুলোকে দেশ ও কালের সহাবস্থানের শর্তাবলী অবশ্যই পূরণ

করতে হবে। প্রশ্ন হচ্ছে, তারা কি তা করে?

কালে সহাবস্থান সম্পর্কে খুব অল্পই জানা যায়। অস্ত্রচিকিৎসা-কালে মস্তিষ্কের কোন উন্মোচিত অংশের সরাসরি উত্তেজিত করণের কাজটিই এখানে সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক। যেহেতু এ রকম অনেক ঘটনায় কেবল একটি স্থানীয় চেতনা-নাশক দ্রব্যের প্রয়োজন, সেহেতু রোগী সম্পূর্ণরূপে চেতনও থাকতে পারে। যখন শল্য চিকিৎসক তার মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশগুলোকে উত্তেজিত করেন, রোগীটি তখন স্মৃতি, চিন্তা, সংবেদন প্রভৃতি মানসিক ঘটনার কথা প্রতিবেদন করতেও পারে। মস্তিষ্কের দৈহিক ঘটনা ও মানসিক ঘটনা কি ঠিক একই সময়ে ঘটে থাকে? তেমন বলা অসম্ভব। দৈহিক ঘটনা আর মানসিক ঘটনা যে অভিন্ন নয় তা প্রমাণের জন্য একটি অতি স্বল্প মাত্রার কালিক ব্যবধানের প্রয়োজন। কিন্তু এত স্বল্প মাত্রায় কালিক ব্যবধানের অস্তিত্বকে কিভাবে প্রতিষ্ঠিত করা যাবে তা বুঝে ওঠা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। এবং যদি তা সম্ভবও হয়, তাহলে তা কি প্রমাণ করবে? কেবল এ তথ্যই প্রমাণ করবে যে, মানসিক ঘটনাটি ঠিক ওই দৈহিক ঘটনার সাথে অভিন্ন ছিল না; এটা প্রমাণ করবে না যে মানসিক ঘটনাটা অন্য কোন দৈহিক ঘটনা থেকে ভিন্ন ছিল। সুতরাং, এ-ও হতে পারে যে কালিক সহাবস্থান ছিল অথবা ছিল না। এখানে বর্ণিত অভিজ্ঞতাভিত্তিক কাজের ধরন থেকে আমরা খুব নির্ভরশীল তথ্য পাব বলে আমি মনে করি না। তাহলে অভিন্নতা-তত্ত্বীকে অন্ততঃ কিছু কালের জন্য এ দিক থেকে তাঁর মতবাদ খণ্ডনের (refutation) আশঙ্কার সম্মুখীন হতে হচ্ছে না।

স্থানিক সহাবস্থান সম্পর্কে কি বলা যায়? মানসিক ঘটনা কি সেই একই স্থানে ঘটে যেখানে অনুরূপ কোন দৈহিক ঘটনা ঘটে? দুটি কারণে, উত্তর দেয়ার পক্ষে এটাও একটি অতি কঠিন প্রশ্ন। প্রথমতঃ, বিশেষভাবে মস্তিষ্ক এবং তা কিভাবে কাজ করে সে-সম্পর্কে আমাদের শারীরতত্ত্ববিষয়ক বর্তমান অজ্ঞতা প্রাসঙ্গিক দৈহিক ঘটনাবলীর অবস্থান সম্পর্কে কিছু বলার সুযোগ খুবই কম দেয়। এমন হওয়া সম্ভব বলে মনে হয়ঃ সেগুলো মস্তিষ্কে অবস্থিত। বর্তমানে এর অধিক কিছু আমরা জানি না, যদিও সময় যতই এগিয়ে যাবে আমরা এ সম্বন্ধে আরও অনেক বেশী অবশ্যই জানব। স্থানিক সহাবস্থান বিদ্যমান কি না, তা বলার অসুবিধার দ্বিতীয় কারণটি মানসিক ঘটনার অবস্থিতির সাথে সংশ্লিষ্ট। চিন্তা, অনুভূতি ও ইচ্ছা কোথায় ঘটে? এগুলো কি মস্তিষ্কে ঘটে? ধরা যাক, আপনার হঠাৎ এ চিন্তা হল যে

এখন রাত্রিকালীন ভোজের সময় প্রায় শেষ হয়ে গেছে; এই চিন্তা কোথায় ঘটছে? সবচেয়ে যুক্তিসঙ্গত উত্তর হবে, আপনার যখন ওই চিন্তাটি হবে তখন আপনি যেখানে আছেন সেখানেই সেটা ঘটবে। আপনার যখন ওই চিন্তাটি হয় তখন যদি আপনি গ্রন্থাগারে থাকেন, তাহলে চিন্তাটি গ্রন্থাগারেই ঘটবে। কিন্তু আপনার দেহের ভেতরে কোন্ স্থানে চিন্তাটি ঘটল সে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা খুবই অস্বাভাবিক হবে; আপনার পায়ে, অথবা আপনার যকৃতে, অথবা আপনার হৃৎপিণ্ডে, অথবা আপনার মাথায়? এ নয় যে অন্যটির চেয়ে এসব স্থানের যে-কোন একটির মধ্যে থাকার সম্ভাবনা বেশী। এসব ভাবনার সবকটিই ভুল। ভুল এ কারণে নয় যে, আপনার পা, যকৃত, হৃৎপিণ্ড অথবা মাথা ব্যতীত আপনার দেহের ভেতরে 'অন্য' কোন স্থানে চিন্তা সংঘটিত হয়, বরং এই কারণে যে, কোন চিন্তা সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারটিকে আপনার দেহের কোন স্থানে নির্দেশিত করার 'আদৌ কোন অর্থ হয় না'। আমরা এমন কাউকে বুঝতে পারব না যিনি তার দেহের ভেতরে কোন একটি স্থানের দিকে নির্দেশ করবেন এবং এই দাবী করবেন যে 'সেখানেই' তার ধারণা পোষণের স্থানটি অবস্থিত। নিশ্চয়ই, কেউ যদি ওই স্থানটির দিকে 'তাকাত' তা হলে চিন্তার অনুরূপ কোন কিছুই সে 'দেখতে' পেত না। এর উত্তরে যদি এরূপ বলা হয়, দেখতে না পেলেও ব্যথাকে দেহের মধ্যে চিহ্নিত করা যায়, তাহলে উল্লেখ করতে হবে যে, কেউ সেখানে ব্যথা 'অনুভব' করে, কিন্তু কদাচিৎ কেউ দেহের মধ্যে কোন চিন্তাকে অনুভব করে থাকে।

মানসিক ঘটনা দেহের ঠিক কোন্ স্থানে ঘটছে তা বলার আদৌ যে কোন অর্থ নেই, সে-কথার ফলশ্রুতি এই যে অভিন্নতা তত্ত্বটি সত্য হতে পারে না। এর কারণ হচ্ছে, মানসিক ঘটনার অনুষঙ্গী দৈহিক ঘটনাবলী দেহের মধ্যে কোন স্থানে ঘটে, এবং ওই দৈহিক ঘটনা যদি মানসিক ঘটনার সাথে অভিন্ন হয়, তাহলে ওইসব মানসিক ঘটনা দেহের ভেতরে ঠিক একই স্থানে ঘটবে। কিন্তু ওইসব মানসিক ঘটনা দেহের ভেতরে কোন স্থানে ঘটে না, কারণ সেগুলো এখানে অথবা সেখানে ঘটছে, এমন যে-কোন উক্তি অর্থহীন হবে। অতএব, মানসিক ঘটনা স্থানিক সহাবস্থানের শর্তটি পূরণ করতে পারে না, এবং সে জন্যই দৈহিক ঘটনার সাথে অভিন্ন বলে গণ্য হতে পারে না।

দেহের অভ্যন্তরে মানসিক ঘটনার অবস্থিতি নির্দেশ সম্পর্কে আমাদের অক্ষমতা দেহের অভ্যন্তরে অনুরূপ দৈহিক ঘটনার অবস্থিতি নির্দেশ করার অক্ষমতা থেকে ভিন্ন প্রকার। শেষোক্তক্ষেত্রে, দেহ এবং বিশেষ করে মস্তিষ্ক সম্পর্কে

আমরা বেশী কিছু জানতে পারি না। এমন ধারণা করা যায় যে, প্রাসঙ্গিক দৈহিক ঘটনার সঠিক অবস্থিতি খুব ভালভাবেই আমরা কোন দিন জানতে পারব। কিন্তু মানসিক ঘটনার ক্ষেত্রে আমরা যে শুধু বর্তমানে অজ্ঞ তা নয়, এ-ও সম্ভব নয় যে আমরা কোন দিন জানতে পারব। মস্তিষ্কে চিন্তার অবস্থিতি আবিষ্কার কি রকমের হবে? চিন্তা যে ঠিক ঠিক 'এখানে' ঘটেছিল একথা বলতে সক্ষম হওয়ার জন্য আমাদের কি ধরনের তথ্য প্রয়োজন? যদি রঞ্জনরশ্মি দ্বারা বা অন্য কোন উপায়ে মস্তিষ্কে যেসব ঘটনা ঘটে তার প্রত্যেকটি আমরা দেখতে সক্ষম হতাম, তবুও কখনো আমরা একটি চিন্তার আভাসও দেখতে পেতাম না। কোন আজগুবি বিষয় চিন্তা করার উপায় হিসাবে, আমরা যদি মস্তিষ্ককে এমন বড় করতে পারতাম অথবা আমাদের নিজেদেরকে এত ছোট করতে পারতাম যে মস্তিষ্কের মধ্য দিয়ে আমরা স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে পারতাম, তাহলেও কিন্তু কখনো আমরা একটি চিন্তাকে পর্যবেক্ষণ করতে পারতাম না। মস্তিষ্কে যা কিছু আমরা পর্যবেক্ষণ করতে পারতাম তার সবই এর মধ্যে সংঘটিত 'দৈহিক' ঘটনাই হত। যদি মস্তিষ্কের মধ্যে মানসিক ঘটনার অবস্থিতি থাকত, তাহলে তাদের সেখানে চিহ্নিত করার জন্য কোন না কোন উপায় নিশ্চয়ই থাকত। কিন্তু, অবশ্যই তেমন কোন উপায় নেই। এমন ধারণাই অর্থহীন।

কোন কোন অভিন্নতা-তত্ত্বী বিশ্বাস করেন যে, এ অভিযোগকে খণ্ডন করা যায়। এর উত্তর দেয়ার একটি উপায় হচ্ছে, এই অভিযোগটি চক্রদোষে দুষ্ট ঃ যদি অভিন্নতা-তত্ত্বটি সত্য হয়, এবং মানসিক ঘটনা মস্তিষ্ক-ঘটনার সাথে অভিন্ন হয়, তাহলে আপাতমিথ্যা মনে হলেও, বাস্তবিকপক্ষে মানসিক ঘটনার অবস্থিতি আছেই, এবং এগুলো ঠিক সেইস্থানে অবস্থান করে যেখানে দৈহিক ঘটনাগুলো অবস্থিত। উত্তর দেয়ার আর একটি উপায় হচ্ছে, প্রাসঙ্গিক দৈহিক ঘটনাগুলোকে এমনসব ঘটনা হিসাবে ব্যাখ্যা করতে হবে যেগুলো সমগ্রভাবে দেহে ঘটে, এবং সেজন্য সমগ্রভাবে দেহটি যেখানে অবস্থিত সেখানেই সেগুলো ঘটে; তাহলে মানসিক ঘটনার অবস্থিতির আরোপ ততটা আপাতমিথ্যা হবে না, কারণ দেহ যেখানে অবস্থিত এগুলো সেখানেই অবস্থিত থাকবে, কিন্তু দেহের কোন বিশেষ অংশে অবস্থিত থাকবে না।

অভিন্নতা-তত্ত্বের উপর আমাদের আলোচনাকে আমরা ঠিক সাম্প্রতিক দার্শনিক চিন্তাধারার সীমান্তে নিয়ে যাচ্ছি। । এ তত্ত্ব কতটা সন্তোষজনকভাবে এর বিরুদ্ধে

আনীত অভিযোগকে খণ্ডন করতে পারে সেই সিদ্ধান্তের ভার আমরা শুধু পাঠকের নিকট অর্পন করতে পারি।

এক্ষেত্রে একটি মিশ্র তত্ত্বের কথা বলা প্রাসঙ্গিক হতে পারে। কোন ব্যক্তি এরূপ মত পোষণ করতে পারে যে, মানসিক ও দৈহিক ঘটনা যদিও ভিন্ন রকমের ঘটনা এবং কোন অর্থেই অভিন্ন নয়, তথাপি যেসব জিনিসে এরা উভয়ই সংঘটিত হয় সেগুলো 'জড়'-বস্তু। এভাবে আমরাও এমন একটা তত্ত্ব পাই যা এসব ঘটনার 'বিষয়ী'র (subject) ক্ষেত্রে জড়বাদকে সমর্থন করে; কিন্তু ভৌত বস্তুতে ঘটে এমন ভৌত ঘটনা ছাড়াও, ভৌত বস্তুতে যেসব অভৌত ঘটনা ঘটে তাদের অস্তিত্ব মেনে নিয়ে এ তত্ত্ব 'ঘটনার' যে দ্বৈততা স্বীকার করে তার ফলে এ গুরুতরভাবে জড়বাদ থেকে সরে যায়।

এখানে এ বলে তর্ক করা কেবল ভাষাগত চাতুরী হবে যে, এই মিশ্রতত্ত্ব অনুসারে দৈহিক বস্তুতে ঘটে বলেই তথাকথিত মানসিক ঘটনা হচ্ছে প্রকৃত-পক্ষে দৈহিক। এখন যে সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে তা এই যে, চিন্তা, অনুভূতি, ইচ্ছা প্রভৃতি হল বর্তমান জড়তত্ত্বে স্বীকৃত আকার, আকৃতি, অবস্থিতি, বৈদ্যুতিক শক্তিময়তা, ঘূর্ণন (spin), শক্তি-সমতা (energy level) ইত্যাদি বিষয়ক পরিবর্তনগুলো থেকে এক সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের ঘটনা। এবং আমরা যদি আরও গুপ্ত ও অপরিচিত ধরনের দৈহিক ঘটনা পাই, তাহলেও এ ঘটনাগুলো চিন্তা, অনুভূতি ইত্যাদির সাথে অভিন্ন কি-না আমাদের এই প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। এবং অভিন্নতার সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শনের যে-কোন প্রচেষ্টাকে অভিন্নতা তত্ত্বের ক্ষেত্রে আমরা পূর্বেই যেসব সমস্যা উত্থাপিত হতে দেখেছি তাদের সবগুলোরই সম্মুখীন হতে হবে।

ঘটনার দ্বৈততাকে যদি আমাদের মেনে নিতে হয়, তাহলে সেই পরিমাণে আমাদের জড়বাদকেও পরিত্যাগ করতে হবে। আমরা একথা স্বীকার করব যে, যা অস্তিত্বশীল তা কেবলই বা নিছক বা সম্পূর্ণরূপে ভৌত নয়। বস্তুসমূহের একটা অভৌত দিক থাকবে; সেগুলো অভৌত ঘটনা ও অভৌত অবস্থার নিয়ন্ত্রণাধীন হবে। সেই পরিমাণে বস্তুগুলো প্রকৃতিগতভাবে নিছক ভৌত হবে না। অপর-দিকে, কেবলই ভৌত অথবা নিছক বা সম্পূর্ণরূপে ভৌত এমন কোন বস্তু থাকবে না যেগুলো মানসিক ঘটনারও বিষয়ী হবে। সুতরাং, আমরা আবার কোনভাবেই সম্পূর্ণ দ্বৈতবাদে ফিরেও যাচ্ছি না। আমরা যে ধরনের তত্ত্ব পাব, তা হবে একটি নিরপেক্ষ তত্ত্ব (neutralist theory), যে তত্ত্বকে এই অধ্যায়ের

শুরুতে আমরা ব্যক্তি-তত্ত্ব (person theory) বলেছি। এইবার আমরা ঐ তত্ত্বের পূর্ণাঙ্গ পর্যালোচনা শুরু করব।

দ্বিমুখী তত্ত্ব

মানসিক ঘটনা যে শুধু অভৌত পদার্থে ঘটে থাকে আমরা সে-মতবাদটি আলোচনা করেছি, এবং তথাকথিত মানসিক ঘটনা হল দৈহিক ঘটনা যা কেবল ভৌত পদার্থে ঘটে, এই মতবাদটিও আমরা আলোচনা করেছি। আমরা এ আলোচনার প্রধান ধারাগুলোর প্রত্যেকটির সুবিধা ও অসুবিধা উভয়ই দেখেছি। একদিকে সচেতন জিনিস ও অপরদিকে জড়ের মধ্যে যে বিরাট ব্যবধান রয়েছে বলে আমরা মনে করি তার প্রতি দ্বৈতবাদ সুবিচার করে, কিন্তু বিশুদ্ধ চিন্তাশীল পদার্থ (the purely thinking substance)-এর রহস্যজনক ধারণা প্রবর্তনের মূল্যেই সে তা করে থাকে। জড়বাদ এরূপ একটা ধারণাকে বর্জন করে, কিন্তু চেতনাশীল বস্তু ও জড়ের মধ্যবর্তী একটি অবিমোচ্য ব্যবধানের ধারণা মুছে ফেলার মাধ্যমে তা করে। আমরা শীঘ্রই এ দুটি মতবাদের সম্মিলনের একটি সাম্প্রতিক প্রচেষ্টাকে লক্ষ্য করব। আমরা এই মতবাদকে ব্যক্তি-তত্ত্ব বলব। এ মতবাদ অনুসারে মানসিক ঘটনাবলী কেবল অভৌত পদার্থেই ঘটে না অথবা কেবল ভৌত পদার্থেই ঘটে না, বরং এমন কিছুতে ঘটে যা 'অভৌতও নয়, ভৌতও নয়'; তাদেরকে ব্যক্তি বলা যাক। মানসিক ঘটনা 'ব্যক্তিতে' ঘটে, এবং ব্যক্তি মানসিক 'এবং' ভৌত এই 'উভয়' প্রকারের ঘটনার নিয়ন্ত্রণাধীন।

সপ্তদশ শতাব্দীর ওলন্দাজ দার্শনিক স্পিনোজা হলেন ব্যক্তি-তাত্ত্বিকদের ঐতিহাসিক পূর্বসূরী। একদিকে ইংরেজ জড়বাদী হব্‌স্ এবং অপরদিকে ফরাসী দ্বৈতবাদী দেকার্তের সম্মুখীন হয়ে স্পিনোজা যা বলেছিলেন তার অর্থঃ আপনাদের উভয়ের ঘরেই মড়ক ঢুকুক। মানসিক ও দৈহিক, এই উভয়ই একটি জিনিসের কেবল দুটি দিক, যে-জিনিস মানসিকও নয়, দৈহিকও নয়। একজন মানুষ সমভাবেই একটি বিস্তৃত, শরীরী বস্তু অথবা একটি চিন্তাশীল বস্তু হিসাবে বিবেচিত হতে পারে, যদিও এই বৈশিষ্ট্য-বর্ণনার প্রতিটিই মানুষটির কেবল একটি দিক প্রকাশ করে। একটি তরঙ্গায়িত রেখার (an undulating line) সাদৃশ্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যা এক বিশেষ মুহূর্তে এক দৃষ্টিকোণ থেকে অবতল (concave) এবং অন্য দিক থেকে উত্তল (convex) বলে গণ্য হতে পারে। রেখাটি নিজে কেবল পদ

দুটির উভয়ের ব্যবহারের দ্বারাই সম্পূর্ণভাবে বর্ণিত হয়, এদের একটির দ্বারা হয় না। তথাপি একথা ঠিক নয় যে, অবতল ও উত্তল বলে দুটি পৃথক জিনিস রয়েছে। কেবল একটি জিনিসই রয়েছে, যা একদৃষ্টি কোণ থেকে অবতল এবং অন্যদিক থেকে উত্তল। মানুষের বেলাতেও সেরূপ। সে একটি চিন্তাশীল বস্তু এবং একটি বিস্তৃত শরীরী বস্তু, এই উভয়ই---সে দুটি বস্তু নয়, বরং সে এ দুটি দিক নিয়ে গঠিত একটি বস্তু। এরূপ মতবাদ প্রচলিতভাবে দ্বিমুখী তত্ত্ব (double aspect theory) নামে পরিচিত। এই তত্ত্ব অভিন্নতা তত্ত্বের কতকগুলো প্রতিবেদনের মতই ; কিন্তু, অন্ততঃ স্পিনোজার বেলায়, দুটিদিকসম্পন্ন বস্তুর ধারণার সাথে এর পার্থক্য রয়েছে। স্পিনোজার মতে বস্তুর যে দুটি দিক আছে তা জড় নয় (তা মানসিকও নয়) ; অপরপক্ষে, অভিন্নতা তত্ত্বকে আমরা যেভাবে আলোচনা করেছি তাতে বস্তুর যে দুটি দিক আছে তা জড় (material)।

যদিও আমরা এখানে স্পিনোজার মতবাদের বিস্তারিত পর্যালোচনা করতে পারছি না, তবুও আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে অস্তিত্বশীল 'প্রতিটি বস্তুর' দুটি দিক রয়েছে বলে স্পিনোজা বিশ্বাস করতেন। এই মতবাদকে সর্বপ্রাণবাদ (panpsychism) বলা হয়। এই মতবাদ অনুসারে, যেখানেই কোন কিছুর অস্তিত্ব আছে সেখানেই চেতনা সংঘটিত হয়, এবং এভাবে প্রতিটি গাছ, শিলা, মেঘ, এবং এমনকি প্রতিটি অণু কিছু পরিমাণে সচেতন। এটা নিশ্চিত যে, সকল বস্তুই মানুষের মত এত পূর্ণভাবে চেতনাময় হয়েছে, তা স্পিনোজা বিশ্বাস করতেন না; একথা স্বীকার্য যে, একটি শিলার মন এত স্থূল ও নিম্নতর যে তা সামান্য মাত্রায় কেবল সচেতন। তবুও, স্পিনোজার মতে, তা অন্ততঃ কিছু পরিমাণে চেতনাশীল।

দ্বিমুখী তত্ত্বের বেলায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ দুটি সমস্যা আছে---যে মূলগত (underlying) পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন দিক রয়েছে তার স্বরূপ কি, এবং সঠিক অর্থে "দিকগুলো" (aspects) কি ? দুর্ভাগ্যবশতঃ, স্পিনোজার মতবাদে এই উভয় সমস্যার ব্যাপারেই গভীর অস্পষ্টতা রয়ে গিয়েছে। প্রত্যেকটি মানুষ, এবং বাস্তবিক পক্ষে, আর যা-কিছুই অস্তিত্বশীল তা হচ্ছে সেই জিনিসটির কেবল একটি বিশেষ উদাহরণ বা নমুনা যাকে স্পিনোজা নাম দিয়েছেন "দ্রব্য" এবং যাকে তিনি "ঈশ্বর" অথবা "প্রকৃতি"-ও বলেন। কিন্তু এ বস্তুটি যে কি তা বোঝা খুবই দুরূহ ব্যাপার। এই দুরূহতার একটা লক্ষণ হচ্ছে, স্পিনোজা নাস্তিক অথবা জনৈক ব্যাখ্যাতার ভাষায়, "একজন

ঈশ্বরপ্রমত্ত মানুষ" ("a God intoxicated man") কি-না, স্পিনোজার সময় থেকেই এই নিয়ে একটা অন্তহীন বিতর্ক চলে আসছে। যদি এটার মত অতি সাধারণ সমস্যার নিষ্পত্তি সম্ভব না হয়, তাহলে এই মূলগত বস্তুটির প্রকৃতি সম্পর্কে আমরা যথেষ্ট পরিষ্কার ধারণা আশা করতে পারি না। একটি "দিক" বলতে কি বোঝায়, এই দ্বিতীয় প্রশ্নটির উত্তর দেয়া সমভাবেই গুরুত্বপূর্ণ ; কেননা, যা মানসিক এবং দৈহিক তা যে একই বস্তুর "বিভিন্নদিক", একথা বলতে কি বোঝায় তা আমরা জানব না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা জানব একটি "দিক" বলতে কি বোঝায় ? আবার, স্পিনোজার মতটিও খুব সহায়ক নয়। তাঁর মতবাদে, যা মানসিক এবং যা দৈহিক, এই উভয়ই মূলগত বস্তুটির মৌলিক গুণ, কিন্তু সেগুলো কিভাবে সম্পৃক্ত অথবা, অন্ততঃপক্ষে, কিভাবে একই বস্তুর 'ভিন্ন' গুণাবলী থাকতে পারে, তিনি কখনো তা বলেন নি। অভিন্নতা তত্ত্বের আলোচনায় আমরা যা দেখেছি (পৃঃ ৬৩ দ্রষ্টব্য) তাতে বস্তুর "বিভিন্ন দিক" কি অর্থে মানসিক এবং দৈহিক তার কোন সঠিক ব্যাখ্যা দেয়া খুবই কঠিন ব্যাপার। প্রত্যক্ষণের সাথে তুলনা করে ইঙ্গিত দেয়া যায় যে, সেগুলো হচ্ছে সেই বস্তুটির বিভিন্ন অবভাস যা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পরিলক্ষিত হয়েছে ; কিন্তু যখন তুলনাটির জায়গায় একটা আক্ষরিক বৈশিষ্ট্য-বর্ণনা প্রতিস্থাপনের চেষ্টা করি, তখন আমরা অধিক কিছু বলতে অক্ষম হয়ে পড়ি।

ব্যক্তি-তত্ত্ব

সাম্প্রতিক দর্শনে, দ্বিমুখী তত্ত্বের সংশোধিত বিবরণ, যাকে আমরা ব্যক্তি-তত্ত্ব (person theory) বলি, তা পি, এফ, স্ট্রসন (P. F. Strawson) কর্তৃক উপস্থাপিত হয়েছে।[১] এ তত্ত্বটি হচ্ছে, মানসিক এবং দৈহিক, এ দুই-ই 'ব্যক্তির' গুণাবলী ; ব্যক্তিই হচ্ছে সেই মূলগত সত্তা যার মানসিক ও দৈহিক উভয় গুণই আছে। যেমন, কোন 'ব্যক্তি' সম্পর্কে আমরা বলতে পারি যে সে ছয় ফুট লম্বা, তার ওজন একশত পঁচাত্তর পাউণ্ড, ঘন্টায় সে তিন মাইল বেগে চলাফেরা করছে (এসবই দৈহিক গুণ) ; এবং সেই একই সত্তা অর্থাৎ ওই ব্যক্তি সম্পর্কে আমরা এ-ও বলতে পারি যে, সে যে প্রবন্ধটি লিখছে তা নিয়ে এখন সে চিন্তা করছে, ওই লেখা সম্পর্কে সে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে এবং

১ P.F. Strawson, *Individuals* (London, Methuen & Co. Ltd. 1959),

তারপরও আবার মনে করছে লেখাটা শেষ হয়ে গেছে আর ঝামেলা চুকেছে (এ সবই মানসিক গুণ)। আমরা এখানে দুটি ভিন্ন বিষয়ের উপর, অর্থাৎ দেহ ও মনের উপর (দ্বৈতবাদ) কোন গুণ আরোপ করছি না, অথবা কেবল দেহের উপর (জড়বাদ) কোন গুণ আরোপ করছি না, বরং ব্যক্তির উপর গুণ আরোপের কথাই বলছি। আমরা বলতে পারি, ব্যক্তির একটি মন এবং একটি দেহ আছে, কিন্তু এ সবের অর্থ হচ্ছে এই যে, মানসিক এবং দৈহিক এই উভয় প্রকারের গুণাবলী তার উপর প্রযোজ্য।

স্ট্রসন কেন জড়বাদ প্রত্যাখ্যান করেন এবং কেন মনে করেন যে মানসিক অবস্থাগুলোকে কোন দেহের উপর আরোপ না করে একটি 'ব্যক্তির' উপর আরোপ করা উচিত? যদিও তাঁর যুক্তি হৃদয়ঙ্গম করা অত্যন্ত কঠিন, তবুও মনে হয় তা নিম্নরূপ হবে।[১] যদি অবোধগম্যতা মতবাদ (unintelligibility thesis) বা স্বীকারোক্তিসূচক মতবাদকে (the avowal theory) (উপরে, পৃঃ ৫৭--৫৮ দ্রষ্টব্য) আমাদের গ্রহণ করতে না হয়---যে মতবাদগুলোকে স্ট্রসন অত্যন্ত গোলমেলে বিধায় বিবেচনার অযোগ্য বলে প্রত্যাখ্যান করেছন—তাহলে আমাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে আমরা প্রায়ই বস্তুর উপর চেতনাবস্থা আরোপ করে থাকি, যেমন, কোন এক বিশেষ ব্যক্তি (subject) সম্পর্কে আমরা বলি যে সেই ব্যক্তির মাথাব্যথা ছিল। এখন, স্ট্রসন এই বলে তর্ক করতে চান যে, কোন ব্যক্তির উপর চেতনাবস্থা আরোপণের ধারণাকে কোন দেহে চেতনাবস্থা আরোপণের ধারণা বলে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে না। একজন উপঘটনাবাদীর কথা বিবেচনা করা যাক; তিনি এই দাবী করেন যে, "ব্যক্তি ক-এর মাথাব্যথা করছে" একথা বলার সাথে "দেহ ক কোন মাথাব্যথা উৎপাদন করছে" বলাটা সমার্থক। এখন উপঘটনাবাদী স্বীকার করবেন যে এই ধারণা---ব্যক্তি ক-এর সকল মাথা-ব্যথাই দেহ ক-এর দ্বারা উৎপাদিত হয়---'বিতর্কমূলক', এবং এর সপক্ষে কিছু যুক্তির প্রয়োজন আছে। কিন্তু সঠিকভাবে বিতর্কের বিষয়টি কি? বিষয়টা এই নয় যে 'সব' মাথাব্যথা দেহ ক-এর দ্বারা উৎপাদিত হয়। তা স্পষ্টতঃই মিথ্যা। কেবল দেহ ক-এর দ্বারা ব্যক্তি ক-এর মাথাব্যথাই উৎপাদিত হয়। কিন্তু "ব্যক্তি ক-এর মাথাব্যথা হয়েছে" এ উক্তি যদি "দেহ ক মাথাব্যথা উৎপাদন করছে", এই উক্তির সাথে সমার্থক হয়, তাহলে "ব্যক্তি ক-এর সব মাথাব্যথা দেহ ক দ্বারা উৎপাদিত হয়" এ কথার অর্থ

১ ঐ, পৃঃ ৯৫--৯৮।

কেবল এই বলা যে, "দেহ ক দ্বারা উৎপাদিত সব মাথাব্যথা দেহ ক দ্বারাই উৎপাদিত"। এবং এটা এমন একটি দাবী যার সম্পর্কে বিতর্ক উত্থাপন অসম্ভব, যেহেতু এটি নেহাত একটি অনুলাপ (tautology) মাত্র। "ব্যক্তি ক-এর মাথাব্যথা হয়েছে", এর অর্থ হচ্ছে "দেহ ক-এর মাথাব্যথা হয়েছে"—এমন ধরনের জড়বাদের বিরুদ্ধে স্ট্রসন ঠিক একই যুক্তি প্রয়োগ করবেন।

যদি আমরা স্ট্রসনকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করি তা হলে দেখব, তাঁর বক্তব্য হচ্ছে এই যে, জড়বাদী ও উপঘটনাবাদীর পক্ষে এমন-কি তাঁদের দাবীকে নির্দিষ্ট সূত্রে প্রকাশ করার জন্যও মানসিক অবস্থাসমূহের কর্তার এমন একটা ধারণা থাকতে হবে যা জড় দেহের ধারণা থেকে ভিন্ন। কেননা, তাঁরা মানসিক অবস্থাসমূহের বিভিন্ন সমষ্টিকে (set) পৃথক করে নিতে চান এবং প্রত্যেক সমষ্টি সম্পর্কে এই গুরুত্বপূর্ণ (nontrivial) দাবীও তাঁরা করেন যে, সেটা কোন বিশেষ দেহের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং দেহকে তাঁরা ওই সমষ্টিগুলো থেকে পৃথক করার কাজে ব্যবহার করতে পারেন না। কাজেই, চেতনাবস্থাসমূহের কর্তা সম্পর্কে তাঁদের ধারণাকে জড়-দেহ সম্পর্কে তাঁদের যে ধারণা তার থেকে ভিন্ন হতে হবে। তা না হলে তাঁদের দাবী, একটি দেহের উপর নির্ভরশীল ওইসব চেতনাবস্থা আবার ওই দেহেরই উপর নির্ভরশীল—এই ধরনের একটি অসার দাবীতে পর্যবসিত হবে, যে দাবী এত শূণ্যগর্ভ যে তাকে গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করাও যায় না।

আমি বিশ্বাস করি যে, এই যুক্তিটি অভ্রান্ত। কিন্তু যুক্তিটি কি প্রমাণ করে এবং কি প্রমাণ করে না তা লক্ষ্য করা প্রয়োজন। এটি দেহ ও চেতনার কর্তাগুলোর 'যৌক্তিক' স্বাতন্ত্র্যকে প্রতিষ্ঠিত করে। অর্থাৎ এটা প্রমাণ করে যে, একটির প্রতি আরোপিত শব্দ-সমষ্টি যা বোঝায়, অপরটির প্রতি আরোপিত শব্দ-সমষ্টি তা 'বোঝাতে' পারে না; সেগুলো সমার্থক হতে পারে না; একটিকে অপরটির মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে না। কিন্তু এ যুক্তি অভিন্নতা-তত্ত্বের কোন একটি আকারকে (form) অপ্রমাণ করে না, অর্থাৎ সেই দাবীকে যেখানে বলা হয় যে, 'যেসব সত্তা' এই শব্দসমষ্টি গুলোর একটার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করে আর যেসব সত্তা অপরটির দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করে, এই উভয় প্রকারের সত্তা একই।[১] "চেতনার কর্তা" কথাটি যদিও কোন-এক ধরনের কোন দেহকে 'বোঝায়' না, তবুও এমন হতে পারে যে যা চেতনার কর্তা তা

---

১ দ্রষ্টব্য: James W. Cornman, "Strawson's 'Person'" *Theoria*, খণ্ড-৩০ (১৯৬৪) ১৪৬—৪৭।

কোন-এক ধরনের দেহের সাথে অভিন্ন। আমরা এ সমস্যার আলোচনায় শীঘ্রই আবার ফিরে আসছি।

ব্যক্তি (অর্থাৎ চেতনার কর্তাসমূহ) এবং দেহের যৌক্তিক অভিন্নতাকে প্রত্যাখ্যান করার ফলে স্ট্রসন দ্বৈতবাদ গ্রহণ করছেন বলে সন্দেহ করা যেতে পারে। কিন্তু তা করা ভুল হবে। স্ট্রসন দ্বৈতবাদকেও প্রত্যাখ্যান করেছেন, অন্ততঃ কার্তেজীয় আকারের দ্বৈতবাদ যা আমরা উপরে আলোচনা করেছি; তিনি সেই মতকে প্রত্যাখ্যান করেন যেখানে চেতনার অবস্থাসমূহের কর্তা হল এমন একটি সম্পূর্ণ অজড়, অশরীরী জিনিস যার উপর চেতনার অবস্থাগুলো ছাড়া অন্য কিছুই আরোপ করা যায় না। তাঁর যুক্তিটা নিম্নরূপ।[১] যদি কারো চেতনার কোন কর্তার ধারণা থাকে, তাহলে সে নিশ্চয়ই এটা স্বীকার করতে ইচ্ছুক থাকবে যে তার নিজেকে ছাড়া অন্যান্য কর্তা থাকতে পারে, অর্থাৎ অনেকের মাঝে সে একটিমাত্র জীবাত্মা (self) হতে পারে। চেতনার অন্যান্য কর্তার ধারণা থাকার অর্থ হল একজনকে অন্যজন থেকে পৃথকীকরণের ক্ষমতা থাকা, বিভিন্ন কর্তাকে বেছে বের করা অথবা সনাক্ত করা, অন্ততঃপক্ষে কোন কোন সময়ে এরূপ বলার ক্ষমতা থাকা যে এখানে এই একজন কর্তা রয়েছে, অন্যজন নেই। (যদি একজন কর্তাকে অন্য একজন থেকে পৃথক করার ধারণা না থাকত, তা হলে কেউ 'বিভিন্ন' কর্তার ধারণা পেত না)। আর যদি চেতনার অন্যান্য কর্তা সম্পূর্ণরূপে অজড় হত, তাহলে একজন কর্তাকে অপর একজন কর্তা থেকে পৃথক করার কোন পথই খোলা থাকত না—কিভাবে আমাদের পক্ষে বলা সম্ভব হত যে, ঠিক এখন আমাদের চারপাশে কতজন এ ধরনের কর্তা ছিল অথবা কোন্ কর্তা কে? এবং যদি একজন কর্তাকে অন্যজন থেকে পৃথক করার কোন পদ্ধতিই না থাকত, তা-হলে, যেমনটি এইমাত্র দেখানো হল, কারও অন্যান্য কর্তার ধারণাই থাকত না। সুতরাং, এই যুক্তির শুরুতেই যেমনটি দেখানো হয়ে ছিল, কারো মধ্যে চেতনার কর্তার আদৌ কোন ধারণা থাকত না। কাজেই সম্পূর্ণ অজড় হিসাবে চেতনার কার্তেজীয় ধারণা অর্থহীন।

অতএব, আমাদের যদি চেতনার একটি কর্তার কোন ধারণা থেকেই থাকে, নিশ্চিতভাবেই আমাদের যা আছে, তাহলে তা কেবল একটি দেহের ধারণাই (যেমন জড়বাদ মনে করে) নয়, এমন-কি একটি অজড় বস্তুর ধারণা (যেমন

১ Individuals, পৃষ্ঠা: ৯৯--১০৪।

দ্বৈতবাদী মনে করে) মাত্রও নয়। একে এমন একটি সত্তার ধারণা হতে হবে যার উপর, মানসিক এবং দৈহিক, এই উভয় প্রকার গুণকে আরোপ করা যেতে পারে। অর্থাৎ, এ কর্তা কেবল চেতনাশীল নয়, একে দৈহিক হতে হবে। যে সত্তাগুলো মানসিক এবং দৈহিক উভয় প্রকার গুণের অধিকারী সেগুলোকেই স্ট্রসন 'ব্যক্তি' বলেছেন।

ব্যক্তি-তত্ত্বের কতকগুলো খুবই চিত্তাকর্ষক বৈশিষ্ট্য আছে। এ মতবাদ মানসিক এবং দৈহিক গুণাবলীর মধ্যকার পার্থক্যের উপর সমান গুরুত্ব আরোপ করে এবং সেগুলোকে মৌলিকভাবে ভিন্ন প্রকৃতির গুণ রূপে গণ্য হওয়ার সুযোগ করে দেয়। তথাপি এ তত্ত্ব এই সত্যের প্রতিও সুবিচার করে যে, সেগুলো একই কর্তার গুণাবলী বলে মনে হয়; আমরা বলি, "আকাশ থেকে পড়ার সময় সে চিন্তা করছিল প্যারাস্যুটটি আদৌ খুলবে কিনা, কিন্তু একথা বলি না যে, তার দেহ আকাশ থেকে পড়ার সময় তার মন চিন্তা করছিল প্যারাস্যুটটি আদৌ খুলবে কি না"। এমন-কি, দেকার্তের দ্বৈতবাদের যে সত্তা একটি অজড় বিস্তারহীন, চিন্তাশীল পদার্থ, সেই অদ্ভুত সত্তায় বিশ্বাস করতেও আমরা বাধ্য বলে মনে হয় না।

ব্যক্তি কাকে বলে?

কিন্তু হায়, তা সত্ত্বেও, ব্যক্তি-তত্ত্বের কতকগুলো অসুবিধা রয়েছে। যখন আমরা এর ভেতরকার 'ব্যক্তি' সম্পর্কিত ধারণাকে আরেকটু গভীরভাবে পরীক্ষা করতে আরম্ভ করি তখন এগুলো দেখা দিতে আরম্ভ করে। স্ট্রসন খুবই সাধারণভাবে এই বলে "ব্যক্তি"র সংজ্ঞা দেন যে, (ব্যক্তি) "এমন এক শ্রেণীর সত্তা যাতে চেতনার অবস্থা আরোপকারী 'এবং' দৈহিক বৈশিষ্ট্য, যেমন কোন ভৌত অবস্থা, ইত্যাদি আরোপকারী, এই 'উভয়' প্রকারের বিধেয় ওই একই শ্রেণীর একই জনের উপর সমভাবে প্রযোজ্য"।[১] কিন্তু এরূপ একটা সংজ্ঞা আমাদের খুব বেশী উপকারে আসে না। এটা যে উপকারে আসে না তা প্রকাশ হয়ে পড়ে তখন, যখন আমরা জিজ্ঞেস করি অভিন্নতা তত্ত্বটি থেকে ব্যক্তি-তত্ত্বকে কিভাবে পৃথক করা যায়।

অভিন্নতা-তত্ত্বীরা বলতে চান যে, মানসিক গুণাবলী হচ্ছে দেহেরই গুণ। অধিকন্তু, এমনটি তাদের অনেকেই বলতে ইচ্ছুক যে, কোন একটি অর্থে মানসিক গুণকে দৈহিক গুণে রূপান্তরিত করা যায়। সবাই কিন্তু শেষোক্ত মতটি

---

১ ঐ, পৃঃ ১০২।

পোষণ করেন না। হার্বার্ট ফাইগাল (Herbert Feigl) মনে করেন যে, যেখানে মননধর্মী পদের প্রয়োগ যুক্তিযুক্ত সেখানে মৌলিক ও অন্তর্নিহিত সত্তা হচ্ছে 'মানসিক' এবং ভৌতধর্মী পদ এই মানসিক সত্তাকে উল্লেখ করে।[১] মনে হয়, এভাবে ফাইগাল মানসিক এবং দৈহিক গুণসমূহের দ্বৈততা স্বীকার করেন। তবুও তাঁর মতবাদ একটি অভিন্নতা তত্ত্ব এই উভয় অর্থে যে, চেতনার মৌলিক কর্তা হল দেহ এবং কতকগুলো মননধর্মী ও ভৌতধর্মী পদের একই আরোপ্য (referent) রয়েছে (যদিও এ পদগুলোর কয়েকটির 'মানসিক' আরোপ্য আছে)। এখন, মানসিক গুণ যে কোন অর্থে দৈহিক গুণে রূপান্তর-যোগ্য, স্ট্রসন এ মতটি নিশ্চয়ই প্রত্যাখ্যান করবেন। তিনি কি তবে এ দাবী প্রত্যাখ্যান করবেন যে সেগুলো দেহেরই গুণাবলী? তিনি কি একথা বলতে ইচ্ছুক যে, ব্যক্তি হচ্ছে কোন এক ধরনের দেহ, অর্থাৎ সেই দেহ যার মানসিক গুণও রয়েছে?

একথা সুস্পষ্ট যে, স্ট্রসন ব্যক্তিকে এমনসব বস্তু বলে মনে করেন যাদের দৈহিক গুণ রয়েছে। কিন্তু তার ফলে ব্যক্তি দেহে পরিণত হয় না, যেমন কোন কিছুতে লাল রঙ থাকলেই তা লাল হয় না। কেননা, ব্যক্তি সাধারণ দেহের মত নয়, ব্যক্তি হচ্ছে এমনসব বস্তু যাদের মানসিক গুণও রয়েছে। অধিকন্তু, স্ট্রসনের মতে, ব্যক্তি যে এমনসব বস্তু যেগুলো কেবল ঘটনাচক্রে দৈহিক গুণাবলী অর্জন করেছে মাত্র (কিন্তু সেগুলো তাদের মধ্যে নাও থাকতে পারত) তা নয়; এমন-কি, একথাও ঠিক নয় যে, ব্যক্তি হচ্ছে এমনসব বস্তু যেগুলো ঘটনাচক্রে মানসিক গুণাবলী অর্জন করে মাত্র (কিন্তু সেগুলো নাও থাকতে পারত)। স্ট্রসনের ব্যক্তি সম্পর্কিত ধারণা অনুসারে, ব্যক্তির পক্ষে এটা আবশ্যক যে সেগুলো এমন সত্তা হবে যার মধ্যে অপরিহার্যভাবে মানসিক ও দৈহিক এই 'উভয়' গুণই থাকবে। এবং এর অর্থ হল, সেগুলো এমন বস্তু যা দেহ (অপরিহার্যভাবে যার কেবল দৈহিক

---

১ Herbert Feigl, "The 'Mental' and the 'Physical' ", *Minnesota Studies in the Philosophy of Science*, খণ্ড-২য় (Minneapolis ; University of Minnesota Press, 1958), পৃঃ ৪৭৪-৭৫। প্রবন্ধটি সম্প্রতি একটি ভিন্ন মনোগ্রাফ হিসাবে ওই একই শিরোনামে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে (Minneapolis : University of Minnesota Press, 1967); এ বিষয়ের উপর একটি ক্রোড়পত্রে ফাইগালের অত্যাধুনিক চিন্তাগুলি সন্নিবেশিত রয়েছে। Sidney Hook সম্পাদিত *Dimensions of Mind* (New york : Collier Books, 1961) নামক পুস্তকে ফাইগালের লেখা প্রবন্ধও দেখুন : "Mind-Body, Not a Pseudo-problem", পৃঃ ৩৩-৪৪।

গুণ থাকবে) থেকে মূলতঃ পৃথক। সেগুলো হচ্ছে বিভিন্ন শ্রেণীর উপাদান, পদার্থ অথবা সত্তা। এবং সে-কারণে ব্যক্তি-তত্ত্ব যে-কোন প্রকারের জড়বাদ থেকে মৌলিকভাবে পৃথক। এ তত্ত্ব দ্বৈতবাদী এ কারণে যে, প্রাকৃতিক জগতে ভৌত দেহ ও ব্যক্তি, এ দুটি ভিন্ন শ্রেণীর বিষয়ী (subjects) রয়েছে। ভৌত দেহের অপরিহার্যভাবে কেবল দৈহিক আয়তন রয়েছে; ব্যক্তির অপরিহার্যভাবে দুটি ব্যাপ্তি আছে, একটি ভৌত এবং একটি মানসিক। শেষোক্ত ধারণাটিই এই তত্ত্বকে স্পিনোজার দ্বিমুখী তত্ত্ব থেকে পৃথক করছে; স্পিনোজার মতে, যা কিছু জগতে অস্তিত্বশীল তা হচ্ছে, স্ট্রসনের অর্থে, একটি ব্যক্তি, অর্থাৎ এমন একটি বস্তু যার অপরিহার্যভাবে মানসিক ও দৈহিক, এই উভয় ব্যাপ্তিই রয়েছে।

ব্যক্তিতত্ত্ব অনুসারে আমরা যদি বলতে না পারি যে একটি ব্যক্তি 'হচ্ছে' একটি দেহ, তবে হয়ত আমরা বলতে পারি যে একটি ব্যক্তি হচ্ছে, 'আংশিকভাবে' একটি দেহ (এই অর্থে যে, যে বস্তুর মধ্যে লাল রঙ আছে তা আংশিকভাবে লাল হতে পারে)। কিন্তু এতেও চলবে না; কারণ এর দ্বারা নিশ্চিতভাবে এর বাকী অংশটা কি হবে এ প্রশ্নটি উত্থাপিত হচ্ছে। অর্থাৎ, এর মধ্যে এই প্রস্তাব আছে যে, ব্যক্তি হল কোন এক প্রকারের মিশ্রণ (amalgam) মাত্র, একটি দেহ ও অন্য কিছুর (হয়ত একটি আত্মার) একটা যৌগিক কিছু। ব্যক্তি-তত্ত্ব ঠিক এ ধরনের প্রস্তাবগুলোকেই খণ্ডন করার প্রয়াস পাচ্ছে।

আমরা কি এটাও বলতে পারি যে ব্যক্তির একটি দেহ 'আছে'? আমি মনে করি, স্ট্রসন তা বলতে সক্ষম হওয়ার ইচ্ছা করবেন। কিন্তু ব্যক্তি-তত্ত্ব অনুসারে এতে কি বুঝাবে? নিঃসন্দেহে এতে বোঝায় যে, ব্যক্তির দৈহিক গুণ আছে। কিন্তু এতে কি এর চেয়ে অধিক কিছু বোঝায়? ব্যক্তি এবং 'দেহের' সম্পর্কের বিষয়ে এতে কি কিছু বলা হয়? ব্যক্তি-তত্ত্বের মতানুসারে তার অবকাশ নেই। কারণ 'দেহ' হচ্ছে এমন কিছু যার অনিবার্যভাবে কেবল দৈহিক গুণই আছে এবং এরূপ বস্তুর ব্যক্তির সঙ্গে কোন সম্পর্কই নেই; আমরা দেখেছি যে, ব্যক্তি হচ্ছে এমন-কিছু যার নিশ্চিতভাবে দৈহিক এবং মানসিক, এই উভয় প্রকার গুণ রয়েছে।

এই প্রশ্নের (ব্যক্তি-তত্ত্ব অনুসারে) উপর ব্যক্তি এবং দেহের সম্পর্কের খুব কিছু কি নির্ভর করছে? বেশ কিছু নির্ভর করছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, দেহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য প্রকৃতির নিয়মের কথা---পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, জীব-বিদ্যার নিয়মের কথা---বিবেচনা করা যাক। নিশ্চিতভাবেই আমরা একথা

বলতে সক্ষম হতে চাইব যে, এ নিয়মগুলো অন্যান্য দেহের মত মানুষের দেহের বেলায়ও প্রযোজ্য। নিউটনের সূত্র অনুযায়ী, যদি একথা সত্য হয় যে, "একটি 'দেহের' স্থির-অবস্থা অথবা স্থিরগতি বজায় থাকে যদি না.....," তাহলে তা যে ব্যক্তির এবং অপরাপর দেহের বেলায় প্রযোজ্য হবে তেমনই আশা করব। তবুও যদি আমরা এটাও বলতে না পারি যে, কোন ব্যক্তির "দেহ" হচ্ছে সেই অর্থে 'দেহ' যে-অর্থে পাহাড় এবং গাছ হচ্ছে দেহ, তাহলে প্রকৃতির এ নিয়মগুলো, যেগুলো 'দেহের' উপর প্রযোজ্য, সেগুলো ব্যক্তির 'দেহের' উপর প্রয়োগ করা যাবে না। এবং, এর অসারতার কথা ছেড়ে দিলেও, এটা এমন একটা মস্ত অসুবিধা যে, এটা ব্যক্তিতত্ত্বের বিরুদ্ধে যাবে।

নিশ্চয়ই, উপরে উদ্ধৃত নিউটনীয় পদ্ধতি ছাড়াও অনেকভাবে "দেহ" কথাটি ব্যবহৃত হয়, যেগুলোর মধ্যে কতকগুলো ব্যাক্তি-তত্ত্বের সঙ্গে অপেক্ষাকৃত ভালোভাবে খাপ খায়। উদাহরণস্বরূপ, এই পুরাতন গানটি বিবেচনা করা যাক ঃ "Gin a body meet a body comin' thro the rye" এখানে এ গানের উক্তিতে আমরা অবশ্যই ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সাক্ষাৎকার ব্যতীত কোন কঠিন পদার্থের মধ্যে সংঘর্ষ কল্পনা করছি না। এ প্রসঙ্গে "দেহ" কথাটি কেবল কোন ব্যক্তিকে বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। (কখনো কখনো ব্যাপারটি উল্টো হয়। যখন আমরা বলি "তারা তাকে (his persón) তল্লাসী করেছিল", তখন আমরা "ব্যক্তি" কথাটিকে একটি দেহ বুঝাতে ব্যবহার করছি।)

আর একটি ব্যবহার রয়েছে যা দেহ সম্পর্কে স্ট্রসনীয় ধারণার আরো কিছুটা কাছাকাছি এসে যায়। যদি কেউ বলে "তারা হ্রদে আজ একটি দেহ দেখেছে", তবে আমরা খুবই অবাক হব যদি সে একটি পাহাড় বা গাছের কাণ্ড অথবা একটি পুরনো ডুবন্ত নৌকা অথবা একটি মাছকে বুঝাত, যদিও এগুলোর সবই নিউটনীয় অর্থে দেহ। এখানে "দেহ" বলতে "শবদেহ" (corpse) বোঝায় অর্থাৎ একটি মৃত মনুষ্য দেহ (একটি মৃত 'জন্তু'কে একটি শবদেহ না বলে বরং একটি পশুপক্ষীর মৃত দেহ (carcass) বলা হয়)। একটি শবদেহ অথবা "দেহ" এখানে এই অর্থে বলা হচ্ছে যে, এটা এমন-কিছু যা কোন ব্যক্তি মরে যাওয়ার পর অবশিষ্ট থাকে, যদিও কোন জীবিত ব্যক্তির কোন 'অংশ' এটা নয় অথবা এমন কিছু নয় যা জীবিত অবস্থায় তার 'থাকে' (সে মরে যাওয়ার পর এই দেহ কি করা হবে সে সম্বন্ধে তার মতামত দেয়ার অধিকার আছে)। যখন আমরা একে "দেহাবশেষ" (the remains)

বলে উল্লেখ করি, দেহের এই ধারণাটি তখন খুবই ভয়ঙ্করভাবে স্পষ্ট হয়ে পড়ে।

দেহের এই ধারণাই ব্যক্তি-তত্ত্বে প্রাপ্ত ধারণার সবচেয়ে কাছাকাছি এসে পড়ে। কারণ, আমরা যেমন দেখেছি, সেই মতবাদে একটি দেহ কোন ব্যক্তি নয়, তা ব্যক্তির কোন অংশ নয়, অথবা তা এমনকিছুও নয় যা একটি ব্যক্তির আছে। বড় জোর বলা যায়, এ হচ্ছে সেই পরিমাণে ব্যক্তিই, যে পরিমাণে ব্যক্তিকে দৈহিক গুণের কর্তা হিসাবে চিন্তা করা হয়। এটি তাহলে সত্তা না হয়ে বরং একটি বিমূর্তন (abstraction), একটি ধীশক্তি-প্রসূত সংগঠন (an intellectual construction)। কিন্তু মৃতুতে এটা একটি বাস্তব সত্তায় পরিণত হয়ে পড়ে। এটা সেই বস্তুতে পরিণত হয় যাকে আমরা শব বলি। ব্যক্তি-তত্ত্ব অনুসারে, একটি মানুষের দেহ হচ্ছে এমন কিছু যা তার মৃত্যুর পর সেই ব্যক্তিটির শবে পরিণত হয়; কোন ব্যক্তির দেহ সম্পর্কে কথা বলার মানেই হচ্ছে এই মনে করা যে, সে যেন মৃত।

তা হলে, ব্যক্তি-তত্ত্বের বিভ্রান্তিকর তাৎপর্যগুলোর একটি এই যে, ব্যক্তির যে দেহ আছে তাকে প্রাকৃতিক জগতের নিয়মের অধীনে কোন ভৌত বস্তু হিসাবে ধারণা করা যায় না। ব্যক্তি যে চেতনাশীল (জড়বাদের বিরুদ্ধে) এ মতবাদকে বিসর্জন না দিয়ে ব্যক্তির একত্বকে (দ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে) প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় ব্যক্তি-তত্ত্ব মনে হয় এই অসারতা নিয়েই শেষ হচ্ছে যে, একটি ব্যক্তির দেহ কোন 'ভৌত' বস্তু নয়।

দ্বৈতবাদের পুনর্বিবেচনা

জড়বাদে এবং ব্যক্তি-তত্ত্বে গুরুতর অসুবিধার কারণেই দ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলোর পুনর্বিবেচনা করা এবং কোন উপায়ে সেগুলো মেটানো যায় কিনা তা দেখার প্রয়োজন হতে পারে। মোটের উপর, মানসিক ঘটনাকে জড়-বিষয়ক ঘটনায় রূপান্তরিত করার অক্ষমতা ব্যাখ্যার ব্যাপারে জড়বাদের তুলনায় দ্বৈতবাদের অধিকতর সুবিধা আছে, এবং অন্যান্য দেহ থেকে ভিন্ন নয় এরূপ একটি জড়-দেহ হিসাবে নীতিগতভাবে মনুষ্যদেহকে বিবেচনার ব্যাপারে ব্যক্তি-তত্ত্বের তুলনায়ও দ্বৈতবাদের অধিকতর সুবিধা আছে। দ্বৈত-বাদের বিরুদ্ধে রায় দেয় এমন অসুবিধাগুলো যদি আমরা দূর করতে পারতাম, তাহলে এই সুবিধাগুলোকে সংরক্ষণ করা কাম্য হত।

আমরা লক্ষ্য করেছি, দ্বৈতবাদের উপর অসন্তোষের একটি উৎস এই যে,

তা আমাদের এমন একটা বিশেষ ধরনের সত্তার অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাস করতে বাধ্য করে বলে মনে হয়, যা কালে বিদ্যমান রয়েছে, যার বিভিন্ন অবস্থা রয়েছে, যা পরিবর্তিত হয়, এবং যা বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় কাজ করে, কিন্তু তবুও যা অদৃশ্য, স্পর্শনাতীত, এবং যার আয়তন বা আকৃতি বা পরিমাণ নেই। কি অদ্ভুত বস্তু এটা! এরূপ কোন বস্তু যে থাকতে পারে তা বুদ্ধি দ্বারা 'বোধগম্য' (intelligible) নয়। এটা যে চেতনার কর্তা, তা ছাড়া এর সম্পর্কে আর কিছুই বলা যায় না। এবং এ কথার মধ্যে এর স্বরূপ যে স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে তা বলা কঠিন।

এই অসুবিধা যে প্রত্যক্ষভাবে দূর করা যেতে পারে আমি তা মনে করি না। দ্বৈতবাদী যদি সঠিক হন, তা হলে চেতনার অ-জড় বিষয়ীর ধারণা জটিল ও অস্পষ্ট হয়ে পড়ে এবং সে-সম্পর্কে আর কিছুই করার নেই। কিন্তু আমরা এ অসুবিধার কার্যকারিতাকে দুর্বল করতে পারি। এ কাজ জড়-অবস্থা, জড়-বিষয়ক ঘটনা এবং জড়-প্রক্রিয়ার ভৌত বিষয়ীর সাথে চেতনার অজড় বিষয়ীর একটা অপ্রকাশ্য তুলনার উপর নির্ভর করছে। এই অপ্রকাশ্য তুলনা এটাই ইঙ্গিত করে যে শেষোক্তটির ধারণা স্পষ্ট এবং বোধগম্য, কিন্তু পূর্বোক্তটির ধারণা তা নয়। কিন্তু একথা সত্য নয় যে, একটি জড়-বস্তুর ধারণা সুস্পষ্ট ও বোধগম্য হবে। আমরা এর বিরুদ্ধেও অনুরূপ অভিযোগ উত্থাপন করতে পারি। আমরা এমন এক জড়-বস্তু সম্পর্কে প্রশ্ন করতে পারি যার বিভিন্ন অবস্থা রয়েছে, যা পরিবর্তিত হয় এবং যাতে বিভিন্ন প্রক্রিয়া কাজ করে। 'এমন বস্তু কি' যার এসব অবস্থা রয়েছে, যা পরিবর্তিত হয় এবং যাতে বিভিন্ন প্রক্রিয়া কাজ করে? জড়বস্তু বলতে কি 'বোঝায়'? একটু চিন্তা করলে আমরা দেখব যে বস্তুটি সম্পর্কে কেবল একথাই বলা যায় যে, এটা এমন একটা-কিছু যা কতকগুলো বিভিন্ন ধরনের, অর্থাৎ জড় ধরনের অবস্থা, ঘটনা এবং প্রক্রিয়ার বিষয়ী। এর অধিক আর কিছুই বলা যায় না। কিন্তু ঠিক সেই ধরনের কথাই, বেশীও নয় বা কমও নয়, একটি অ-জড় বস্তু সম্পর্কে বলা যেতে পারে, অর্থাৎ এটা এমন কিছু যা কতকগুলো বিভিন্ন ধরনের, অর্থাৎ চেতনা-বিজড়িত অবস্থা, ঘটনা এবং প্রক্রিয়ার বিষয়ী। সুতরাং, এই দিক দিয়ে, অজড় বস্তু জড়বস্তুর চেয়ে মোটেও অধিকতর মন্দ অবস্থায় নেই।

যাইহোক, এখানে আমাদের এখনও দুটি বিশেষ সমস্যা আলোচনার কাজটি রয়ে গিয়েছে, যা আমরা সনাক্তকরণের সমস্যা এবং স্বতন্ত্রীকরণের সমস্যা (উপরে, পৃঃ ৫৪ দ্রষ্টব্য) হিসাবে পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

সনাক্তকরণের কথা বলতে গেলে, মনে হয় যে আমরা কেবল 'ভৌত' ঘটনা নিরীক্ষণ করেই বলতে পারি যে, আমরা অন্য কোন চেতনার সামনে আছি এবং এই চেতনা কার। অন্যের মনকে প্রত্যক্ষভাবে জানার জন্য আমাদের আর কোন পথ নেই। অবশ্য, যদি মানসিক 'ট্যালিপ্যাথি' একটা সাধারণ ঘটনা হত, তবে সনাক্তকরণের সমস্যাটি অপেক্ষাকৃত সহজ হয়ে পড়ত। তাহলে ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষণের সাহায্য ব্যতিরেকেই একে অপরের মনের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারত এবং যোগাযোগের বিষয়ের মাধ্যমে হয়ত একজন বলতেও পারত কার সঙ্গে সে যোগাযোগ করছিল। সুতরাং, এ যদি এমন সংবাদ প্রেরণ করত যা আপনার চাচাই (uncle) কেবল জানেন, তাহলে এ কথা ভাবার একটা ভাল যুক্তি থাকত যে আপনার চাচার সঙ্গেই আপনার যোগাযোগ হয়েছিল। এ ক্ষেত্রেও প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে, ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষণের মাধ্যমে জগত সম্পর্কে আমরা যা জানি, কি পরিমাণে তার উপর এই ধরনের অনুমান প্রতিষ্ঠিত; উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আপনি ভাবতে পারতেন যে এটা এমন কিছু ছিল যা কেবল আপনার চাচা জানতে পারতেন, কারণ আপনি হয়ত জানেন যে কেবল তিনিই তখন ঘরে ছিলেন (যে তথ্য, জানালা দিয়ে, খালিঘরে তাঁর দেহ দেখার মাধ্যমে নির্ণীত হয়েছে)। সুতরাং, অবশেষে যদি প্রত্যক্ষণের উপরই নির্ভর করতে হয়, তাহলে ট্যালিপ্যাথি আর সাহায্য করবে না। কিন্তু যদিও এটা সাহায্য করত, তাহলে কিন্তু অন্যান্য চেতনার অভিন্নতা নির্ধারণের জন্য একে আমরা পাচ্ছি না। অতএব, জড়বস্তুর ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষণের উপর আমাদের নির্ভর করতেই হচ্ছে, বিশেষ করে মানুষের দেহের ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষণের উপর। এবং, অন্ততঃ জ্ঞানবিদ্যার দিক থেকে এ তথ্যই জড়-বস্তুর চেয়ে মানসিক বস্তুকে অপেক্ষাকৃত দুর্বল অবস্থার মধ্যে রেখে দিচ্ছে।

স্বতন্ত্রীকরণের কথা বলতে গেলেও মনে হয় যে, ভৌত সত্তার চেয়ে মানসিক সত্তার অবস্থা অপেক্ষাকৃত দুর্বল। কেননা, এটা সম্ভব মনে হয় যে, এমন দুটি ভিন্ন লোক থাকতে পারে যাদের ঠিক একই মানসিক ইতিহাস, সারাজীবনব্যাপী ঠিক একই ধরনের মানসিক অবস্থা বা ঘটনার সমষ্টি বিদ্যমান। এ দুটি কেবল যার দ্বারা পৃথক হতে পারে তা হচ্ছে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন দেহের অস্তিত্ব (যদিও ঠিক একই ধরনের মানসিক ইতিহাস থাকার অর্থ হচ্ছে যে, তাদের ঠিক একই ধরনের দেহ ও একই পারিপার্শ্বিক অবস্থা থাকার প্রয়োজন)। এর অর্থ এই যে, মানসিক সত্তাসমূহ তাদের স্বাতন্ত্র্যের জন্য আংশিকভাবে ভৌত সত্তাসমূহের উপর নির্ভরশীল।

আমাদের এই উপসংহারে উপনীত হতে হচ্ছে যে, চেতনার বিষয়ীর প্রকৃতি সম্পর্কিত যে-কোন মতবাদকে নিশ্চিতভাবে জড়বস্তুর উল্লেখকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, যদিও জড়-দেহের সাথে চেতনার বিষয়ীকে 'সনাক্তকরণের' প্রয়োজন নাও হতে পারে। বাস্তবিকই আমরা দেখেছি যে, এ রকমের সনাক্তকরণকে সমর্থন করার প্রচেষ্টায় চরম অসুবিধা জড়িত রয়েছে। তবুও যে-দ্বৈতবাদে জড়বস্তু থেকে সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন চেতনার অজড় বিষয়ীর ধারণা অন্তর্ভুক্ত তা সনাক্তকরণ এবং স্বতন্ত্রীকরণের সমস্যা সমাধান করতে অক্ষম। সুতরাং, আমাদের চেতনা এবং দেহের সম্বন্ধের প্রতি আমাদের আরো মনোযোগী হতে হচ্ছে। এটাই পরবর্তী অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়।

৪

চেতনা ও দেহ

এই গ্রন্থে এ পর্যন্ত আমরা যা দেখলাম, তাতে আমরা যে চেতনার ঘটনাকে ভৌত ঘটনাতে রূপান্তরিত (reduce) করতে সক্ষম হব তা সম্ভব বলে মনে হয় না; অর্থাৎ এটা সম্ভব নয় যে, যা ভৌত তার মাধ্যমে চেতনা 'সংজ্ঞায়িত হওয়ার যোগ্য' অথবা যা ভৌত তার সাথে বাস্তবিকই যে তা 'অভিন্ন' তা আমরা দেখাতে পারব। ব্যাপারটি যদি সেরূপই হয়, তা হলে এ দুটি ঘটনা কিভাবে সম্পর্কিত, আমাদের সে-সমস্যার সম্মুখীন হতেই হবে, আদৌ যদি তারা সম্পর্কিত হয়। এ-ই হচ্ছে এ অধ্যায়ের আলোচনার বিষয়-বস্তু।

চেতনার অবস্থাকে যে ভৌত পরিবর্তনের সাহায্যে সৃষ্টি করা, পরিত্যাগ করা অথবা পরিবর্তন করা যেতে পারে তা একটা পরিচিত ব্যাপার বলে মনে হবে। (আমরা অচিরেই দেখব যে এই আপাত "পরিচিত ব্যাপার" নানাপ্রকার ব্যাখ্যার সম্মুখীন।) দৃষ্টিসংক্রান্ত ঘটনাবলীর কথা বিবেচনা করা যাক। আমাদের চোখ ঢেকে আমরা দৃষ্টির বিষয়-বস্তুকে বাদ দিতে অথবা অন্ততঃপক্ষে দ্রুত হ্রাস করে দিতে পারি, এবং চোখ খুলে আবার আমরা তাকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনতেও পারি। চোখের নীচ দিককার গর্তে চাপ দিয়ে আমরা নিজেরাই একই জিনিসকে দুটি দেখার (to see double) কারণ ঘটাতে পারি। কিছু সময় ধরে কতকগুলো জিনিসের দিকে তাকিয়ে আমরা চোখের সামনে নানা দাগ-চিহ্ন (spots) অথবা অনুসংবেদন সৃষ্টি করতে পারি। পাণ্ডুরোগ বা তার মত কোন রোগ হলে বস্তু ভিন্ন রকম, অর্থাৎ পীতাভ দেখায়। আমরা জানি যে, যখন আমরা মাথা জোরে ঠোকাই অথবা মাই-গ্রেইন রোগে আকান্ত হয়ে যন্ত্রণায় ভুগি অথবা সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হই, তখন আলোর ঝলক দেখতে পাই। মারিজুয়েনা ও মেস্‌কেলাইন সেবনের কারণে বস্তুকে এমন দেখাতে পারে যেন সেগুলো জ্বলছে অথবা নড়ছে; এবং হুইস্কি পানের ফলে এমন বোধ হতে পারে যেন ছারপোকাগুলো আবার আমার পা বেয়ে উপরে উঠছে। এই ধরনের দৃষ্টান্ত ভৌত কারণগত চেতনার অন্যান্য অবস্থা যেমন, সংবেদন, আবেগময় অনুভূতি, চিন্তা, প্রতিচ্ছবি ইত্যাদির ব্যাপারেও দেয়া যেতে পারে। দৈহিক ঘটনা যে মানসিক ঘটনাকে প্রভাবিত করতে পারে, তখন তা একটি পরিচিত ব্যাপার বলে মনে হবে।

এটাও একটা পরিচিত ব্যাপার বলে মনে হবে যে, মানসিক ঘটনা ভৌত জগৎকে নানাভাবে প্রভাবিত করতে পারে। প্রচণ্ড ভীতিজনক অনুভূতি আমার পক্ষে ফ্যাকাশে, কম্পিত বা মূর্ছিত হওয়ার কারণ হতে পারে। এখন এত অন্ধকার যে, পড়া সম্ভব নয়, আমার এই চিন্তা আমাকে বাতি জ্বালানোর দিকে নিয়ে যেতে পারে। "ছারপোকা প্রত্যক্ষণ" আমার আর্তনাদের কারণ হতে পারে। আমার আগুন ধরিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত সমস্ত নগরটিকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যেতে পারে।

তা হলে, এগুলো হচ্ছে আপাত-দৃষ্টিতে এমন-সব পরিচিত ঘটনা যা চেতনা এবং ভৌত ঘটনার মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক নির্দেশ করে। যেহেতু সবচেয়ে প্রত্যক্ষভাবে প্রাসঙ্গিক ভৌত ঘটনা হচ্ছে 'দেহের' ভেতরকার অবস্থা ও পরিবর্তন (আমাদের দেহের মাধ্যমেই বাহ্যিক ভৌত ঘটনাসমূহ আমাদের চেতনাকে প্রভাবিত করে এবং চেতনা আবার তাদের প্রভাবিত করে), আমরা সে-ক্ষেত্রে জগতের বাকী অংশের ভৌত পরিবর্তনকে অগ্রাহ্য করে চেতনা ও 'দেহের' সম্পর্কের দিকে আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ করতে পারি।

দ্বৈতবাদীতত্ত্বসমূহ

আমরা যেভাবে "বিষয়গুলোকে" উল্লেখ করেছি তাতে সেগুলোর বর্ণনা দেয়ার ব্যাপারে সবচেয়ে সুস্পষ্ট মতবাদটি মনোদৈহিক পারস্পরিক ক্রিয়াবাদ (psychophysical interactionism) নামে পরিচিত। এই মতবাদ অনুসারে, (১) চেতনার অবস্থা কারণিকভাবে দেহের অবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে, এবং (২) দেহের অবস্থা কারণিকভাবে চেতনার অবস্থাসমূহ দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে; এভাবে মন এবং দেহ পরস্পরের উপর ক্রিয়া করতে পারে। উপরের অনুচ্ছেদগুলোতে এই দুই ধরনের কারণিক ক্রিয়ার স্ব স্ব দৃষ্টান্ত রয়েছে।

"আপাতদৃষ্টিতে পরিচিত ব্যাপার"-এর কথা বলে আমরা কেন আত্মগোপন করার চেষ্টা করেছি? এর কারণ, একথা সম্পূর্ণরূপে সুস্পষ্ট হয় নি যে ব্যাপারগুলো সে-রকমই যেভাবে আমরা তাদের উল্লেখ করেছি। আমরা যে চোখ বন্ধ করে চাক্ষুষ অভিজ্ঞতাকে প্রভাবিত করতে পারি, সে "বিষয়টা"র (fact) কথা বিবেচনা করা যাক। এমন ক্ষেত্রে আমরা প্রকৃতপক্ষে কি জানি? আমরা জানি যে, যখন চোখ আবৃত করা হয়, তখন দৃষ্টির বিষয়বস্তু বাদ পড়ে যায়, এবং যখন আবৃতাবস্থাকে সরিয়ে ফেলা হয়, তখন

দৃষ্টির বিষয়-বস্তুকে ফিরে পাওয়া যায়। অন্য কথায়, আমরা জানি যে চোখ বন্ধ করা এবং দৃষ্টির বস্তু বাদ হয়ে যাওয়া, এই দুইয়ের মধ্যে একটি 'পারস্পরিক সম্বন্ধ' রয়েছে। উপরোক্ত দ্বিতীয় দলভুক্ত "ব্যাপারগুলোর" বিষয়ে একই ব্যাপার হয়—যেমন, আমার ভীতিজনক অনুভূতি যে আমাকে ফ্যাকাশে করে ফেলে। আমরা জানি যে, যখন কোন লোক ভীতি অনুভব করে, তখন প্রায়ই এর সঙ্গে কতকগুলো দৈহিক পরিবর্তন যুক্ত হয়--যেমন, পাণ্ডুর হয়ে যাওয়া, কাঁপা অথবা মূর্ছায় পতিত হওয়া। সাধারণভাবে আমরা জানি যে, সচারাচর বা সর্বদাই, ক্ষেত্রবিশেষের ধরন অনুসারে, চেতনার একটি বিশেষ অবস্থা একটি বিশেষ দৈহিক অবস্থার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয়। কিন্তু এর চেয়ে বেশী কিছু আমরা জানি কি? আমরা কি জানি যে, একটি অপরটির 'কারণ'?

পারস্পরিক ক্রিয়াবাদের দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী মতবাদ রয়েছে, এবং প্রতিটিই "বিষয় গুলোর" কিছু ভিন্ন প্রকারের ব্যাখ্যা দিতে চায়। মনোদৈহিক সমান্তরালবাদ (Psychophysical Parallelism) পারস্পরিক সম্বন্ধের বিষয়টি স্বীকার করে, কিন্তু মানসিক এবং দৈহিক-এর মধ্যে যে কোন প্রত্যক্ষ কারণিক সম্পর্ক রয়েছে তা অস্বীকার করে; তাদের মধ্যে 'কেবল' পারস্পরিক সম্পর্ক বিদ্যমান। নিম্নোক্ত উপমাটি প্রায়ই দেয়া হয়ঃ দুটি ঘড়ি যদি এমন হয় যে প্রত্যেকটি সঠিক সময় দেয়, তাহলে একটির প্রতিটি অবস্থা অপরটির অনুরূপ অবস্থার সঙ্গে সর্বদা 'পারস্পরিক সম্বন্ধযুক্ত' হবে, কিন্তু তাদের একটি কোনক্রমেই অপরটির 'কারণ' হয় না।

পারস্পরিক ক্রিয়াবাদের অন্য প্রতিদ্বন্দ্বী মতবাদটি হচ্ছে উপঘটনাবাদ (epiphenomenalism), যে-মতবাদ অনুসারে কারণিক সম্বন্ধের কথা বলা হয়; তবে সে সম্বন্ধ এক দিকে যায়, দৈহিক দিক থেকে মানসিকে, কিন্তু মানসিক দিক থেকে দৈহিকে নয়। এই তত্ত্ব অনুসারে, মানসিক অবস্থা এবং ঘটনা দৈহিক প্রক্রিয়ার উপজাত অথবা পরোক্ষ ফলাফল ছাড়া আর কিছুই না, এবং ওইসব দৈহিক প্রক্রিয়ার উপর তাদের নিজেদের কোন প্রভাব নেই। দৈহিক ঘটনা একটি আলোর উৎসের সম্মুখস্থ চলনশীল আঙ্গুলের মত, এবং মানসিক ঘটনা হল দেয়ালের উপর পতিত ছায়ার মত যা চলনশীল আঙ্গুল-দ্বারা উৎপাদিত কিন্তু আঙ্গুলকে কোনভাবে প্রভাবিত করতে সক্ষম নয়।

পারস্পরিকক্রিয়ার (interaction) আপাত প্রতীয়মান ঘটনাকে তার অভিহিত মূল্যে (face value) গ্রহণ না করে কোন কোন দার্শনিক বরং এ

ধরনের অদ্ভুত মতবাদের কোন একটির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন কেন? আমরা পর্যায়ক্রমে এসব বিকল্প মতবাদের প্রত্যেকটি আলোচনা করব।

সমান্তরালবাদ

শ্রেণীগতভাবে (in type) এত পৃথক ঘটনার মধ্যে যে একটি কারণিক সম্পর্ক থাকতে পারে, সমান্তরালবাদের প্রবক্তাগণ তা সত্য বলে স্বীকার করতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেছেন। সুতরাং, তাঁদের মত হল, ঘটনাসমূহের মধ্যে 'প্রত্যক্ষ কারণিক সম্পর্ক ব্যতিরেকেই' এমন এক ধরনের অনুবন্ধ (correlation) রয়েছে যা আমরা দুটি নিখুঁত ঘড়ির ক্ষেত্রে দেখি। এ সমস্যাটির মূলে রয়েছে কারণ-এর ধারণা। যদি আমরা "কারণ"—এর একটি সংজ্ঞা দিয়ে শুরু করতে পারতাম তা হলে উত্তম হত; কিন্তু বর্তমানে ওই পদের (term) যথাযথ সংজ্ঞা নেই। ডেভিড হিউম দাবী করেন যে, বস্তুনিষ্ঠভাবে বলতে গেলে, নিয়মিত সংযোজন ছাড়া এ ক্ষেত্রে 'আর কিছু' নেই; কিন্তু, দুটি ঘড়ির দৃষ্টান্তে যা দেখা যায় তাতে এ ব্যাখ্যা যথেষ্ট বলে মনে হয় না। ওই দৃষ্টান্তে আমরা 'দুটি' ঘড়ির বিভিন্ন পর্যায়ের নিয়মিত (কিন্তু 'আকস্মিক') অনুবন্ধ এবং 'প্রতিটি বিশেষ' ঘড়ির আনুক্রমিক (successive) পর্যায়-সমূহের নিয়মিত (কিন্তু 'কারণিকভাবে সম্বন্ধযুক্ত') অনুবন্ধের মধ্যে পার্থক্য করতে পারি। এবং সমান্তরালবাদী স্বয়ং, তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের মত, নিয়মিত অনুবন্ধ এবং কারণিক সংযোগের মধ্যকার পার্থক্যটি গ্রহণ করেন; তিনি আনুক্রমিক দৈহিক ঘটনার মধ্যে এবং আনুক্রমিক মানসিক ঘটনার মধ্যে কারণিক সম্পর্ক স্বীকার করেন, যদিও তিনি দৈহিক এবং মানসিক ঘটনার মধ্যে কারণিক সম্পর্ককে প্রত্যাখ্যান করেন।

হিউমের আরও একটি ইঙ্গিত অনুসরণ করে কোন কোন দার্শনিক এই মত পোষণ করেন যে, কারণকে অন্ততঃপক্ষে একটি অনিবার্য শর্ত হতে হবে। এই ধারণাটি নঞর্থক এবং ঘটনা-বিরোধীভাবে (counterfactually) নিম্নোক্ত ভাষায় প্রকাশ করা যেতে পারে: "যদি প্রথম বিষয়টি না ঘটত, তাহলে দ্বিতীয়টির অস্তিত্বও কখনও থাকত না"।[১] কিন্তু একে এমনসব "সহায়তাকারী ব্যবস্থা"র (back-up systems) অস্তিত্বের দ্বারা খণ্ডন করা

---

১ David Hume, *An Essay Concerning Human Understanding*, পরিচ্ছেদ-৭, খণ্ড-২।

হয় যেগুলো থেকে এই নিশ্চয়তা পাওয়া যায় যে, যদি কোন একটি উপায়ে কার্যটি সংঘটিত না হয়ে থাকে, তাহলে ওই কার্যটি অন্য একটি উপায়ে সংঘটিত হবে। এর একটা সাধারণ দৃষ্টান্ত হচ্ছে, একটি ঢালু পাহাড়ের ক্রম-নিম্নভূমিতে "গাড়ী রাখবার স্থান" (park)-এ আপনার গাড়ীকে জরুরী ব্রেকটি কষে এবং সামনের চাকা দুটোকে ঠেকা-দেয়ালে (curb) আটকে রেখে দেয়া। এসব ক্ষেত্রে, প্রকৃত কারণটি যদি বিদ্যমান না থাকত, তবুও ওই একই কার্যফল সংঘটিত হতে পারত। সুতরাং, কারণ একটি কার্যফলের কোন অনিবার্য শর্ত নয়।

আমরা এইটুকু মাত্র বলতে পারি যে, কোন ঘটনাকে অপরটির কারণ বলার অর্থ হল, প্রথমটি দ্বিতীয়টির জন্য একটি পর্যাপ্ত (sufficient) শর্ত এই অর্থে যে যদি প্রথমোক্তটি ঘটে, তাহলে, একই অবস্থায়, শেষোক্তটি 'নিশ্চয়ই' ঘটবে। কিন্তু কারণের এ বিবরণ আমাদের কোন বিশেষ সিদ্ধান্তে নিয়ে যায় না; কেননা, এর পরও আমাদের বলতে হবে কোন্ ধরনের "নিশ্চয়তা" (must) এখানে জড়িত রয়েছে। স্পষ্টতঃই এ কোন যৌক্তিক নিশ্চয়তা নয়, যে নিশ্চয়তার অর্থ এই যে, আগেরটার সংঘটন থেকে পরবর্তীটার সংঘটন যৌক্তিকভাবে অনুসৃত হয়। সবচেয়ে বেশী যা বলা যায় তা এই যে, এ নিশ্চয়তাটা কারণিক, এবং তার ফলে আমরা সেখানেই ফিরে যাব যেখান থেকে আমরা যাত্রা শুরু করেছিলাম। এবং বর্তমানে কার্যকারণের বিশ্লেষণ মোটামুটিভাবে এ পর্যায়েই রয়ে গেছে।

সে যাই হোক, সমান্তরালবাদের প্রবক্তাগণ কার্যকারণের ধারণাকে গ্রহণ করেছেন। তাঁরা স্বীকার করেন যে, দৈহিক ঘটনার মধ্যে কারণিক সম্পর্ক আছে; যার ফলে কোন দৈহিক ঘটনা, যেমন হাত কেটে যাওয়া, অপর একটি 'দৈহিক' অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে, যেমন কোন স্নায়বিক উত্তেজনা যা হাত থেকে মস্তিষ্কে যায়। এবং তাঁরা স্বীকার করেন যে, একটি 'মানসিক' ঘটনা. যেমন একটি তীব্র বেদনার অনুভূতি, অন্য একটি 'মানসিক' ঘটনার জন্ম দিতে পারে—যেমন, এই চিন্তা যে, ওই বেদনা সম্পর্কে আমার কিছু একটা করা উচিত। কিন্তু তাঁরা এটা অস্বীকার করেন যে, একটি 'দৈহিক' ঘটনা—যেমন কতকগুলো স্নায়ুর উত্তেজনা, যা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষের ভেতরকার একটি প্রকাশ্য তড়িৎ-রাসায়নিক (electro-chemical) ঘটনা, বেদনার কোন সংবেদনের মত এমন কোন 'মানসিক' ঘটনার সৃষ্টি করতে পারে যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট গোপনীয় এবং বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে তড়িৎ-রাসায়নিক,

কৌষিক ঘটনা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। এবং একইভাবে, বেদনার কোন সংবেদনের মত কোন মানসিক ঘটনা কোষসমূহে কোন তড়িৎ-রাসায়নিক পরিবর্তন সৃষ্টি করতে পারে, একথাও তাঁরা অস্বীকার করেন। তাঁরা যুক্তি দেন যে, আলোচ্য ঘটনাবলী একেবারেই এত বিসদৃশ যে, এক শ্রেণীর ঘটনা অপর শ্রেণীর ঘটনাকে সৃষ্টি করবে, তা চিন্তা করা যায় না।

চিন্তা করা যেতে পারে যে, ভবিষ্যতে শারীর-তত্ত্ব অথবা মনোবিজ্ঞান মানসিক ও দৈহিকের ভেতর কোন প্রকার "সম্পর্ক" (bridge) আবিষ্কারের দ্বারা মানসিক ও দৈহিকের মধ্যবর্তী বর্তমান প্রকারগত (in kind) পার্থক্যের পরিসমাপ্তি ঘটাবে। কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হবে যে, তা হল একটা গাঁজাখোরি স্বপ্ন (a pipe dream)। ভবিষ্যৎ গবেষণা থেকে আমরা যা আশা করতে পারি তা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট মানসিক ও দৈহিক ঘটনার প্রকৃতির অধিকতর সঠিক নিরূপণ। তা সত্ত্বেও, একদিকে কোন এক প্রকারের মানসিক ঘটনা এবং অন্যদিকে কোন এক প্রকারের দৈহিক ঘটনার শ্রেণীগত মৌলিক পার্থক্যটা আমাদের জন্য থেকে যাবে। এবং কিভাবে এ ধরনের ভিন্নধর্মী ঘটনা পরস্পরকে প্রভাবিত করে, সে-সমস্যাটিও আমাদের জন্য থেকে যাবে।

যাই হোক, মনোদৈহিক সমান্তরালবাদের প্রকল্পের নিজের মধ্যেই অনেক সমস্যা রয়েছে। সমান্তরালবাদের মৌলিক উপমা হিসাবে ঘড়ি দুটো সম্পর্কিত ব্যাপারটা বেশ স্পষ্ট ; প্রতিটি ঘড়ির নিজস্ব আভ্যন্তরিক যান্ত্রিক সংঘঠন রয়েছে যা তার ক্রমানুক্রমিক অবস্থাগুলোর জন্য দায়ী, এবং প্রতিটি যান্ত্রিক সংগঠনের খুঁতহীনতা ঘড়ি দুটোকে সর্বদাই ঠিকমত কার্যক্ষম রাখে। কিন্তু দেহ-মনের সম্পর্কের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ঠিক এর সদৃশ মনে হয় না। কারণ, যেক্ষেত্রে কেবল দৈহিক শব্দাবলীর (terms) মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন ক্রমানুগামী (succeeding) অবস্থাগুলোর ব্যাখ্যা দেয়ার সম্ভবনার কথা ভাবা যায়, সেক্ষেত্রে কেবল মানসিক শব্দাবলীর মাধ্যমে মনের বিভিন্ন ক্রমানুগামী অবস্থাগুলোর ব্যাখ্যা দেয়ার কোন উপায় আছে বলে মনে হয় না। অগ্নিকাণ্ডের সংকেত শোনার ফলে জেগে উঠেছে, এমন এক নিদ্রিত ব্যক্তির অবস্থা বিবেচনা করা যাক। তার মনটি হঠাৎ ক্রন্দন-ধ্বনি এবং নানা গোল-যোগপূর্ণ শব্দে ভরে উঠেছে। এখন সমান্তরালবাদী যদি অভ্রান্ত হয়ে থাকেন, তাহলে ওই মানসিক ঘটনার সংঘটন, অর্থাৎ শব্দের শ্রবণ, পূর্ববর্তী কোন মানসিক ঘটনার সাহায্যে কেবল মানসিক ঘটনাবলীর এলাকার মধ্যেই ব্যাখ্যা

করা যেতে পারে। কিন্তু নিশ্চয়ই ক্রন্দন-ধ্বনি ও গোলযোগের শ্রবণকে কেবল কোন পূর্ববর্তী মানসিক অবস্থা বা ঘটনার প্রতি আবেদন করে ব্যাখ্যা করা যায় না। শ্রবণক্রিয়ার পূর্বগামী আচরণ হিসাবে একমাত্র সুস্পষ্ট প্রার্থী হচ্ছে বিপদ-সংকেতের ঘন্টাধ্বনি, এবং তা সমান্তরালবাদীর বক্তব্যের প্রেক্ষিতে কারণ হিসাবে গণ্য হয় না। সুতরাং, এ বিষয় সম্পর্কে একজন সমান্তরাল-বাদী যা বলতে পারেন তা কেবল এই যে, যখন বিপদ-সংকেতের ঘন্টাধ্বনি হয় তখন একই সময়ে বিপদ-সংকেত শ্রবণের সাথে সংশ্লিষ্ট মানসিক ঘটনাটি ঘটে মাত্র, এবং এটা কারণিক সম্বন্ধবিহীন নিছক একটি অনুবন্ধ মাত্র। কিন্তু কেন যে সেই অনুবন্ধ ঘটবেই তা সম্পূর্ণ ব্যাখ্যাতীত; অপরপক্ষে, দুটি ঘড়ির দৃষ্টান্তের ক্ষেত্রে কেন যে অনুবন্ধগুলো ঘটা উচিত তা সম্যকরূপে ব্যাখ্যাযোগ্য। সুতরাং, উপমাটি এখানে অকেজো হয়ে পড়ছে। উপমাটির অন্তর্গত প্রতিটি ঘড়িতে যেভাবে একটা স্বয়ং-বেষ্টিত এবং কারণিকভাবে স্বয়ং-সম্পূর্ণ ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, কোন মানসিক ব্যাপারের মধ্যে তেমনভাবে সে-রকম কোন ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং, সমান্তরালবাদী মতবাদে মানসিক ও দৈহিকের অনস্বীকার্য অনুবন্ধের বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে অলৌকিক ও ব্যাখ্যাতীত থেকে যায়।

এই সমস্যার সমাধানের প্রচেষ্টায়, সতের শতকের ফরাসী দার্শনিক মালেব্রাঁশে (Malebranche) এ মর্মে একটি মতবাদ (উপলক্ষণবাদ নামে) প্রবর্তন করেছিলেন যে, ঠিক যখন বিপদ-সংকেতটি বাজছে তখনই 'ঈশ্বর' বিপদ-সংকেতের শ্রবণকে মনের মধ্যে সৃষ্টি করেন। কিন্তু উভয়ের মধ্যে প্রত্যক্ষ কার্যকারণের সাহায্য না নিয়ে মানসিক ও দৈহিকের অনুবন্ধ ব্যাখ্যার এই যে বেপরোয়া প্রচেষ্টা, আধুনিক মানুষের মনকে তা কখনও আকর্ষণ করেনি। বিপদ-সংকেতের ঘন্টা এবং এই ঘন্টাধ্বনির শ্রবণ, এই দুইয়ের মধ্যে যে অনুবন্ধ রয়েছে তাকে সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যাতীত বলা এবং অনুবন্ধটি যে ঐশ্বরিক ইচ্ছার কার্য দ্বারা অলৌকিকভাবে উৎপাদিত হয় তা বলার মধ্যে খুব বেশী পার্থক্য নেই।

ঘন্টাধ্বনি শ্রবণের ঘটনাটির কারণ, এই সিদ্ধান্তটি এত সুস্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও সমান্তরালবাদী কেন তার বিরোধিতা করেন? এর কারণ হল, এখানে যে-ঘটনাগুলো জড়িত রয়েছে সেগুলোর প্রকৃতি একেবারেই ভিন্ন প্রকারের। কিন্তু এই বিরোধিতার উৎস কি? আর যাই যোক, এমন অনেক ব্যাপার কি নেই যেখানে কারণ ও কার্য একেবারেই ভিন্ন প্রকৃতির? একটি খুব ঠাণ্ডা

বরফের টুকরোর কথা বিবেচনা করা যাক, যা ক্রমশঃ এভাবে গরম করা হল যেন তা বরফ থেকে তরল পদার্থে এবং পরে বাষ্পীয় পদার্থে পরিবর্তিত হল। এখানে আমরা সর্বক্ষণব্যাপী 'একই' কারণ পাচ্ছি, তা হচ্ছে তাপের প্রয়োগ। প্রথমে আমরা এই ফলাফল পাচ্ছি যে বরফ গলে পানি হল; তারপর পানির তাপ বৃদ্ধি পেল, তারপর পানি ফুটতে শুরু করল, তারপর তা বাষ্পে পরিণত হতে লাগল, এবং তারপর ওই বাষ্পের তাপ বৃদ্ধি পেল। এই কার্যফলগুলোর একটি সম্পূর্ণভাবে অপরটির থেকে কত ভিন্ন, এবং প্রতিটি কার্যফল কারণটি থেকে সম্পূর্ণভাবে কত পৃথক! তবুও একথা বলা বাস্তবিকই হঠকারিতা হবে যে, যেহেতু কথিত কারণ এবং ফলাফলগুলো পরস্পর থেকে এত ভিন্ন প্রকৃতির, সেজন্য এক্ষেত্রে কোন কারণিক সম্পর্ক থাকতে পারে না, কেবল অনুবন্ধই থাকবে। কারণ এবং কার্যফল যেখানে আমরা দেখতে পাই সেখানেই তারা আছে, এবং এটা বৈজ্ঞানিক যুক্তির নিয়ম লঙ্ঘনই হবে যদি আমরা কোন দৃশ্যমান কারণিক সম্বন্ধকে অভিজ্ঞতাপূর্ব ভিত্তিতে (on the a priori ground) এই বলে প্রত্যাখ্যান করি যে, ঘটনাগুলো "এত ভিন্ন প্রকৃতির" যে সেগুলো কারণিকভাবে সম্বন্ধযুক্ত হতে পারে না।

কোন ব্যক্তি কেন এমন চিন্তা করতে ইচ্ছুক হতে পারেন যে, মানসিক এবং এবং দৈহিক ঘটনার শ্রেণীগত পার্থক্য কারণিক সম্বন্ধকে প্রত্যাখ্যান করছে? এই প্রবণতার একটা উৎস হচ্ছে এই অনুভূতি যে, কারণ এবং ফলাফলের মধ্যে কোন বোধগম্য সম্বন্ধ থাকা উচিত, কাউকে কারণের মধ্যে ফলাফলের উপস্থিতি লক্ষ্য করতে সক্ষম হওয়া উচিত, কারণের মধ্যে কোন উপায়ে ফলাফলটি অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত এবং কারণ থেকেই তা বেরিয়ে আসা উচিত। এই অনুভূতিতটি স্পিনোজার দর্শনে প্রবলভাবে বিদ্যমান এবং এই বিখ্যাত দৃষ্টান্ত এমন একজন দার্শনিকের যিনি মানসিক এবং দৈহিকের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়ার সম্ভাব্যতাকে অস্বীকার করেছিলেন। তিনি মনে করতেন যে, কার্য কারণ থেকে ঠিক সেইভাবে অনুগমন করে, যেভাবে একটি জ্যামিতিক পদ্ধতির প্রতিজ্ঞাগুলো সংজ্ঞা এবং স্বতঃসিদ্ধসমূহ থেকে অনুগমন করে, এবং, ঐ কারণে, "যদি দুটি জিনিসের মধ্যে কোন কিছুই সাধারণ না থাকে, তাহলে একটি অপরটির কারণ হতে পারে না"।[১] এরূপ যুক্তির প্রেক্ষিতে এ রকম ধারণা আপাতসিদ্ধ যে, যা মানসিক এবং দৈহিক তা একটি অপরটিকে কারণিকভাবে প্রভাবিত করতে পারে না।

---

১ *Ethics*, খণ্ড--১, প্রতিজ্ঞা-৩।

হিউমই অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে দেখিয়েছিলেন যে, কার্যকারণের এই বর্ণনা ভ্রান্তিমূলক। তিনি এই মত পোষণ করেন যে, কোন কারণের সূক্ষ্ম অনুসন্ধান যতই পুঙ্খানুপুঙ্খ হোক না কেন, তার থেকে অভিজ্ঞতাপূর্বভাবে বলা যেতে পারে না যে তার কার্যটা কি হবে। কেবল অপেক্ষা করে দেখা কি ঘটছে, যাতে করে আমরা নির্ধারণ করতে পারি কি কি কারণ কোন্ কোন্ কার্যের সৃষ্টি করছে। উপযুক্ত পরিমাণে কোন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পর আমরা একটা বিশেষ ঘটনার অস্তিত্ব থেকে অনুমান করতে সক্ষম হতে পারি যে, এর একটি বিশেষ ফলাফল হবে, কিন্তু এরূপ অনুমান কেবল এই জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত যে অতীতে এ দুটি পারস্পরিকভাবে সম্বন্ধযুক্ত ছিল। এবং যদি দুই প্রকারের ঘটনা অতীতে পারস্পরিকভাবে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে থাকে, তাহলে এটা সম্ভব যে সেগুলো কারণিকভাবে সম্বন্ধযুক্ত, বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে সেগুলো যত ভিন্নই হোক না কেন।

মানসিক ও দৈহিক ঘটনার মধ্যে কারণিক সম্পর্ক স্থাপন করে, এমন মতবাদগুলো কোন কোন দার্শনিক প্রত্যাখ্যান করেছেন এই যুক্তিতে যে, এরূপ সম্পর্ক সমকালীন পদার্থবিজ্ঞানের যে ভিত্তিস্তর, অর্থাৎ ভরশক্তির সংরক্ষণ নীতি (the principle of the conservation of energy), তাকে লঙ্ঘন করে। যদি দৈহিক ঘটনা মানসিক ফলাফলসমূহের সৃষ্টি করে, তবে এভাবে শক্তির ব্যয় হবে এবং ভৌত ব্যবস্থার সামগ্রিক ভরশক্তি হ্রাস পাবে। আর যদি মানসিক ঘটনা দৈহিক পরিবর্তন সৃষ্টি করে, তাহলে ভৌত ব্যবস্থার সামগ্রিক ভরশক্তি বৃদ্ধি পাবে। এর যে-কোন একটির ক্ষেত্রেই সংরক্ষণ নীতিটি লঙ্ঘিত হবে। এবং যুক্তি দেয়া হয় যে, সংরক্ষণ নীতিটি প্রত্যাখ্যান করার চেয়ে এরূপ যে-কোন মতবাদকে প্রত্যাখ্যান করাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। কারণিক মতবাদ সমূহের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ বৈধ কি?

পারস্পরিক ক্রিয়াবাদীতত্ত্বের সমর্থনকারীরা কখনো কখনো এরূপ মত পোষণ করেন যে, শেষ পর্যন্ত শক্তির ভারসাম্য অটুট থেকে যাবে, অর্থাৎ মানসিক ফলাফল সৃষ্টিতে ব্যয়িত শক্তি মানসিক কারণসমূহ থেকে ফিরে পাওয়া যাবে। অন্যান্য পারস্পরিক ক্রিয়াবাদীরা এবং উপঘটনাবাদীরা কখনো কখনো এই মত পোষণ করেন যে, ব্যয়িত শক্তি ও প্রাপ্ত (gained) শক্তির পরিমাণ এত কম হতে পারে যে, সর্বপ্রকার ব্যবহারিক ও পরীক্ষা-মূলক কাজের ব্যাপারে তা নগণ্যই হবে। কিন্তু সমস্যা সমাধানের এ জাতীয়

প্রচেষ্টা দুটি কারণে কার্যকর হবে না। প্রথমতঃ, এসব কথা যে সত্য তা বিশ্বাস করার বিন্দুমাত্র কারণ নেই; ভৌত ব্যবস্থায় যদি শক্তি সংরক্ষিতই না হয়, তবে এমন ভাবার কোন যুক্তি নেই যে, চূড়ান্ত পর্যায়ে শক্তির মোট পরিমাণ (long run total) সংরক্ষিত হচ্ছে, না কেবল কিছুমাত্র পরিবর্তিত হচ্ছে। দ্বিতীয়তঃ, ওসব কথা সত্য হলেও, বর্তমানে প্রচলিত সংরক্ষণ-নীতিকে আমাদের পরিত্যাগ করা প্রয়োজন হবে; তবে এমন কাজ অত্যন্ত অবাঞ্ছিত হবে, কারণ সমকালীন পদার্থবিদ্যার অনেকখানি এ নীতির উপর নির্ভর করেই অবিশ্বাস্য ক্রমোন্নতির দিকে অগ্রসর হয়েছে।

কার্য-কারণ তত্ত্বানুসারে পক্ষসমর্থনের এই উভয় প্রচেষ্টাকে অভিযোগটির কাছে যেটুকু দাবী মেনে নেয়া উচিত তার চেয়ে অধিক মেনে নিচ্ছে। সেগুলো স্বীকার করছে যে, মানসিক ও দৈহিকের পারস্পরিক ক্রিয়ার মধ্যে ভৌত শক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু এটা একটা ভুল ধারণা। সমকালীন পদার্থবিদ্যার মতানুসারে, কেবল 'দৈহিক' পারস্পরিক ক্রিয়ার ক্ষেত্রেই ভৌত শক্তির বৃদ্ধি বা হ্রাস-প্রাপ্তি ঘটে। 'দৈহিক' কাজ করতে ভৌত শক্তির প্রয়োজন হয়, কিন্তু একথা চিন্তা করার কোন কারণ নেই যে অভৌত (অর্থাৎ মানসিক) কাজ করতে ভৌত শক্তির প্রয়োজন হয়। একইভাবে, একথা চিন্তা করার কোন কারণ নেই যে, অভৌত কারণিকতা (non-physical causality) অনিবার্যভাবে ভৌত শক্তির মাত্রায় (in physical energy level) পরিবর্তন ঘটায়।

শক্তির মধ্যে পরিবর্তন ছাড়াই কিভাবে কার্যকারণগত পারস্পরিক ক্রিয়া ঘটতে পারে তার দুটি উদাহরণ বিবেচনা করা যাক। প্রথমতঃ, কারণ হিসাবে মানসিক ঘটনার ক্ষেত্রে, একখণ্ড তেজস্ক্রিয় পদার্থ (radio-active material) থেকে একটি কণিকার নির্গমনের (erosion) কথা বিবেচনা করা যাক। নির্গমন এখনই অথবা কিছু আগে বা পরে ঘটলেও শক্তির সংরক্ষণ বজায় থাকে, যদিও নির্গমনের সময়ের উপর নির্ভর করে সামগ্রিক ফলাফল সম্পূর্ণ ভিন্ন হতে পারে। এখন মনে করা যাক যে, যা নির্গমনের সময়টিকে নির্ধারিত করে তা একটি 'মানসিক' ঘটনা। তার ফলে কোনক্রমেই ভৌত ব্যবস্থার সামগ্রিক শক্তি পরিবর্তিত হত না, যদিও তার ফলে ওই ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ ইতিহাসে বিপুলভাবে পরিবর্তিত হতে পারত। কোন কোন পারস্পরিক ক্রিয়াবাদী এমন কল্পনা করেছেন যে, মানসিক ঘটনা মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষের তথাকথিত "লক্ষ্যবিহীন" (random) ঘটনাগুলোকে এবং তার মাধ্যমে

জীবের সামগ্রিক আচরণকে অর্থপূর্ণভাবেই প্রভাবিত করতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, ফলাফল হিসাবে মানসিক ঘটনার ক্ষেত্রে, বস্তুদ্বারা পাতিত পরিবর্তনশীল ছায়ার কথা বিবেচনা করা যাক। বস্তু, আলোর উৎস এবং ছায়াচ্ছন্ন স্থানের (shaded surfaces) পরিবর্তনে যে শক্তি ব্যয়িত হয়, ছায়ার মধ্যে পরিবর্তন সৃষ্টিতে এর অতিরিক্ত কোন শক্তি ব্যয়িত হয় না। ছায়ার পরিবর্তনের অন্তর্ভুক্ত ঘটনার পক্ষে সেগুলো উৎপাদনের জন্য আর কোন শক্তি প্রয়োজন হয় না। মানসিক জগতে ঘটিত কিছু কিছু পরিবর্তনকে কেউ হয়ত ভৌত পারস্পরিক ক্রিয়া দ্বারা মনের "উপরিভাগ"-এ (surface) নিক্ষেপিত পরিবর্তন বলে মনে করতে পারেন। তার জন্য কোন অতিরিক্ত কাজের প্রয়োজন হয় না, এবং সে-কারণেই এরূপ একটি কাজে কোন শক্তির ব্যয় ঘটে না।

আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, মানসিক ঘটনা এবং দৈহিক ঘটনা বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে অত্যন্ত ভিন্ন প্রকৃতির, এ সত্য থেকে কার্য-কারণ সম্পর্কিত মতবাদের বিরুদ্ধে যেমন কোন আপত্তি উত্থাপিত হয় না, তেমনি সংরক্ষণের নীতি থেকেও কোন আপত্তি ওঠে না।

সুতরাং, মানসিক ঘটনা এবং দৈহিক ঘটনার মধ্যে অনুবন্ধটি স্বীকার করার পর তাদের মধ্যে যে কোন কার্যকারণ সম্পর্ক রয়েছে তা অস্বীকার করা অযৌক্তিক। একথা সত্য যে, কোন প্রত্যক্ষ কারণিক সম্পর্কের কথা স্বীকার না করে নিয়েই অনুবন্ধকে বিভিন্ন উপায়ে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। দুটি ঘড়ির বিষয়টি হচ্ছে এমন একটি উপায়। কিন্তু আমরা দেখেছি যে, ওই ধরনের বিকল্প ব্যাখ্যা মানসিক ও দৈহিকের ব্যাপারে পাওয়া যায় না।

প্রত্যক্ষ কারণিক সম্পর্কের আরেকটি বিকল্পের কথা এখানে উল্লেখ করা উচিত। নিম্নোক্ত প্রকারের ঘটনার একটা উপমার উপর এই বিকল্প প্রতিষ্ঠিত। কোন একটি অপরিবর্তনীয় (irreversible) প্রক্রিয়ার কথা, উদাহরণস্বরূপ একটি চিকিৎসার অযোগ্য (incurable) রোগের কথা কল্পনা করা যাক, যার প্রাথমিক পর্যায়ে সর্বদাই একটি লক্ষণ থাকে এবং পরবর্তী পর্যায়ে অন্য একটি লক্ষণ থাকে। এরূপ একটি ক্ষেত্রে, পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী পর্যায়ের লক্ষণের মধ্যে নিয়মিত সংযোগ থাকে, কিন্তু তাদের মধ্যে কোন প্রত্যক্ষ কারণিক সম্পর্ক থাকে না। পূর্ববর্তী লক্ষণ পরবর্তী লক্ষণের কারণ হয় না, বরং এদের প্রত্যেকটি অপর কোন তৃতীয় উপাদানের অর্থাৎ অন্তর্নিহিত রোগাত্মক অবস্থার (underlying pathological condition)

দ্বারা সংঘটিত হয়। একইভাবে কেউ চিন্তা করতে পারেন যে যা মানসিক ও দৈহিক তা এমন কোন অন্তর্নিহিত তৃতীয় উপাদানের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে পারস্পরিক সম্বন্ধযুক্ত হয় যার দ্বারা তাদের প্রতিটি উৎপন্ন হয়। স্পিনোজা অনেকটা এ ধরনেরই একটি মতবাদ পোষণ করতেন। এবং এটা সম্ভব যে, ব্যক্তি-তত্ত্ব নামে তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা যা আলোচনা করেছি তা এরূপ একটা ধারণার আরেকটি ভিন্নরূপ। প্রত্যক্ষ কারণিক সম্পর্ককে অস্বীকার করলে এরূপ একটি মতবাদ সমান্তরালবাদের মতই হয়ে পড়বে, কিন্তু অন্তর্নিহিত তৃতীয় উপাদানের মাধ্যমে একটি পরোক্ষ কারণিক সম্পর্ককে স্বীকার করে নেয়াতে তা সমান্তরালবাদ থেকে ভিন্ন হবে।

এরূপ একটি মতবাদের একমাত্র অসুবিধা হল এই যে, এতে বিশ্বাস করার আদৌ কোন কারণ নেই। একথা বিশ্বাস করার কোন যুক্তি নেই যে, মানসিক ও দৈহিক এই উভয়েরই মূলে কোন তৃতীয় উপাদান রয়েছে এবং তা প্রত্যেকটির অন্তর্গত ঘটনার অনুক্রমকে ব্যাখ্যা করতে পারে। এরূপ একটি একীভূত মতবাদ ভবিষ্যতে কোন সময়ে যুক্তিপূর্ণ বলে মনে হতেও পারে, তবে বর্তমানে এর কোন সমর্থন নেই। স্পিনোজা তাঁর তৃতীয় উপাদানকে নানাভাবে উল্লেখ করেছেন—যেমন পদার্থ, ঈশ্বর, এবং প্রকৃতি; কিন্তু তিনি এটা দেখাতে কোন প্রমাণ দেননি যে এরূপ একটি তৃতীয় উপাদান বাস্তবিকই মানসিক এবং দৈহিক ঘটনার অনুক্রমকে ব্যাখ্যা করতে পারে। এবং আর কেউ মানসিক ও দৈহিক এই উভয়ের ভিত্তিরূপী তৃতীয় উপাদানটির অস্তিত্বের বিষয়ে আপাতদৃষ্টিতে যুক্তিপূর্ণ কোন তথ্য প্রদর্শনে সক্ষম হন নি। তাহলে আমরা সেই মতবাদগুলোর দিকে আবার মনোনিবেশ করি যেগুলো মানসিক এবং দৈহিক ঘটনার মধ্যে প্রত্যক্ষ কারণিক সম্পর্ক স্বীকার করে। সেগুলোর নাম হচ্ছে উপঘটনাবাদ ও পারস্পরিক ক্রিয়াবাদ।

উপঘটনাবাদ

উপঘটনাবাদী মনে করেন যে, মানসিক এবং দৈহিকের মধ্যে একটি কার্য-কারণ সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে, কিন্তু এই সম্বন্ধ কেবল একদিকে যায়, দৈহিক দিক থেকে মানসিক দিকে; যার ফলে মানসিক ঘটনা সর্বদাই দৈহিক পরিবর্তনের 'ফলাফল' মাত্র এবং কখনোই দৈহিক পরিবর্তনের 'কারণ' নয়। মানসিক ঘটনা যেন দৈহিক প্রক্রিয়াগুলোর ছায়ামাত্র, এবং ওই দৈহিক

প্রক্রিয়াগুলোকে প্রভাবিত করতে অক্ষম। এই অধ্যায়ের শুরুতে উল্লেখিত পরিচিত ঘটনাবলীর প্রথম শ্রেণীটিকে উপঘটনাবাদী গ্রহণ করেন, যার একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে, আমরা চোখকে ঢেকে রাখার মত দৈহিক পরিবর্তনের মাধ্যমে দৃষ্টির বিষয়বস্তুকে কারণিকভাবে প্রভাবিত করতে পারি। কিন্তু সমভাবেই পরিচিত ঘটনাবলীর এমন একটি শ্রেণীকে উপঘটনাবাদী প্রত্যাখ্যান করেন বলে মনে হয়, যেখানে মানসিক ঘটনা কারণিকভাবে দৈহিক ঘটনাকে প্রভাবিত করে। তিনি তা করেন কেন?

উপঘটনাবাদী বিশ্বাস করেন যে, পদার্থিক বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের আলোচনা দৈহিক ঘটনার সংখ্যায় এমন একটা ক্রম-বৃদ্ধি দেখাবে যা কেবল ভৌতধর্মী শব্দাবলীর সাহায্যেই ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। ঘটনার পর ঘটনার ক্ষেত্রে, দৈহিক ঘটনার অভৌত কারণের বিকল্প নিষ্ফল প্রমাণিত হয়েছে; অপরপক্ষে, ভৌত কারণের প্রকল্প থেকে গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল পাওয়া গেছে। আমরা আর বিশ্বাস করি না যে, অশরীরী আত্মা আবহাওয়া, শস্যের উৎপাদন ক্ষমতা, অথবা প্রাণীর সন্তানোৎপাদন ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে; এগুলোকে আমরা কেবল ভৌতধর্মী শব্দাবলীর মাধ্যমে ব্যাখ্যা করতে পারি। আমরা দেখেছি বিভিন্ন প্রকারের অস্বভাবী আচরণ, যেমন সন্ন্যাসরোগে আক্রান্ত হওয়া, মস্তিষ্কের বিশৃঙ্খল কার্য দ্বারা সংঘটিত হয়, ভূত ধরেছে এমন বলা এখন আর আমাদের প্রয়োজন হয় না। এবং ভূত, শব্দকারী ভূত (poltergeists) ও অন্যান্য প্রকারের ভূত ভৌত ঘটনার ব্যাখ্যায় এখন আর আগের মত ভূমিকা পালন করে না। এমন অনুমান করা কোন অযৌক্তিক অভিক্ষেপণ (extrapolation) নয় যে, ভৌত ঘটনার 'সবটাই' পরিশেষে কেবল ভৌতধর্মী শব্দাবলীর দ্বারাই ব্যাখ্যার যোগ্য। মনে হয় এটাই সেই লক্ষ্য যার দিকে বিজ্ঞান অগ্রসর হচ্ছে। আমরা কখনও তেমন কালে এসে উপস্থিত নাও হতে পারি, যখন আমরা বস্তুতঃই প্রত্যেক জিনিসকে কেবল ভৌতধর্মী শব্দাবলীর দ্বারাই ব্যাখ্যা করতে পারব; কিন্তু উপঘটনাবাদী এই যুক্তি দেখান যে, কোন দৈহিক ঘটনাকে ব্যাখ্যার জন্য কোন অশরীরী মাধ্যমের প্রকল্পকে অপরিহার্য মনে করার কোন কারণ নেই। এবং বিজ্ঞানের সমগ্র ইতিহাসই এরূপ প্রকল্পের বিরোধী।

কিন্তু যেখানে মানসিক ঘটনা দৈহিক ঘটনাকে প্রভাবিত করে বলে মনে হয়, সেসব আপাতত সুপরিচিত ঘটনা সম্পর্কে উপঘটনাবাদী কি বুঝেন? এ রকম বলার একটা প্রবণতা আমাদের আছে যে, একটি মানুষ তার হাত

কাটলে বেদনার অনুভূতিই তার ছটফটানির কারণ ঘটায়। উপঘটনাবাদীদের মতে প্রকৃত পক্ষে যা ঘটে তা হচ্ছে এই। ওই ক্ষত তার মস্তিষ্কের স্নায়ুর মধ্যে ঘটনার একটি পারম্পর্য সৃষ্টি করে, যার ফলে মস্তিষ্কের ভেতরে এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি হয় যা থেকে সেই দৈহিক গতি-সঞ্চালন উৎপন্ন হয় যাকে আমরা ছটফটানি বলি। ওই মস্তিষ্কবর্তী অবস্থা সেই সংবেদনটিও ঘটায় যাকে আমরা বেদনার অনুভূতি বলি, সংবেদনটি হল দৈহিক ঘটনার, পারম্পর্যের 'উপজাত' মাত্র, যা ক্ষতের সাথেই শুরু হয় এবং ছটফটানিতে শেষ হয়: এই অনুক্রমের (series) কোন অংশেই সংবেদনটির নিজের কোন প্রভাব নেই। একইভাবে বলা যায়, এখন এত অন্ধকার যে পড়া যায় না, আমার এই ভাবনা প্রকাশ্যভাবে আমার বাতি জ্বালানোর কারণ ঘটায়। এটি কেবল একটা দৈহিক কারণিক পারম্পর্যের উপজাত মাত্র যা আমার ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে দৈহিক উত্তেজনার ফলে শুরু হয়, একটি বিশেষ মস্তিষ্কবর্তী অবস্থা সৃষ্টি করে, এবং আমার হাতের নড়া এবং বাতি জ্বালানোতে শেষ হয়; দৈহিক ঘটনাগুলোর পারম্পর্যের উপর চিন্তার নিজস্ব কোন ফলাফল নেই। এটা এমন একটা ভুল ধারণা যে, একটি ঘড়ির চলন্ত কাঁটা ঘড়িটির ঘন্টা বাজানোর কারণ, ঠিক তেমনি এ ধারণাও ভুল যে, মানসিক ঘটনার ফলাফল আছে।

উপঘটনাবাদের আপাতবিরোধিতা

মানসিক ঘটনার ফলাফল থাকা যদি কোন ভ্রম হয়, তাহলে মানুষের কাজ নিয়ে সাধারণতঃ যেভাবে চিন্তা করা হয় তা থেকে সম্পূর্ণরূপে ভিন্নভাবে সেগুলো সম্পর্কে চিন্তা করতেই হবে। ঐতিহাসিকগণ ঘটনাকে মানুষের সিদ্ধান্ত, আবেগ, চিন্তা, এবং সংবেদনের প্রতি আরোপ করতে পছন্দ করেন। এই মতবাদ অনুসারে সেসবই ভ্রমাত্মক হবে। এবং ওইসব ভাষায় মানব-ব্যবহার সম্পর্কিত আমাদের সাধারণ, প্রাত্যহিক ব্যাখ্যাসমূহও ভ্রমজনক হবে। উপঘটনাবাদী আমাদের বিশ্বাস করাতে চাইবেন যে পিরামিডগুলো এবং এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং কোন চিন্তা ছাড়াই তৈরী হয়েছিল, চিত্রকলার সর্বোত্তম কাজগুলো কোন অনুভূতির ফলাফল ছাড়াই সৃষ্ট হয়েছিল; যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল এবং আণবিক অস্ত্র ব্যবহৃত হয়েছিল, কিন্তু মানুষের কোন চিন্তা অথবা সিদ্ধান্তের ফলশ্রুতি হিসাবে তা করা হয়নি। যেহেতু তার মতবাদটা হচ্ছে এই যে, মানসিক ঘটনাগুলোর কোন ফলাফল নেই, সেহেতু

উপঘটনাবাদী আমাদের বিশ্বাস করাতে চাইবেন যে, মানুষের সমগ্র ইতিহাস বাস্তবপক্ষে যেভাবে কম বিকশিত হয়েছে, ঠিক সে-ভাবেই উন্নতি ঘটত যা কখনও কোন চিন্তা, আবেগ, সংবেদন অথবা অন্য মানসিক ঘটনা বিদ্যমান না থাকলেও ঠিক সেইভাবে তার ক্রমবিকাশ ঘটত। প্রতিটি মানুষ সর্বদাই সম্পূর্ণরূপে অচেতন থাকলেও, প্রত্যেকটি জিনিস ঠিক এভাবেই চলত, এমনকি আমাদের ভাষা, এর মনোগত উক্তিগুলো সহকারেই, বিদ্যমান থাকত, এবং, সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ব্যাপার এই যে, যেসব ভাষাগত আদান-প্রদান যা মানসিক ঘটনার প্রকৃতি ও সঠিক অস্তিত্ব সম্পর্কিত আমাদের আলোচনার প্রতিনিধিত্ব করে, সেগুলোও সংঘটিত হত। যদি কোন মানসিক ঘটনা কখনোই না ঘটত, তবুও মানুষ তাদের অস্তিত্বে বিশ্বাস করত, অথবা, যদি বিশ্বাস নিজেই একটা মানসিক ঘটনা হয়, তবু মানুষ এভাবে কথা বলত এবং কার্যকলাপ করত যেন মানসিক ঘটনাগুলো ছিল!

বহু দার্শনিক দেখেছেন যে, উপঘটনাবাদের আপাতবিরোধী তাৎপর্যগুলো এত অবিশ্বাস্য যে সেগুলোকে গ্রহণ করা যায় না। কিন্তু তথাপি সেগুলোকে গ্রহণ করতেই হবে, যদি উপঘটনাবাদ সঠিক হয়। কেননা, সে-মতবাদ অনুসারে মানসিক ঘটনার নিজস্ব কোন ফলাফল নেই, সেগুলো কোন ফলোৎপাদন করে না, এবং সেগুলো কখনও না ঘটলেও কোন কিছুই ভিন্নতর প্রকৃতির হত না। বিংশ শতাব্দীর একজন উপঘটনাবাদী, জর্জ সান্তায়ানার (George Santayana) ভাষায় সেগুলো হচ্ছে ঃ "কাজের মধ্যে একটি গীতি-ধর্মী ক্রন্দন"* এবং এমন একটি ক্রন্দন যা কোন প্রকারেই কাজের গতিকে প্রভাবিত করতে পারে না।

উপঘটনাবাদী মতবাদের প্রতি ন্যায়-বিচার করতে হলে এটা দেখাতেই হবে যে, আপাতদৃষ্টিতে মতবাদটি যত অবিশ্বাসযোগ্য মনে হয় আসলে তা তেমন নয়; উৎকট আপাতবিরোধের দিকটি কিছুটা দূর করা যেতে পারে। উপঘটনাবাদী যখন বলেন যে, কোন মানুষ কখনও চেতনাশীল না থাকলেও সবকিছুই ঠিক একইভাবে ঘটে থাকত, তখন তিনি একথা মনে করছেন না যে, যারা ঘুমে অথবা গভীর অচেতনাবস্থায়, অথবা গভীর মূর্ছায় অথবা শূণ্য দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে, এমনসব মানুষ কর্তৃকই পিরামিডগুলো তৈরী হয়েছিল। এবং যখন তিনি বলেন যে, কোন চিন্তা, অনুভূতি, সিদ্ধান্ত ইত্যাদি ব্যতিরেকেই তারা এগুলো করতে পারত, তখন তিনি এটা বুঝাচ্ছেন যে, তারা

*"a lyric in the midst of business"

এগুলো তাড়না বশতঃ, অসাড়ভাবে, অথবা এলোমেলোভাবেই করেছিল। মানুষকে তাই আমাদের এভাবে চিত্রিত করা উচিত হবে যে, তারা দক্ষতার সাথে চলাফেরা করছে, মনোযোগের সাথে নকশাগুলো দেখছে, তাদের মাথা চুলকাচ্ছে অথবা হাতের উপর মাথা রেখে বসে আছে, প্রাণচঞ্চলভাবে আকার-ইঙ্গিত করছে---সংক্ষেপে বলা যায়, যে আচরণ চেতনার প্রতীক তার সবটুকু প্রতিফলিত করেই মানুষ আচরণ করছে। কোন পর্যবেক্ষক এ দৃশ্য অবলোকন করলে যা দেখতে পেতেন তা, যে বাস্তবক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে মানসিক ঘটনাটি ঘটছে সেক্ষেত্রে তিনি যা দেখতেন, ঠিক তার মতই হবে। যে একটিমাত্র জিনিস বাদ পড়ল, তা হচ্ছে মানসিক ঘটনা। এবং যেহেতু সেগুলো গোপনীয় ও অদৃশ্য, তাদের অনুপস্থিতি কখনোই দৃষ্টিগোচর হবে না। সুতরাং, আমরা এমনকিছু কল্পনা করছি না যা মোটের উপর আপাতবিরোধী।

যদি আমরা সিদ্ধান্ত নিই যে উপঘটনাবাদ সঠিক, তা হলে কি এ জাতীয় কথা বলা আমাদের বন্ধ করতে হবে--যেমন, "ব্যথা তাকে চীৎকার করতে বাধ্য করেছিল" অথবা "ব্যথা থেকে সে চীৎকার করেছিল"---যে উক্তিগুলো প্রত্যক্ষভাবে পারস্পরিক ক্রিয়ামূলক বলে মনে হয়? তর্ক করা যেতে পারে যে, আমরা সত্যতার সাথেই এ জাতীয় কথা বলে যেতে পারতাম, আমরা যদি মনে করতাম যে, এ গুলোর অর্থ "সে চীৎকার করে উঠল"-এর মত তত্ত্বগতভাবে অপেক্ষাকৃত নিরপেক্ষ উক্তির অর্থ থেকে অভিন্ন। এ সত্ত্বেও, একজন সহানুভূতিসম্পন্ন লোক এই বলে তর্ক করতে পারেন যে, যদিও আমরা সূর্য যে পৃথিবীর চারিদিকে প্রদক্ষিণ করে টলেমির এই মতবাদকে এখন আর গ্রহণ করি না, তথাপি আমরা বলি "সন্ধ্যা ছটায় সূর্য অস্ত গিয়াছে"। কেননা, "সন্ধ্যা ছটায় সূর্য অস্ত গিয়াছে" উক্তিটি জ্যোতিঃশাস্ত্রীয় মতবাদগুলোর দিক থেকে সত্যিকারভাবে 'নিরপেক্ষ'; দৃষ্টি সীমা থেকে সূর্যের অদৃশ্য হওয়াকেই এই উক্তিটি কেবল বর্ণনা করছে, এবং পৃথিবী ও সূর্যের আপেক্ষিক গতি অথবা স্বীয় অক্ষ রেখার উপর পৃথিবীর আবর্তনীয় গতির মাধ্যমে ওই অদৃশ্য হওয়ার ব্যাখ্যা সম্বন্ধে এটি কাউকে কিছু বলতে বাধ্য করে না। কিন্তু "যন্ত্রণা তাকে চীৎকার করতে বাধ্য করেছিল" উক্তিটির মধ্যে এ রকমের নিরপেক্ষতা নেই। এই উক্তি প্রকাশ্যভাবে এবং স্পষ্টভাবে বলছে যে, ওই অনুভূতিটিই আচরণের কারণ। এবং উপঘনাবাদ যদি সঠিক বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে সাধারণ ভাষার এই উক্তিটি হচ্ছে একেবারেই মিথ্যা; সাধারণ মানুষ এই উক্তিটি ব্যবহার করে যেতে পারে, তবে সেটা করা সর্বদাই তাদের পক্ষে ভ্রান্তিজনক হবে।

মনোদৈহিক পারস্পরিক ক্রিয়াবাদ

উপঘটনাবাদকে তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী পারস্পরিক ক্রিয়াদবাদের সাথে কিভাবে তুলনা করা যায়? পারস্পরিক ক্রিয়াবাদ উপঘটনাবাদের সাথে এ ধারণায় একই মতাবলম্বী যে, দৈহিক ঘটনার মানসিক ফলাফল থাকতে পারে, কিন্তু উপঘটনাবাদকে ছাড়িয়ে গিয়ে অতিরিক্ত এমতও পোষণ করে যে, 'মানসিক ঘটনার দৈহিক ফলাফল থাকতে পারে'। এভাবে পারস্পরিক ক্রিয়াবাদী এ অধ্যায়ের শুরুতে দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখিত প্রতীয়মান ঘটনাগুলোকে বাস্তব ঘটনা বলে গ্রহণ করে; সেইসূত্রে এই মতবাদ সাধারণ মানুষের সাধারণ বুদ্ধিজাত মতামতের সবচেয়ে নিকটে এসে পড়ে এবং তা এই মতবাদের পক্ষেও নয়, বিপক্ষেও নয়; কিন্তু আমরা দেখেছি যে এসব "ঘটনা", যা পারস্পরিক ক্রিয়াবাদকে প্রতিষ্ঠিত করে বলে মনে হয় সেগুলোকে প্রকৃতপক্ষে উপঘটনাবাদী অথবা পারস্পরিক ক্রিয়াবাদী ধারায় ব্যাখ্যা করা সম্ভব।

এ মতবাদ দুটির মধ্যে কোন্‌টি সমর্থনযোগ্য, সেই সিদ্ধান্তের প্রচেষ্টায় এই চূড়ান্ত প্রশ্নটির সমাধান করতে হচ্ছে যে, মানসিক ঘটনার কোন ফলাফল আছে কি না। এখন এ প্রশ্নটির উত্তরের প্রচেষ্টায় একটা অসুবিধা দেখা দেয়; কিন্তু যখন আমরা 'দৈহিক' ঘটনার মানসিক ফলাফল থাকতে পারে কিনা তা নির্ধারণ করার প্রচেষ্টা করি তখন তা দেখা দেয় না। পরীক্ষণের সাহায্যে আমরা একচেটিয়াভাবে একটি দৈহিক পরিবর্তনের সৃষ্টি করতে পারি এবং দেখতে পারি এর মানসিক ফলাফল আছে কিনা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আমরা একটা ঘন্টা বাজাতে পারি, এবং স্থির করতে পারি যে ঘন্টা বাজানো একজন লোকের দেহের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং পরে সেই মানসিক ঘটনার সৃষ্টি করে যা ব্যক্তির ঘন্টা-শ্রবণে পরিণত হয়। আমরা নিঃসন্দেহভাবে দেখাতে পারি যে ভৌত দৈহিক ফলাফল এবং মানসিক ফলাফল, উভয়ই ঘন্টা বাজানোর ভৌত ঘটনা দ্বারা সংঘটিত হয়েছে এবং এভাবে আমরা পরীক্ষণের সাহায্যে চূড়ান্তভাবে দৈহিক ঘটনার মানসিক ফলাফল আছে কি না এই প্রশ্নটির উত্তর দিতে পারি। কিন্তু মানসিক ঘটনা কারণ হতে পারে কিনা এবং তাদের ফলাফল থাকতে পারে কিনা, তা নির্ধারণ করা অপেক্ষাকৃত দুরূহ! এটা সহজ হত যদি আমরা একচেটিয়াভাবে কোন মানসিক পরিবর্তন সৃষ্টি করতে পারতাম, এবং এর ফলাফল আছে কিনা তা দেখতে পেতাম; যদি এই একচেটিয়া মানসিক পরিবর্তনের পর এমনসব ঘটনা ঘটত

যেগুলোকে কেবল ওই মানসিক পরিবর্তনের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, তাহলে এ তথ্য দেখাতে সক্ষম হত যে মানসিক ঘটনাগুলোও কারণ হতে পারে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা এরূপ একটি পরীক্ষণমূলক অবস্থা তৈরী করতে পারি না, যেখানে এটা সুস্পষ্ট যে আমরা একচেটিয়াভাবে একটি মানসিক পরিবর্তন সৃষ্টি করেছি। কেবল যেসব মানসিক ঘটনা আমরা পরীক্ষণের সাহায্যে নিজের আয়ত্তে আনতে পারি সেগুলো কেবল সেইসব প্রাণীর জীবনে ঘটে যাদের জটিল এবং সর্বক্ষণ সক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র রয়েছে। স্নায়ুতন্ত্রের অসংখ্য সহগামী দৈহিক পরিবর্তন যে-কোন মানসিক পরিবর্তনের সাথে একসঙ্গে ঘটবে। সুতরাং, অন্য কোন ঘটনা যদিও কোন মানসিক পরিবর্তনের পরে ঘটে, তবুও উপঘটনাবাদী সর্বদাই একথা বলার অবকাশ পাবেন যে, পরবর্তী ঘটনাটি মানসিক ঘটনার দ্বারা সৃষ্ট না হয়ে বরং ওই মানসিক ঘটনার সহগামী কোন 'দৈহিক' ঘটনা দ্বারা উৎপাদিত হয়েছিল। যেমন, মনে করুন আমরা যন্ত্রণার চেতনা সৃষ্টি করি, যার পরে দেহ-সংকোচন ঘটে ; এটা কিভাবে জানা যাবে যে, ব্যথার চেতনার সহগামী মস্তিষ্কবর্তী ঘটনা নয়, এবং ব্যথা-অনুভূতির 'মানসিক' ঘটনাটি সংকোচনের সৃষ্টি করেছে ?

একথা বলার অর্থ এই নয় যে, আমরা হয়ত কখনোই বিষয়টির নিষ্পত্তি করতে পারব না। ভবিষ্যতে কোন সময়ে যখন আমরা মস্তিষ্ক সম্পর্কে এখন যা জানি তার চেয়ে আরও বেশী জানব, তখন আমরা মানসিক ঘটনা অথবা কোন সহগামী মস্তিষ্কবর্তী ঘটনা কারণ ছিল না কিনা তা নির্ধারণ করতে সক্ষম হব। নিম্নোক্ত ঘটনাটি বিবেচনা করে দেখা যাক ঃ আমি অংকের একটি কঠিন সমস্যা সমাধানের চিন্তা করছি এবং হঠাৎ সমাধানটি আমার মনে উদিত হল (একটি মানসিক ঘটনা)। তাপপর আমি সমাধানটি লিখতে শুরু করি (একটি দৈহিক ঘটনা)। মনে করুন এমন ঘটল যে, যখন আমি সমস্যা সমাধান নিয়ে চিন্তিত, তখন আমার মস্তিষ্কটি রয়েছে একটি অনির্দিষ্ট অবস্থায়---যেন এক অলসাবস্থায়---যার ফলে তার বর্তমান অবস্থা থেকে কোন ভবিষ্যৎ অবস্থা পূর্বানুমান করা সম্ভব নয়। এবার সমাধানটি আমার মনে উদিত হল। এর পর মস্তিষ্ক ওই অবস্থায় পৌঁছল, যে অবস্থা থেকে সমাধানটি লেখার পেশীগত কার্য উৎপন্ন হল। যদি এরূপ ঘটার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে এমন চিন্তা করা যুক্তিযুক্ত হবে যে মানসিক ঘটনাটি দৈহিক ঘটনাকে ঘটিয়েছিল। এমন অবস্থায় পারস্পরিক ক্রিয়া প্রমাণিত

হবে। অবশ্য, উপঘটনাবাদী এই বলে বহুকাল পর্যন্ত প্রতিরোধ চালাতে পারতেন যে, প্রকৃতপক্ষে মস্তিষ্ক কোন অনির্দিষ্ট অবস্থায় ছিল না এবং যদি আমরা আরেকটু সময় ধরে অনুসন্ধান করতাম, তা হলে আমরা সেই মস্তিষ্কবর্তী ঘটনাগুলোকে আবিষ্কার করতে সক্ষম হতাম যেগুলো পরবর্তীকালীন দৈহিক ঘটনাগুলোকে সংঘটিত করেছিল। কালক্রমে দেখানো যাবে যে, এ মত একেবারে যুক্তিহীন।

কিন্তু এরূপ ভবিষ্যৎ আবিষ্কার যে প্রকৃতপক্ষে ঘটবেই তা বিশ্বাস করার কোন কারণ নেই। মস্তিষ্কের কার্যাবলী সম্পর্কে এ পর্যন্ত আমাদের জ্ঞান এত অপর্যাপ্ত যে, কোন পক্ষ সমাধানের মত বিন্দুমাত্র তথ্যও আমাদের জানা নেই। স্নায়ু-শারীর বিদ্যায় ভবিষ্যৎ উন্নতির অগ্রগতির জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।

পরবর্তী জীবন

এখানে একটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন হচ্ছে, দেহের মৃত্যুপর ব্যক্তির চেতনাশীল জীবনের অশরীরী কোন অবিচ্ছিন্ন অস্তিত্ব থাকে কি না। কোন দেহ ছাড়া একটি চেতনার ক্ষেত্রে বিরামহীন মানসিক ঘটনা বজায় থাকাতে বোঝা যাবে যে, মানসিক ঘটনা কেবল দৈহিক প্রক্রিয়া সমূহের একটি উপজাত নয়। এমত উপঘটনাবাদকে খণ্ডন করবে, তবে তা পারস্পরিক ক্রিয়াবাদকে প্রতিষ্ঠিত করবে না; তবুও আমাদের এই প্রমাণের প্রয়োজন হবে যে, এই অশরীরী চেতনা দৈহিক প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে। অশরীরী আকারেও যদি একটি দৈহিক প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে না পারে, তা হলে চেতনার অবস্থা এমন এক বজরার (barge) মত হবে যা আর কিছুই করতে পারে না, কিন্তু কেবল এর শক্ত দড়িটাকে (tug) অনুসরণ করে, এবং যখন গুণের রজ্জুটি (the tow line) ছিঁড়ে যায়, তখন অকস্মাৎ কোন স্রোতের টানে অসহায়ের মত কেবল তা আন্দোলিত হতে পারে। এবং যদি এই অশরীরী চেতনা ভৌত জগতকে প্রভাবিত করতেও পারত, তথাপি কেবল তার দেহ-মনের পারস্পরিক ক্রিয়া প্রমাণিত হত না; কারণ এমন হতে পারত যে, চেতনা 'কেবল' একটি অশরীরী অবস্থায় দৈহিক প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে, কিন্তু যখন ব্যক্তিটির দেহ থাকে তখন তা করে না। তবুও, এরূপ অশরীরী কারণিক শক্তি যদি থাকত, তা হলে তা দেহ-মনের পারস্পরিক ক্রিয়াবাদের প্রকল্পকে আরও অধিক সম্ভাব্য করে তুলতো। (এটা লক্ষ্য করা উচিত হবে

যে, এ দুটি মতবাদের মধ্যকার বিতর্কে দেহান্তর-প্রাপ্তির ঘটনা, একটি দেহ থেকে অন্য দেহে কোন চেতনার গমন, সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক; এটা এগুলোর যে-কোনটির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।)

দেহের মৃত্যুর পর কোন চেতনার এরূপ বেঁচে থাকা নিশ্চয়ই কল্পনাসাধ্য, অন্ততঃ নিজের ক্ষেত্রে। আমি হঠাৎ আমার বুকে একটা তীব্র ব্যথা অনুভব করি, আমি নিজেই অনুভব করছি যেন আমি পড়ে যাচ্ছি, এবং সব কিছুই যেন অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে। এবং তারপর আমি এরূপ দেখছি মনে হয়ঃ লোকজন একটি দেহের উপর ঝুঁকে পড়েছ, যাকে মনে হচ্ছে আমারই দেহ, একজন ডাক্তার নাড়ী পরীক্ষা করছেন, এ্যাম্বুলেন্স এল, ডাক্তার বলেন যে অনেক দেরী হয়ে গিয়েছে এবং আমার দেহটি সরিয়ে নেয়া হল। আমার দেহ বলে আর কিছুই দেখছি না; উদাহরণস্বরূপ, আমি সোজাসুজি একটি আয়নার দিকে যেন তাকাচ্ছি, কিন্তু আদৌ কোন মানুষের শরীর দেখতে পাচ্ছি না। পরে আমি একটি অন্ত্যেষ্ঠিক্রিয়া দেখছি; শুনছি যে, লোকজন আমার সম্পর্কে সহানুভূতিসূচক কথা বলছে, তাদেরকে কাঁদতে দেখছি। এই পুরো সময়টাতে আমার চিন্তা, ইন্দ্রিয়-বোধ অনুভূতি সবই রয়েছে। আমার চেতনা বজায় রয়েছে; কিন্তু আমার কোন দেহ নেই। এমন ঘটনা নিশ্চয়ই বোধগম্য।

কিন্তু এরূপ ব্যাপার কল্পনীয় হলেও, অশরীরী অস্তিত্ব কখনো ঘটেছে এরূপ চিন্তা করার কোন যুক্তি আছে কি? অবশ্য, ব্যক্তিগত দিক থেকে এ প্রশ্নটা সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ এবং চিন্তনীয় অন্য যে-কোন প্রশ্নের চেয়ে এ নিয়ে কম আলোচনা হয়নি। একভাবে নয়তো অন্যভাবে মানুষের মনে এ সম্পর্কে প্রবল ভাবাবেগ রয়েছে। কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে, প্রকল্পটির প্রকৃতিগত কারণেই এর পক্ষে বা বিপক্ষে উপযুক্ত প্রমাণ পাওয়া প্রায় অসম্ভব ব্যাপার।

অশরীরী অস্তিত্বের সপক্ষে কি প্রমাণ রয়েছে? যারা আপাতদৃষ্টিতে মারা গিয়েছেন তেমন মানুষের কাছ থেকে পাওয়া বার্তাসমূহের বহু বিবরণ রয়েছে, এমন তথ্য সম্বলিত বার্তা যা সম্ভবতঃ কেবল "মৃত" ব্যক্তিটিই জানত। দুর্ভাগ্যবশত "মৃত" ব্যক্তিটি যে এখনও অশরীরী অবস্থায় কোন আকারে অস্তিত্ববান সে ব্যাখ্যার চেয়ে এ ধরনের ব্যাপারগুলোর জন্য সর্বদাই অন্যান্য ব্যাখ্যা সম্ভব। বৈজ্ঞানিকভাবে নিয়ন্ত্রিত এমন কোন পরীক্ষণ-কার্য কখনো করা হয় নি, যার ফলাফল বিশ্বাস উৎপাদনের ক্ষমতা রাখে। এ পরীক্ষাকে সেই বিখ্যাত ঐন্দ্রজালিক এবং পলায়ন-শিল্পী (escape artist) হুদিনির

(Houdini) পরীক্ষার মত হতে হবে, যিনি এক বন্ধুর সঙ্গে বন্দোবস্ত করেছিলেন যে সে একটি পূর্ব পরিকল্পিত বার্তা পাওয়ার জন্য প্রতি মৃত্যু বার্ষিকীর দিন তাঁর সমাধি দর্শনে যাবেন। নিষ্ফল পঁচিশটি বছর পর তাঁর বন্ধু অবশেষে প্রতি মৃত্যুবার্ষিকীতে হুদিনিরসমাধি দর্শনের অভ্যাস ছেড়ে দিলেন। যদি এভাবে সংবাদ আসত তাহলে তার থেকে চেতনার অস্তিত্বের সপক্ষে কিছুটা প্রাসঙ্গিক প্রমাণ পাওয়া যেত। তবে, অশরীরী অস্তিত্বের বিরুদ্ধে কি প্রমাণ রয়েছে? আমরা জানি যে অনেক মানসিক ঘটনা মস্তিষ্ক বিকৃতির দ্বারা প্রতিকূলভাবে প্রভাবিত হয় এবং বিকৃতি যতই অধিক হয় ফলাফলও তত খারাপ হয়। অভিক্ষেপের মাধ্যমে (by extrapolation) এমনটি বেশ আশা করা যায় যে, যখন শরীরী মৃত্যুতে মস্তিষ্ক-কার্যের সম্পূর্ণ অবসান ঘটে, তখন মানসিক কার্যেরও সম্পূর্ণ অবসান ঘটে। মৃত্যুর পরবর্তী অস্তিত্বের প্রকল্পকে সমর্থন করে কোন কোন দার্শনিক এমন যুক্তি দেন যে, মস্তিষ্কের এমন বিকৃতাবস্থা মানসিক প্রক্রিয়ার নিজস্ব কোন অবনতি নাও ঘটাতে পারে; এর ফলে কেবল অসুস্থরোগীর ক্ষেত্রে তার নিজস্ব মানসিক ঘটনাবলী অন্যের গোচরীভূত করার ক্ষমতা হ্রাস পায়। কিন্তু এরূপ সমর্থন-প্রচেষ্টা কোন কাজে লাগবে না। এমনসব ঘটনা আছে যেখানে মস্তিষ্কের অবস্থার উন্নতি হয়েছে, এবং এরূপ রোগীদের সাক্ষ্য এই দাবী সমর্থন করে না যে, কেবল মানসিক ঘটনাবলী অন্যকে জানাবার ক্ষমতাই হ্রাস পেয়েছিল।

কিন্তু অভিক্ষেপের যুক্তির পক্ষে দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, এ ব্যাপারে অভিক্ষেপণ যুক্তিযুক্ত ছিল না; এটা সম্ভব যে মৃত্যুর পর চেতনা সহসা দৈহিক নির্ভরতা থেকে "মুক্ত" হয় এবং আবার পূর্ণভাবে কাজ করতে শুরু করে। সুতরাং, যুক্তিটি কিছুতেই চূড়ান্ত নয়। তবুও অভিক্ষেপণ সাধারণভাবে একটি সঙ্গত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি এবং একথা চিন্তা করার কোনই কারণ নেই যে তা এখানে অযৌক্তিক। সুতরাং, যদিও সমস্যাটি এখনও অমীমাংসিত তবু বর্তমানে প্রমাণের গুরুভার মৃত্যু পরবর্তী অস্তিত্বের প্রকল্পের বিরুদ্ধে যায় বলে মনে হয়। অধিকন্তু, মৃত্যু পরবর্তী অস্তিত্বের বিরুদ্ধে এক ধরনের নেতিবাচক প্রমাণও রয়েছে। যদি এরূপ কোন জিনিস থাকত, তবে কি এটা সম্ভব হত না যে, এর সপক্ষে যে প্রমাণ রয়েছে তার চেয়ে অধিকতর নিশ্চিত প্রমাণ থাকত? এই অশরীরী জীবিতদের কাছ থেকে সংবাদ হিসাবে আরও বেশী কিছু কি আমরা আশা করতাম না? এ জাতীয় প্রমাণের অভাব কি এরূপ চিন্তা করার পক্ষে অতিরিক্ত যুক্তি নয় যে, মৃত্যু পরবর্তী অস্তিত্ব নেই,

অথবা, অন্ততঃপক্ষে, যদি এটা থাকে, তথাপি ভৌত জগতকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা তার নেই? সুতরাং, খুব চূড়ান্তভাবে না হলেও, দেহের মৃত্যুর পরবর্তী অস্তিত্বের প্রকল্পকে প্রত্যাখ্যান করার পক্ষে এখানে আমরা অতিরিক্ত কিছু যুক্তি পাচ্ছি।

অধি-মনোবৈজ্ঞানিক ঘটনা

কিছু কিছু দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক গবেষকসহ অনেকে রয়েছেন যাঁরা এমন এক প্রকার ঘটনার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন যা পারস্পরিক ক্রিয়াবাদের অনুকূলে এবং উপথঘটনাবাদের বিপক্ষে যায়। এরূপ ঘটনাকে অধি-মনোবৈজ্ঞানিক ঘটনা (parapsychological phenomena) বলা হয় এবং সেগুলো সেইসব লোকের গবেষণার বিষয় যাঁরা নিজেদের অধিমনোবৈজ্ঞানিক (paraysychologists) বলেন।

মানসিক টেলিপ্যাথি (mental telepathy) হবে এই ধরনের ঘটনার একটি উদাহরণ। এ হচ্ছে কোন মধ্যবর্তী দৈহিক পারস্পরিক ক্রিয়া ব্যতিরেকে এক মন থেকে অন্য মনের কোন চিন্তার প্রত্যক্ষ যোগাযোগের একটা ঘটনা। এর একটি বিশেষ পরীক্ষণমূলক অবস্থা হবে নিম্নরূপ ঃ একজন "প্রেরক" একটির পর একটি খেলার তাসের কোন অনুক্রমের উপর মনোযোগ নিবদ্ধ করে, এবং অন্য একটি দেশে থেকেও একজন "প্রাপক" অনুক্রমটি কি তা বলার চেষ্টা করেন। মধ্যবর্তী দূরত্ব এবং আচ্ছাদনের কৌশল (shielding devices) যতদূর সম্ভব এমনভাবে পরিবর্তিত করা হয় যেন দুটি দেহের মধ্যে যে-কোন দৈহিক পারস্পরিক ক্রিয়াকে বাদ দেয়া যায়। এখন মনে করুন যে, দৈবক্রমে যেসব সঠিক উত্তর পাওয়া যাবে তার চেয়ে বেশী আনুপাতিক হারে বেশী সংখ্যক উত্তর "প্রাপক" পেলেন। তখন এমন ধারনা করা আপাতদৃষ্টিতে যুক্তিযুক্ত বলে মনে হবে যে, দুটির মধ্যে কোন কারণিক সম্পর্ক রয়েছে। যদি দৈবিক ফলাফলের চেয়ে ভাল ফলাফল দূরত্বের পরিবর্তন অথবা আচ্ছাদনের কৌশল দ্বারা প্রভাবিত না হয়, তা হলে এমন ধারণা করা আপাতদৃষ্টিতে যুক্তিযুক্ত হবে যে, কার্য-কারণ সম্পর্কটি কোন দৈহিক কিছুর মাধ্যমে সংঘটিত না হয়ে বরং প্রত্যক্ষভাবেই মন দুটির মধ্যে সংঘটিত হচ্ছে এরূপ ঘটনা উপঘটনাবাদীর বিপক্ষে যাবে, যিনি মনে করেন যে মানসিক ঘটনার কোন ফলাফল থাকতে পারে না।

আর একটি উদাহরণ হবে মনঃসঞ্চলন (psychokinesis), যার

অর্থ হচ্ছে মানসিক প্রক্রিয়া কর্তৃক দৈহিক প্রক্রিয়া প্রভাবিত হওয়া। এর একটি বিশেষ পরীক্ষণমূলক অবস্থা হবে নিম্নোক্তরূপঃ আমরা হাজার হাজার ঘুঁটি (dice) নিক্ষেপ করি; ধরা যাক যে, একদল ব্যক্তি সংখ্যা ছয়-এর উপর তাদের মনোযোগ নিবিষ্ট করল। আমরা আবার দেহের এবং ঘুঁটির ভেতরকার দৈহিক পারস্পরিক ক্রিয়ার সম্ভাবনাকে এড়ানোর জন্য এ দুইয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব এবং আচ্ছাদনের কৌশলের পরিবর্তন ঘটাই। মনে করা যাক, যেমনটা দৈবক্রমে পাওয়া সম্ভব তার চেয়ে অধিক বার সংখ্যা ছয় আমরা পেলাম। এখন এমন ধারণা করা আপাতদৃষ্টিতে যুক্তিযুক্ত মনে হয় যে, মনোনিবেশের মানসিক ঘটনার প্রভাব ঘুঁটি নিক্ষেপণের ভৌত ব্যাপারের উপর পড়ছে। এতে পারস্পরিক ক্রিয়াবাদ প্রতিষ্ঠিত হবে।

উপঘটনাবাদের একজন অনুরক্ত সমর্থকের পক্ষে এ দাবীর পথ খোলাই থাকবে যে, পারস্পরিক ক্রিয়াটা বাস্তবিকই একটা দৈহিক ব্যাপার ছিল, তবে এর মধ্যে এমন কোন প্রকারের অজ্ঞাত বল বা শক্তি জড়িত ছিল যা দূরত্বের ব্যাপারে অপরিবর্তিত ছিল এবং সকল প্রকার জ্ঞাত আচ্ছাদনকে অন্তর্ভেদ করেছিল। কিন্তু সেটা হবে একটা বেপরোয়া যুক্তি। কারণ এরূপ একটা "শক্তি"র কথা আধুনিক পদার্থিক নিয়মাবলীর অন্তর্গত যে-কোন ধারণার এত বিপরীত হবে যে. তাকে কোন ভৌত বিষয় বলা কঠিন। এবং যদি একে আমরা "ভৌত" বলতাম, তাহলে তা উপঘটনাবাদের বিজয় সম্পর্কে কেবল একটা মিথ্যা আভাস দিত, কেননা "ভৌত" কথাটি তখন নিজের মধ্যে দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন শ্রেণীর ঘটনাকে অন্তর্ভুক্ত করত এবং তাদের সম্পর্কের দ্বৈততামূলক প্রশ্নটি তখনও আমাদের জন্য থেকেই যেত। সুতরাং, এই মূলতঃ বাচনিক কৌশল থেকে কিছু লাভ হল না।

মানসিক টেলিপ্যাথি এবং মনঃসঞ্চলন প্রকৃতপক্ষে ঘটবেই, এরূপ চিন্তা করার কোন কারণ আছে কি? অধিকাংশ বিজ্ঞানীই এরূপ চিন্তা করেন না, কিন্তু একথা বলা উচিত হবে যে তাদের মধ্যে খুব অল্প সংখ্যকই প্রকৃতপক্ষে বিস্তারিতভাবে পরীক্ষণমূলক প্রমাণের প্রশ্নটি বিবেচনা করেছেন। অধিকাংশের মতেই এ হচ্ছে যুক্তিহীনভাবে গৃহীত একটি কুসংস্কার, অর্থাৎ মানসিক টেলিপ্যাথি অথবা মনঃসঞ্চলন নামে কোন ঘটনা হতে পারে না। এই বিজ্ঞানীদের মধ্যে যাঁরা সতর্কতার সাথে বিষয়টির মধ্যে প্রবেশ করেছেন তাঁদের কেউ কেউ এমন চিন্তা করেন যে, এখানে কিছু একটা ব্যাপার আছে, কেউ কেউ আবার তেমন চিন্তা করেন না। অধিক বললে এটুকুই বলা যেতে

পারে, এরূপ ঘটনা যে ঘটে থাকে কেউ এ পর্যন্ত চূড়ান্তভাবে তা দেখাতে সক্ষম হন নি। সুতরাং, উপঘটনাবাদ এবং পারস্পরিক ক্রিয়াবাদের মধ্যে বিচারের প্রচেষ্টায় আমরা এখানে সাহায্যের প্রত্যাশা করতে পারি না।

অবশ্য, অন্যান্য অধি-মনোবৈজ্ঞানিক ঘটনার আলোচনাও এখানে প্রাসঙ্গিক হবে। মৃত আত্মার বার্তা, শব্দকারী ভৌত ঘটনা, ফলোৎপাদক প্রার্থনা, অজ্ঞাত জিনিস সম্পর্কে ভবিষ্যৎ বাণী করে তেমন স্বপ্ন, ভবিষ্যৎ বা অতীত সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টি, এ সবই পারস্পরিক ক্রিয়াবাদী মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করার পক্ষে যেতে পারে। কিন্তু এসব ঘটনার কথিত উদাহরণে নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষা এবং বস্তুনিষ্ঠ প্রত্যক্ষণের অভাব টেলিপ্যাথি অথবা মনঃসঞ্চলনের চেয়েও এখানে তাকে (পারস্পরিক ক্রিয়াবাদকে) অধিক দুর্বল করে ফেলছে। হতে পারে যথার্থই কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এখানে ঘটেছে, কিন্তু গল্প-কাহিনী ও লোক-গাঁথা এর পক্ষে যথার্থ প্রমাণ প্রদানে বেশীদূর অগ্রসর হতে সক্ষম নয়।

যদি আমরা সমকালীন স্নায়ু-শারীর বিজ্ঞান অথবা অধি-মনোবিজ্ঞানের নিকট সাহায্যের প্রত্যাশা করতে না পারি, তাহলে উপঘটনাবাদ ও পারস্পরিক ক্রিয়াবাদ সম্পর্কে আমাদেরকে কি সম্পূর্ণরূপে নীরব থাকতে হবে? আমি মনে করি, এমন একটি পরোক্ষ বিচার-বিবেচনার বিষয়ও আছে যার, উপঘটনাবাদের দিকে এর পাল্লা ভারী করার ব্যাপারে, গুরুত্ব রয়েছে। আমাদের এই বিশ্বাসের অতি উত্তম যুক্তি রয়েছে যে, মস্তিষ্কবর্তী ঘটনাগুলোর নিজেদেরই পরবর্তী মস্তিষ্কবর্তী ঘটনা ও মানসিক ঘটনা এ উভয়ের উপরই কারণিক ফলাফল রয়েছে, এবং তা দেখানোর ব্যাপারে আমরা নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষণের সৃষ্টি করতে পারি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আমরা জানি যে মস্তিষ্কের উত্তেজনা পরবর্তী মানসিক ঘটনা এবং পরবর্তী মস্তিষ্কবর্তী ঘটনা সৃষ্টি করতে পারে। এ পর্যন্ত, স্নায়ু-শারীরবিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির অর্থ দাঁড়িয়েছে অধিক থেকে অধিকতর পরিমাণে এমনসব দৃষ্টান্ত উদঘাটন করা যেগুলোতে মস্তিষ্কবর্তী ঘটনা হল কারণ। এবং আমাদের এই বিশ্বাসের যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে, ওই ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ ক্রমোন্নতি এ ধারার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হবে, যার ফলে আমরা পরিশেষে অভিক্ষেপের মাধ্যমে ধরে নিতে পারব যে, সব মস্তিষ্কবর্তী ঘটনা এবং সহগামী মানসিক ঘটনা মস্তিষ্কবর্তী ঘটনার মাধ্যমে ব্যাখ্যাসাধ্য হবে। অপরপক্ষে, এটা দেখানোর কোন পরীক্ষণমূলক প্রমাণ নেই যে, 'মানসিক' ঘটনাবলী নিজেরাই অন্যান্য মানসিক ঘটনা অথবা মস্তিষ্কবর্তী ঘটনাকে প্রভাবিত করে, এবং আমাদের এই চিন্তার কোন কারণ নেই যে

ভবিষ্যৎ ক্রমোন্নতি এরূপ প্রমাণ দিতে পারবে। বোধ হয় একথা বিশ্বাস করাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত হবে যে, কার্য-কারণের মৌলিকভাবে নতুন ধরনের কোন কর্তা যে আবিষ্কৃত হবে এবং পরীক্ষণমূলক ভাবে সত্য বলে প্রমাণিত হবে, সেই বিশ্বাসের চেয়ে বৈজ্ঞানিক ক্রমোন্নতি সে-দিকেই চলতে থাকবে যেদিকে তা অতীতে চালিত হয়েছে। এবং এর অর্থ এই যে, একটি আপাত-ভিত্তিহীন মানসিক কার্য-কারণের সম্পূর্ণ প্রমাণহীন স্বীকার্যের উপর প্রতিষ্ঠিত পারস্পরিক ক্রিয়াবাদের উপর বিশ্বাস স্থাপনের চেয়ে উপঘটনাবাদকে গ্রহণ করাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত।

৫

কাজ

বনে একটি লোক জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করছে। তার চারপাশেই বনে ছড়িয়ে আছে কাঠের অনেক টুকরো। কাঠের ওই টুকরোগুলো কিভাবে সেখানে জড়ো হয়েছিল তার পূর্ণ বিবরণ দিতে গেলে জানতে হবে নীহারিকা কিভাবে তৈরী হয়েছিল, কিভাবে পৃথিবী শীতল হল, কিভাবে গাছপালার জন্ম হল, কিভাবে বাতাসে বীজ ভেসে বেড়ায় এবং কিভাবে বন্যার পানি প্রবাহিত হয়। প্রকৃতির প্রকিয়াসমূহ নিরপেক্ষ এবং সুসংগতভাবে প্রাকৃতিক বস্তুর উৎপাদন ও বন্টনে নানারকম পরিবর্তন সাধন করে চলছে। কিন্তু এখানে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে-থাকা কাঠের এই কিছু সংখ্যক টুকরোর একটি বিশেষ পরিণতি ঘটবে। লোকটি সেগুলোকে বেছে আলাদা করবে, এবং সে ইচ্ছা-কৃতভাবেই তার পূর্ব-পরিকল্পনা কার্যকর করার জন্য সেগুলোকে এমন এক জায়গায় নিয়ে যাবে যেখানে সেগুলো আগে কখনো ছিল না। এই লোকটি তার কাজের মাধ্যমে প্রকৃতিতে হস্তক্ষেপ করেছে: "কাজের দ্বারা আমরা অপরিবর্তনীয়রূপেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অবস্থার পরিবর্তন ঘটাই; এতে এমন একটি রূপের বা অবয়বের উদ্ভব হয় যা পূর্বে সেখানে ছিল না, এবং এই রূপের বা অবয়বের অস্তিত্ব কোনভাবেই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের পূর্ববর্তী ভৌত অবস্থা (physical state) থেকে উদ্ভূত বলে মনে হয় না। এটাই হল সৃষ্টি (creation)।[১] কিন্তু আমরা যদি নিজেদের প্রশ্ন করি, এই "সৃষ্টি" কি, কাজ (action) কাকে বলে, তা হলে এসবের উত্তর দেয়া সহজে হয় না। আমাদের সমস্যা হলঃ প্রকৃতিতে সংঘটিত অপরাপর পরিবর্তনগুলো থেকে আমাদের কাজগুলো যদি আদৌ অর্থপূর্ণভাবে ভিন্ন হয়, তবে তা কিরূপে?

শুরুতেই লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, মানুষ ও উচ্চতর প্রাণী "তাদের নিজেদের ইচ্ছায়" এক স্থান থেকে অন্যস্থানে চলাচল করতে পারে এবং অন্যান্য বস্তুকেও চালিত করতে পারে। পাথর এবং ফুল যখন একস্থান থেকে অন্যস্থানে যায় তখন তারা অন্য বস্তু দ্বারা চালিত হয়; কিন্তু মানুষ হল স্ব-চালিত (self-movers), তারা নিজেদের উদ্যোগে চলে এবং নিজেদের গতিবিধির দিক নির্দেশ করে।

---

১ Braian O'Shaughnessy, "Observation and will", *The Journal of philosophy*, ৬০তম খণ্ড, ১৪শ সংখ্যা (জুলাই ৪, ১৯৬৩), পৃঃ ৩৬৮।

কিন্তু, আমরা লক্ষ্য করি যে স্বয়ং-চালিত (self-propelled) জড়বস্তুরও অস্তিত্ব আছে—যার মধ্যে রকেট হচ্ছে একটি সাম্প্রতিক নাটকীয় উদাহরণ—এ অবস্থায় আমাদের এই দৃষ্টিভঙ্গির অবশ্যই কিছু পরিবর্তন করতে হবে। কারণ এটা স্পষ্ট যে, একটি জড়বস্তু তার নিজের গতির জন্য তার নিজের মধ্যেই শক্তি (energy) ধারণ করতে পারে এবং সম্ভবতঃ এমন কিছুও ধারণ করতে পারে যা তার গতির দিকটিকে নিয়ন্ত্রণ করে। সুতরাং, আমরা যদি একদিকে মানুষ ও অন্যান্য উচ্চতর প্রাণী এবং অন্যদিকে উদ্ভিদ ও অন্যান্য জড়বস্তুর মধ্যে পার্থক্য করতে যাই তাহলে কেবল স্বতঃচলন (self-movement) এই পৃথকীকরণের জন্য যথেষ্ট হবে না।

সম্ভবতঃ আমরা নিম্নোক্ত পার্থক্যটি দেখাতে পারি। মানুষের (এবং অন্যান্য প্রাণীর) চলাফেরা হচ্ছে প্রায়ই এমন কাজ যা কর্তা অভিপ্রায়মূলকভাবে (intentionally) সম্পন্ন করে, কিন্তু উদ্ভিদ এবং জড়বস্তু হল কেবলমাত্র কতকগুলো নিষ্ক্রিয় বস্তু যাদের উপর ক্রিয়া ঘটে থাকে। মানুষ কাজ করতে পারে এবং উদ্দেশ্যমূলকভাবে বস্তুর ক্রিয়া ঘটাতে পারে। মানুষ নিতান্তই সে-রকম বস্তু নয় যার উপরে ঘটনা ঘটে যায়। মানুষ নিজের ইচ্ছায় তার গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে; উদ্ভিদ ও জড়বস্তু তা পারে না। এমন-কি আমাদের স্বয়ংচালিত রকেটও অভিপ্রায়মূলকভাবে কাজ করতে পারে না।

অবশ্য, মানুষও কখনো কখনো নিতান্তই নিষ্ক্রিয় বস্তু যার উপরে ঘটনা ঘটে যায়, এবং এ রকম অবস্থায় মানুষ ও নিম্নতর প্রকৃতির মধ্যকার উক্ত পার্থক্য স্পষ্ট নয়। উদাহরণস্বরূপ, একটি লোক যখন কোন দালানের দশতলা থেকে নীচে পড়ে তখন আমরা ভয়ানক ভীতির সঙ্গে তা লক্ষ্য করি। যখন সে পড়তে থাকে তখন তার উপর ক্রিয়াশীল শক্তিগুলো তাকে ক্রমবর্ধমান গতিতে নীচে ফেলে। প্রাণহীন নকল মূর্তির উপর যেসব শক্তি কাজ করে এই শক্তিগুলো ঠিক সে-রকমই। পতন সম্পর্কিত ব্যাপারে মানুষ এবং নকল মূর্তির মধ্যে তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য নেই। এমনকি আমরা যদি লক্ষ্য করি লোকটি কি কারণে পড়ছে, তখনও কোন পার্থক্য দৃষ্টিগোচর না হতে পারে। এমন কোন প্রবল শক্তি লোকটিকে জানালা থেকে ঠেলে ফেলে দিয়ে থাকতে পারে যা সে প্রতিরোধ করতে পারে নি। সেই শক্তি কোন প্রাণহীন নকল মূর্তির উপর ঠিক একই রকম ক্রিয়া ঘটাত। তবে একটা পার্থক্য এখানে দেখা দিতে পারে: লোকটি হয়ত অভিপ্রায়মূলকভাবে এবং তার নিজেরই ইচ্ছায় জানালা থেকে লাফ দিয়ে থাকতে পারে, ঠিক যেমন কোন

কাজের কর্তা স্বেচ্ছায় তার কাজটি করে থাকে। এরূপ অবস্থায়, তার পতনটা এমন কিছু নয় যা তার উপর সংঘটিত হয়েছিল; এটা ছিল এমন কিছু যা সে অভিপ্রায়মূলকভাবে করেছে। স্বাভাবিকভাবেই, যখন লাফ সে দিয়ে ফেলেছে তখন তার ক্রমাগত পতনটি এমন ছিল যে তা তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে তার উপর কাজ করেছে; কিন্তু এ সত্ত্বেও জানালা থেকে লাফ দেয়ার কাজের দ্বারা সে নিজেই তার পতনটি ঘটিয়েছিল। পতন আরম্ভ হওয়ার পর যদিও সে তার পতন রোধ করতে পারে নি, তথাপি সে নিজেই এর সূত্রপাত করেছিল।

কেউ হয়ত বলতে পারেন যে, জানালা থেকে অভিপ্রায়মূলকভাবে লাফিয়ে পড়া এবং বাইরে ঠেলে দেয়ার মধ্যকার পার্থক্যের মর্ম নিহিত রয়েছে---গতির কারণ আভ্যন্তরিক না বাহ্যিক---তারই উপর। কিন্তু এটি হবে অতি সরলীকরণ (over simplification)। কারণ, মানুষের এমন অনেক গতিবিধি রয়েছে যেগুলো আভ্যন্তরিক কারণে ঘটে, কিন্তু সেগুলো যে কর্তার নিয়ন্ত্রণে ইচ্ছামূলক ও অভিপ্রায়মূলকভাবে ঘটে তা আমরা বলব না। উদাহরণস্বরূপ, হাতের কম্পন, মাংসপেশীর প্রক্ষেপণ ও মুখের পেশীর খিঁচুনি এবং মৃগী-রোগের তীব্র খিঁচুনির কথা আমরা বলতে পারি; এগুলোর আভ্যন্তরিক কারণ রয়েছে, সেই কারণগুলো ব্যক্তির উপর ক্রিয়াশীল---ব্যক্তি যা করে তার উপর ক্রিয়াশীল নয়।

অনেক দার্শনিক সমস্যার ক্ষেত্রেই দেখা যায়, যে আপাত-দৃষ্ট পার্থক্য সাধারণ বুদ্ধির কাছে স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে তা বিশ্লেষণ করাও কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। আমরা দেখতে পাব যে, অভিপ্রায়মূলক কাজের পার্থক্য কিসের দ্বারা সূচিত হয় তা নির্দেশ করা অত্যন্ত কঠিন। এমন লোকও পাওয়া যাবে যাঁরা এর মধ্যে কোন বিশেষ ব্যাপারের অস্তিত্বই স্বীকার করবেন না। দর্শনে প্রায়ই এমনটি ঘটে থাকে: যখন পার্থক্য নির্দেশ করা শক্ত হয়ে পড়ে তখন পার্থক্য যে আদৌ রয়েছে তা অস্বীকার করারই প্রবণতা দেখা দেয়। কিন্তু, একটি হাত যা ধাক্কা দেয়ার কারণে অথবা মাংস-পেশীর সংকোচনের (muscular spasm) ফলে নড়ে উঠে এবং একটি হাত যা কোন ব্যক্তি একে অভিপ্রায়মূলকভাবে নড়ানোর ফলে আন্দোলিত হয়--এই দুইয়ের ভেতর নিশ্চয়ই একটা পার্থক্য আছে বলে মনে হয়, যদিও পার্থক্যটি কোথায় সে-বিষয়ে আমরা একমত না-ও হতে পারি।

অবশ্য, যদি আমরা পার্থক্য কোথায় সে-বিষয়ে একমত হতেও পারি, তথাপি দেখা যেতে পারে যে পার্থক্যটি তেমন 'গুরুত্বপূর্ণ' নয়। এ পরিণতি

মনোদর্শনের ক্ষেত্রে বিরাট তাৎপর্য বহন করে, কারণ অভিপ্রায়মূলক কাজ করার ক্ষমতাকে মন-বিশিষ্ট প্রাণীর অন্যতম স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বলে প্রায়ই ধরা হয়। আর, যদি অভিপ্রায়মূলক কাজ এবং অভিপ্রায়হীন গতির মধ্যে কোন গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য না থাকে, তা হলে মন-বিশিষ্ট প্রাণী এবং মন-শূণ্য বস্তুর মধ্যেও সেই পরিমাণে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য থাকবে না। তদুপরি, এর মধ্যে যদি কোন গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য না থাকে, তাহলে তা নৈতিক দর্শনের ক্ষেত্রেও বিরাট প্রভাব বিস্তার করবে। আমরা উদ্ভিদ এবং নিষ্প্রাণবস্তুকে 'নৈতিক' সত্তা বলে গণ্য করি না। তাদের বেলায় আমরা একথা ভাবি না যে, তাদের কোন কোন কাজ করা 'উচিত' এবং কোন কোন কাজ থেকে বিরত থাকা উচিত, যে কাজ করা থেকে তাদের বিরত থাকা বলে 'উচিত' মনে করা হয় সেটি করলে তাদের ভুল হবে, তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদেরকে 'দায়ী' করা উচিত, এবং যদি তারা সঠিক কাজ করে তারা প্রশংসিত (praiseworthy) হবে, আর যদি তারা অনুচিত কাজ করে তবে তারা নিন্দিত (blameworthy) হবে। আমরা এভাবে কথা বলি না কারণ আমরা বিশ্বাস করি যে উদ্ভিদ ও নিষ্প্রাণ বস্তু অভিপ্রায়মূলকভাবে তাদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, এবং যখন তারা তাদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না তখন তাদের দায়ী করা চলে না এবং নৈতিকভাবে তাদের মূল্যায়ন হতে পারে না। যদি এমন হত যে, মানবীয় কাজ এবং উদ্ভিদ ও নিষ্প্রাণ বস্তুর গতির মধ্যে নৈতিকতার সঙ্গে যুক্ত কোন পার্থক্য নেই, তাহলে মানুষকেও নৈতিকভাবে দায়ী করা উচিত হত না। কারণ, ব্যক্তিকে তার কাজের জন্য নৈতিকভাবে দায়ী করতে হলে, কাজ এবং নিছক গতিবিধির মধ্যে এমন পার্থক্য অবশ্যই থাকতে হবে যার ফল হবে নৈতিক প্রত্যয়সমূহের প্রয়োগ এক ক্ষেত্রে সঙ্গত হবে এবং অপরক্ষেত্রে হবে না। সুতরাং, অভিপ্রায়মূলক ও অভিপ্রায়হীন কাজের মধ্যে পার্থক্য অনুসন্ধানের আরও একটি কারণ এখানে আমরা পাই।

আমাদের উদ্দেশ্যের প্রয়োজনে অভিপ্রায়মূলক কাজের আলোচনাকে শুধু সেসব ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ রাখা সুবিধাজনক হবে যা অপরিহার্যভাবেই দৈহিক সঞ্চলনকে অন্তর্ভুক্ত করে, যেমন, কোন জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়া। আমরা ওইসব কাজকে বিবেচনায় আনব না যেগুলোকে মানসিক বলা যেতে পারে, যেমন, কোন প্রতিচ্ছবি স্মৃতিপথে আনয়ন করা, কোন নাম স্মরণ করার চেষ্টা করা, অথবা কোন দার্শনিক সমস্যার প্রতি কারো চিন্তা নিবদ্ধ করা অর্থাৎ সেইসব কাজ যেগুলোর মধ্যে দৈহিক সঞ্চলন অবশ্যম্ভাবীরূপে

জড়িত নয় বলা যেতে পারে। এই কারণেই আমাদের আলোচনাকে আমরা দৈহিক কাজের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রাখছি যে, মনোদর্শনের সর্বাধিক জটিল সমস্যার ক্ষেত্রে---অর্থাৎ দেহ-মনের সম্পর্ক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এগুলোকে আমরা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে বিশ্বাস করি ; এ কাজগুলোই যেহেতু অন্যদের উপর সর্বাধিক প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করে সেজন্য আমরা এগুলোকে নৈতিক দর্শনের ক্ষেত্রেও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি।

অধিকন্তু, আমরা আমাদের আলোচনাকে শুধু অভিপ্রায়মূলক গতিবিধির ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ রাখব। আমরা যা করি তার অনেক কিছুই আমরা অসতর্কভাবে, অজ্ঞানে, ঘটনাক্রমে, ভাগ্যচক্রে অথবা প্রতিবর্তক্রিয়া (reflex) হিসাবে করি। একই কাজ এক বর্ণনায় অভিপ্রায়মূলক, আবার অন্য বর্ণনায় অভিপ্রায়হীন হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, আমি যখন আমার হাত উঠাই তখন আমি অভিপ্রায়মূলকভাবে আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারি, আবার বিনা অভিপ্রায়েই আমার জ্যাকেটটা ছিঁড়ে ফেলতে পারি। এই অধ্যায়ের সর্বত্রই, আমরা যখন কাজ-এর কথা উল্লেখ করব, তখন অভিপ্রায়মূলক গতিবিধির কথাই আমরা চিন্তা করব। আমাদের লক্ষ্য হবে কোন্ জিনিসটি এরূপ গতিবিধিকে অভিপ্রায়মূলক করে তা নির্ণয় করা।

কাজ সম্পর্কে কয়েকটি তত্ত্ব

বিষয়টিকে তুলে ধরার জন্য, ভিট গেন্স্টাইনের বর্তমানে চিরায়ত (classic) বলে স্বীকৃত সূত্রটিকে ব্যবহার করা যাক ঃ "এবং সমস্যাটি এই যে, আমি আমার হাত উঠাই, এই ঘটনা থেকে, আমার হাত উপরে উঠে, এই ঘটনাটি যদি বাদ দেই তাহলে কি অবশিষ্ট থাকে ?" (Philosophical Investigations, ৬২১ অনুঃ) আমার হাতের একটি দৈহিক সঞ্চলন এবং আমার হাতটি সঞ্চলনের অভিপ্রায়মূলক কাজ--এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য কি ?

বর্তমান কালের মনোযোগ আকর্ষণকারী পাঁচটি তত্ত্ব আমরা পরীক্ষা করব। (১) একটি মত হল, সেইসব সঞ্চলনই অভিপ্রায়মূলক কাজ যেগুলো বিশেষ বিশেষ ধরনের মানসিক ঘটনা বা অবস্থার দ্বারা সংঘটিত হয়। এ মতানুসারে, যা আমার হাত উঠানোর পার্থক্য নির্দেশ করে তা হল সেই ধরনের ঘটনা বা অবস্থা যা দৈহিক সঞ্চলনের পূর্বগামী এবং তার কারণ। কি ধরনের ঘটনা সেগুলো ? এ মতানুসারে সেগুলোর আদর্শ দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঃ কাজ করার পেছনে কোন হেতু থাকা, অথবা কোন সিদ্ধান্ত নেয়া, পছন্দ বা

নির্বাচন করা, অথবা কাজটি করতে কৃতসংকল্প হওয়া। (২) কর্তা-তত্ত্বানুসারে, সঞ্চলনের কারণ কোন ঘটনা নয়, কর্তা নিজেই। আমি যখন কিছু করি, তখন আমিই সঞ্চলনের সৃষ্টি করি। (৩) সম্পাদনমূলক তত্ত্বানুসারে, কোন সঞ্চলনকে অভিপ্রায়মূলক কাজ বলার অর্থ হচ্ছে ব্যাপারটা কি রকমের অথবা কি কারণে কি ঘটল তার বর্ণনা বা বিবরণ দেয়া নয়, তা হচ্ছে সঞ্চলনের জন্য কোন কর্তার উপর 'দায়িত্ব' আরোপের কাজটি সম্পাদন করা। (৪) কিছু-সংখ্যক দার্শনিক মনে করেন, যে বৈশিষ্ট্য একটি সঞ্চলনকে একটি কাজে পরিণত করে তা এই যে, সেই সঞ্চলনকে কোন লক্ষ্য নির্দেশ করে ব্যাখ্যা করতে হবে, কোন পূর্ব-অস্তিত্বশীল কারণের দ্বারা—যেমন, কোন অবস্থা, ঘটনা বা কর্তার সাহায্যে--ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই। এবং (৫) কাজের প্রসঙ্গ-মূলক বিবরণগুলোতে দাবী করা হয় যে, কোন সঞ্চলন যে অভিপ্রায়মূলক এ ধারণা সম্পর্কিত চূড়ান্ত প্রামাণিক বিষয়টি হল এই যে, তার মাধ্যমে যে সেই সঞ্চলনটিকে নিয়ম, নিরিখ অথবা প্রচলিত রীতিসমূহের (rules, norms, or practices) কোন প্রসঙ্গে চিন্তা করা বা বর্ণনা করা হয়।

এই তত্ত্বগুলো ব্যাখ্যা করার পূর্বে একথা বলে নেয়া দরকার যে, যা কাজকে স্বেচ্ছামূলক (voluntary) করে তার চেয়ে যা কাজকে অভিপ্রায়মূলক (intentional) করে তা নিয়েই এ তত্ত্বগুলো জড়িত। এ প্রত্যয়গুলো কোনক্রমেই এক নয়। একটির উদাহরণ অবশ্যই অন্যটির উদাহরণ নয়। একজন দীর্ঘকালব্যাপী মাদক দ্রব্য সেবনকারী (a long time drug addict) অভিপ্রায়-মূলকভাবেই হিরোইন (heroin) খেতে পারে, কিন্তু সে তা স্বেচ্ছায় না-খেয়ে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও খেতে পারে ; একইভাবে, কোন বন্দী নির্যাতনের মুখে অভিপ্রায়মূলকভাবেই হয়ত বলতে পারে বন্দুকগুলো কোথায় লুকানো আছে, কিন্তু স্বেচ্ছায় সে এরূপ না-ও করতে পারে। অপরপক্ষে, কোন কোন স্বেচ্ছামূলক কাজও অভিপ্রায়মূলক না হতে পারে। আপনি যদি আমাকে কোন দৃশ্য দেখাতে থাকেন এবং, আমাকে না বলে, 'ইনডিপেনডেন্স হল-এর (Indepedencc Hall) দিকে নিয়ে চলেন, তা হলে আমি স্বেচ্ছামূলকভাবে সেখানে যেতে পারি, অভিপ্রায়মূলকভাবে নয়।

অভিপ্রায়মূলক কাজ সম্পর্কিত এ তত্ত্বগুলো পরীক্ষা করার পর আমরা স্বেচ্ছামূলক কাজ সম্পর্কিত সমস্যার ক্ষেত্রে এদের তাৎপর্য বিবেচনা করব।

(১) কাজ-এর কারণ হিসাবে মানসিক ঘটনা :

সম্প্রতি জনপ্রিয়তা কমে গেলেও, আলোচ্য প্রথম তত্ত্বটি সতের শতকে

দেকার্ত কর্তৃক প্রচারিত হওয়ার পর থেকে এর অনেক সমর্থক ছিল। এ তত্ত্বটি হল, "আমি আমার হাত উঠাই, এই ঘটনা থেকে আমার হাত উপরে ওঠে, এই ঘটনাকে যদি বাদ দিই তা হলে যা অবশিষ্ট থাকে" তা হচ্ছে একটি মানসিক ঘটনার ব্যাপার যা আমার হাত উপরে উঠে যাওয়ার পূর্বগামী এবং যা এই উঠে যাওয়ার কারণ। কি ধরনের মানসিক কারণ? এটা হতে পারে আমার হাত উঠানোর কোন অভিপ্রায়, সিদ্ধান্ত, পছন্দ, প্রতিজ্ঞা বা আমার হাত উঠানোর দৃঢ়-সংকল্পতা, অথবা আমার হাত উঠানোর কোন হেতু থাকা।

নীচের উদাহরণটি লক্ষ্য করা যাক: শিক্ষক ক্লাসে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন এবং আমি কিছু চিন্তা করার পর আমার হাত উঠানোর সিদ্ধান্ত নিলাম এবং আমি প্রকৃতপক্ষে হাত উঠালাম। এ তত্ত্বানুসারে সেই চিন্তা একটা ফল (effect) সৃষ্টি করল এবং তা হল আমার হাত উঠানোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত। তাহলে ওই সিদ্ধান্তই হল আমার হাত উঠানোর কারণ, অথবা, আরও সঠিকভাবে বলা যায়, আমার হাত উপরে উঠে যাওয়ার কারণের একটি অংশ। এটা কারণের একটা 'অংশ' মাত্র, কেননা আমার হাত উপরে উঠে যাওয়ার জন্য অন্যান্য শর্তেরও প্রয়োজন; আমি আমার হাত উপরে উঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি, কিন্তু তথাপি আমার হাত উপরে উঠে যেতে ব্যর্থ হতে পারে, কারণ হাতটি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হতে পারে কিংবা আমি হঠাৎ বজ্রাঘাতে মৃত্যুবরণ করতে পারি, অথবা আমি আমার মত পরিবর্তন করতে পারি, অথবা কেউ আমার হাত চেপে ধরে তা নীচে রেখে দিতে পারে। এটা একটা 'কারণ' এজন্যে, এটা এমন একটি ঘটনা যা আমার হাত উপরে উঠে যাওয়ার পূর্বে ঘটেছে এবং যা আমার হাত পক্ষাঘাতগ্রস্ত না হওয়া ইত্যাদি অবস্থায় আমার হাত উপরে উঠে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট; সিদ্ধান্ত উপস্থিত থাকলে আমার হাত অবশ্যই উপরে উঠবে এবং সিদ্ধান্ত ছাড়া তা উপরে উঠত না। (৮৯--৯০ পৃষ্ঠায় দেখুন, যেখানে কারণ-এর ধারণা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।)

আমরা এখানে পারস্পরিক ক্রিয়াবাদীর প্রচলিত ভাষায় (interactionist terms) ব্যক্ত একটি তত্ত্ব পাচ্ছি। হাতটি উপরে উঠানোর সিদ্ধান্ত হচ্ছে একটি মানসিক ঘটনা এবং এর কারণিক পরিণাম, অর্থাৎ হাতটি উপরে উঠে যাওয়া, হচ্ছে ওই মানসিক ঘটনার ফল। এভাবে উপস্থাপিত এ তত্ত্বটি স্পষ্টতঃই উপঘটনাবাদ (epiphenomenalism) এবং সমান্তরালবাদ (parallelism)

এর বিরোধী---যেসব তত্ত্ব অনুসারে মানসিক ঘটনা কখনও দৈহিক ঘটনার কারণ নয়। যদি এ দুটি তত্ত্বের কোন একটিও সত্য হয়, তাহলে আমার হাত উপরে উঠে যাওয়ার ব্যাপার ঘটানোতে আমার হাত উঠানোর ব্যাপারে আমার সিদ্ধান্তের কোন ভূমিকা ছিল বলে চিন্তা করা একটা তথ্যগত বিভ্রান্তি (a factual mistake) মাত্র ; সার্বিকভাবে ব্যাপারটি এই যে, আমার হাত উঠানোসহ আমার সিদ্ধান্ত নিজেই মস্তিষ্কবর্তী ঘটনাবলীর একটি উপজাত (by-product) মাত্র, অথবা ওই মস্তিষ্কবর্তী ঘটনাবলীর একটি সহগামী মাত্র (a mere concomitant), যেগুলো আমার সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং হাত উপরে উঠে যাওয়া--এই উভয়েরই কারণ।

সে যাই হোক, এটা লক্ষ্য করা উচিত হবে যে, এই তত্ত্বটি জড়বাদের কোন কোন রূপ (form), যেমন আচরণবাদ (behaviourism) এবং অভিন্নতা তত্ত্ব (identoty theory)-এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। পূর্বোক্ত তত্ত্বানুসারে মানসিক ঘটনাবলীকে প্রবণতাসূচক (dispositional) হিসাবে বিশ্লেষণ করতে হবে; বিশেষতঃ কারো হাত উঠানোর সিদ্ধান্তকে কারো হাত উঠানোর প্রবণতাগ্রস্ত হওয়া হিসাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। এবং এরূপ প্রবণতা অর্জন করা কারো হাত উপরে উঠে যাওয়ার কারণটির অংশও হতে পারে। অভিন্নতা তত্ত্বানুসারে, মানসিক ঘটনা মস্তিষ্কবর্তী ঘটনাবলীর সাথে অভিন্ন, যেমন, কারো হাত উঠানোর সিদ্ধান্ত। এবং এরূপ মস্তিষ্কবর্তী ঘটনাবলী কারো হাত উপরে উঠে যাওয়ার কারণটির অংশও হতে পারে। সুতরাং, কাজ-এর এই তত্ত্বটির পারস্পরিক ক্রিয়াবলী ঝোঁক থাকা সত্ত্বেও, মননধর্মী শব্দাবলীর সঠিক ব্যাখ্যা দেয়া থাকলে জড়বাদের কোন কোন মতের সাথে এ তত্ত্ব সঙ্গতিপূর্ণ হবে। যাই হোক, প্রধানতঃ এর দ্বৈতবাদী কাঠামোর জন্য---যে কাঠামোতে মানসিক ঘটনাবলীকে দৈহিক ঘটনাবলী থেকে পৃথক গণ্য করা হয়---এ তত্ত্বটি সমকালীন বিতর্কের বিষয় হয়ে পড়েছে।

এই দ্বৈতবাদী কাঠামোতে, অভিপ্রায়মূলক কাজ-এর যে মানসিক কারণ রয়েছে, সে-তত্ত্ব তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। এই মন্তব্য থেকে সমালোচনার শুরু হয় যে, এমন অসংখ্য ঘটনা রয়েছে যেখানে একটি অভিপ্রায়মূলক কাজ ঘটে, কিন্তু অভিপ্রায়, পছন্দ, সিদ্ধান্ত, প্রতিজ্ঞা বা দৃঢ়-সংকল্প তার কোন লক্ষণীয় পূর্ববর্তী সচেতন মানসিক ঘটনাবলী ব্যতিরেকেই তা ঘটে থাকে। টাইপরাইটারের চাবিতে আঘাত করা, হাঁটার সময় পা নাড়ানো, পড়ার সময় পৃষ্ঠা উল্টানো, পাঁচড়া খোঁড়ানো, পাশ দিয়ে হেঁটে-যাওয়া কোন মেয়েকে দেখার জন্য মাথা ঘুরানো এবং কাউকে দিয়াশলাই দেয়ার মত কাজ

সাধারণতঃ পূর্ববর্তী কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা ইচ্ছাকৃত পছন্দ ছাড়াই ঘটে থাকে। স্বাভাবিক ঘটনা হিসাবেই এসব কাজ আমরা সরাসরিই করে থাকি। কোন সচেতন পছন্দ বা ইচ্ছাকৃত সিদ্ধান্তের অনুপস্থিতি এটা বোঝায় না যে, সেগুলোকে আমরা যেন অজ্ঞানাবস্থায় (in a coma) বা সম্মোহনের বশবর্তী হয়ে (under hypnosis) বা প্রতিবর্ত (reflex) ক্রিয়া হিসাবে বা অনিচ্ছাকৃতভাবে করে থাকি। কোন সচেতন পছন্দ বা সিদ্ধান্তের প্রারম্ভিকতা ছাড়াই কিন্তু আমরা অভিপ্রায়মূলকভাবেই এ ধরনের কাজ করতে পারি।

মানসিক-কারণ তত্ত্বকে (mental cause theory) রক্ষার জন্য কোন কোন দার্শনিক 'ইচ্ছার ক্রিয়া' (act of will) বা 'অভীপ্সা'র (volition) ধারণার প্রবর্তন করেছেন, যা প্রত্যেক কাজের পূর্বগামী হয় এবং তাকে সংঘটিত করে। এমন-কি, যখন ইচ্ছাশক্তিকে কোন সচেতন সিদ্ধান্ত বা উদ্দেশ্য-প্রণোদিত পছন্দ হিসাবে চিহ্নিত করা যাবে না, তখনও তা ঘটে এবং গতিবিধির সঞ্চার করে। তাহলে, কাজকে কোন ইচ্ছাশক্তি দ্বারা সংঘটিত একটি সঞ্চলন (moment) হিসাবে বিশ্লেষণ করতে হবে।

অভীপ্সার মতবাদের (the doctrine of volition) স্বাভাবিক আবাসভূমি হচ্ছে দেহমন দ্বৈতবাদ, এবং তারই মত এ মতবাদ গত কয়েক দশকের মধ্যে ক্রমাগত কঠোরভাবে সমালোচিত হয়েছে। গিলবার্ট রাইলই এই মতবাদকে দার্শনিকের একটি অতিকথা (a philosopher's myth) হিসাবে "যন্ত্রে-ভূত সম্পর্কিত অতিকথার একটি অপরিহার্য সম্প্রসারণ"[১] বলে নিন্দা করার পথ দেখিয়েছেন। মতবাদটির বিরুদ্ধে রাইল নিম্নোক্ত অভিযোগসমূহ উপস্থাপিত করেছেনঃ (১) একটা অভীপ্সা যে প্রতিটি অভিপ্রায়মূলক কাজের পূর্বগামী হয় এমন চিন্তা করার কোন অভিজ্ঞতামূলক (empirical) ভিত্তি নেই; বহুক্ষেত্রেই কাজের মধ্যে কোন ইচ্ছাশক্তিকে খুঁজে পাওয়া যায় না, যদিও এই মতবাদ অনুসারেই ইচ্ছাশক্তিসমূহ হচ্ছে এমনসব ঘটনা যে যদি সে-গুলো ঘটে, তবে তাদের সম্পর্কে আমাদের অবশ্যই সচেতন হওয়া উচিত। (২) মতবাদটি যদি সত্য হত, তবে কেউ বড় জোর শুধু এই 'অনুমান' করতে পারত যে অভিপ্রায়মূলক-ভাবেই কোন নির্দিষ্ট সঞ্চলন সম্পাদিত হয়েছিল। অন্যব্যক্তিদের বেলায়, কেউ বড় জোর কেবল তাদের আচরণ থেকে তাদের আভ্যন্তরীণ ও গোপন

---

১ Gilbert Ryle-এর The Concept of Mind (New York, Barnes & Noble, Inc. 1949), পৃঃ ৬৩। তাঁর সমালোচনাসমূহ ওই পুস্তকের তৃতীয় অধ্যায়ের পরিচ্ছেদ (২)-এ পাওয়া যাবে।

ইচ্ছাশক্তিকে অনুমান করতে পারত ; এবং নিজের ক্ষেত্রে—যেহেতু কারণকে শুধু আরোহী অনুমানের সাহায্যে জানা যায়—সে কেবল আরোহী পদ্ধতিতে অনুমান করতে পারত যে, ইচ্ছাশক্তিটি প্রকৃতপক্ষেই তার সঞ্চলনের 'কারণ' ছিল। কিন্তু, বিশেষতঃ নিজের ক্ষেত্রে, প্রায় সবাই অনুমান ব্যতিরেকেই জানতে পারেন যে, স্বেচ্ছায়ই একটি সঞ্চলন সম্পাদিত হয়েছিল। সুতরাং মতবাদটি সত্য হতে পারে না। (৩) "ইচ্ছাশক্তিগুলো" সম্পর্কে আমরা এই প্রশ্ন করতে পারি যে, সে-গুলোর সংঘটনের জন্য পূর্ববর্তী কোন ইচ্ছাশক্তি প্রয়োজন কিনা। যদি তা হয় তাহলে আমরা ইচ্ছা শক্তির এক অনন্ত পশ্চাদাপসরনের (an infinite regress) সম্মুখীন হই। কোন সঞ্চলনের যদি অভিপ্রায়মূলকভাবে সংঘটনের জন্য অবশ্যই কোন পূর্ববর্তী ইচ্ছাশক্তির প্রয়োজন হয়, তাহলে ওই ইচ্ছাশক্তির সংঘটনের জন্য অন্য একটি পূর্ববর্তী ইচ্ছাশক্তি প্রয়োজন হবে এবং এভাবে অনন্তের দিকে চলতে থাকলে এগুলোর কোনটিরই সংঘটন সম্ভব হবে না। এই মতানুসারে অভীপ্সা হচ্ছে ইচ্ছার ক্রিয়া, এবং যদি তার আশ্রয় হিসাবে কোন অভীপ্সার পূর্ববর্তী অন্য কোন অভীপ্সার প্রয়োজন না হয়, তাহলে কেন এটা ভাবতে হবে যে, কোন কাজের জন্য পূর্ববর্তী কোন অভীপ্সা অবশ্যই থাকতে হবে?

সর্বশেষ অভিযোগটি হচ্ছে এই যে, এখানে কারণের প্রতি আবেদন একটি ধোঁকা (a sham) মাত্র।[১] নিম্নোক্ত প্রসিদ্ধ তুলনাটাকে বিবেচনা করার জন্য আমাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়ঃ কোন ঔষধ যে একজন মানুষকে ঘুম পাড়ায় তার কারণ জিজ্ঞেস করা হলে উত্তরে একথা বলা যেতে পারে, ঔষধটির নিদ্রাদায়ক শক্তিই (soporific) হচ্ছে এর কারণ। কিন্তু, এটা আদৌ কোন ব্যাখ্যাই হবে না, ব্যাখ্যার একটি অবভাস হবে মাত্র, কেননা "নিদ্রাদায়ক" শক্তি বলতে কেবল "নিদ্রা-ঘটানোর শক্তি"-কেই বুঝায়। এভাবে আমরা কেবল এই বলেছি যে, ঔষধটির কোন মানুষকে ঘুম পাড়ানোর কারণ হচ্ছে এর সেই ধর্ম যা মানুষের ঘুমের সঞ্চার করে। আমরা এই বলে ঘটনাটি "ব্যাখ্যা করেছি" যে, এর কারণ হল সেই বৈশিষ্ট্য যা এরূপ ঘটনাগুলোকে ঘটায়। এবং একথা বললে আদৌ তথ্যমূলক (informative) কিছুই বলা হল না। মনে করা হয় যে, কোন পূর্ববর্তী "অভীপ্সা"কাজের কারণ

---

১ একটি স্থলে, যেখানে এর দীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে, তা হল A. I. Melden-এর *Free Action* (New York : Humanities Press, Inc., 1961), অধ্যায়—৫।

এটা দাবী করলে আমাদের অবস্থা সেই একই রকম হয়---কারণ, যখন আমরা জিজ্ঞেস করি "অভীপ্সা" কি, তখন আমরা কেবল এই বলতে পারি যে, এটা সেই পূর্ববর্তী মানসিক ঘটনা যা কাজটিকে ঘটায়। এ কথাটা বিশেষভাবে সুস্পষ্ট হবে, যদি আমরা আমাদের মনোযোগ সেই-সব ক্ষেত্রের উপর নিবদ্ধ করি যেখানে আমরা পূর্ববর্তী কোন পছন্দ বা সিদ্ধান্ত ব্যতিরেকেই কাজ করি—সেইসব ক্ষেত্রের উপর যেখানে আমরা কেবল একটি বিশেষ অবস্থার সম্মুখীন হই এবং সরাসরি ও তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিক্রিয়া করি। এসব ক্ষেত্রে আমরা এমন কোন চেতনাশীল ঘটনা সম্পর্কে সচেতন থাকি না, যা আমরা কাজটির কারণ বলতে পারি। সুতরাং, এখানে "অভীপ্সা"-কে শুধু "কাজের কারণ" বলে বোঝা যেতে পারে। আমরা এই বলে কাজকে "ব্যাখ্যা করি" যে, এর কারণ হচ্ছে তা-ই যা এরূপ একটি কাজকে ঘটায়। এ রকম ক্ষেত্রে কোন তথ্যপূর্ণ কারণিক ব্যাখ্যা দেয়া হল না এবং তাই কারণের প্রতি আবেদন একটি ধোঁকা মাত্র।

এখন এই অভিযোগগুলো সঠিক অর্থে কি প্রমাণ করছে? রাইলের প্রথম অভিযোগ এটা দেখায় যে, প্রতিটি দৃষ্টান্তেই অভীপ্সাগুলো কোন সচেতন ঘটনা হতে পারে না। কিন্তু সেগুলো যে কখনো কখনো একটু ভিন্ন প্রকৃতির হতে পারে একথা তার দ্বারা নাকচ করা হয় না; সম্ভবতঃ, সজ্ঞান পছন্দ ছাড়া আমরা যখন কোন কাজ করি, তখন সঠিক পরিস্থিতিতে কাজ করার কোন প্রস্তুতি-অর্জন, অর্থাৎ একটি প্রবণতামূলক অবস্থাই, হল "অভীপ্সা"। কোন ব্যক্তি বড় জোর অন্যদের মধ্যে অভীপ্সার অস্তিত্বকে যে শুধু 'অনুমান' করতে পারে মাত্র, রাইলের এই দ্বিতীয় অভিযোগ ধরে নেয় যে, অন্যের কাজটি যে অভিপ্রায়মূলক ছিল সে-সম্পর্কে সে অনুমান--নিরপেক্ষ (non-inferential)জ্ঞান পেতে পারে—একে ন্যূনপক্ষে একটি সন্দেহজনক প্রাকস্বীকৃতি (assunption) বলা যায়। কোন ব্যক্তি যে তার নিজের ক্ষেত্রে অনুমান---নিরপেক্ষ জ্ঞান পেতে পারে, রাইলের সেই পূর্ব-ধারণা নিয়ে (নীচে, ১০১--১০৩ পৃষ্ঠা দেখুন*) আলোচনা পরবর্তী সময়ের জন্য আমাদের অবশ্যই স্থগিত রাখতে হচ্ছে। রাইলের তৃতীয় অভিযোগ এটা দেখায় যে, হয় কোন অভীপ্সাকে নিজেই যে একটা ক্রিয়া তা চিন্তা করা কারো পক্ষে উচিত হবে না (এবং কোন ব্যক্তির পক্ষে কোন প্রবণতাকে ক্রিয়া হিসাবে অর্জনের চিন্তা করতে হয় না) অথবা প্রত্যেক ক্রিয়ারই যে অবশ্যই একটি পূর্ববর্তী অভীপ্সা থাকবে কোন ব্যক্তির তেমন

* বর্তমান অনুবাদে পৃষ্ঠা সংখ্যা ভিন্ন—অনুবাদক।

ভাবাও উচিত হবে না (কোন ব্যক্তি অভীপ্সাগুলোকে এমন মানসিক ক্রিয়া বলে ভাবতে পারেন যাদের কোন পূর্ববর্তী অভীপ্সার প্রয়োজন হয় না)। এবং সবশেষে, মেলডেন-এর (Melden's) অভিযোগ এটা দেখায় যে, কোন অভীপ্সাকে কারণিকভাবে ব্যাখ্যাযোগ্য হতে হলে তাকে কেবল একটা নির্দিষ্ট কাজের কারণ হলে চলবে না, তার মধ্যে আরো কিছু থাকতে হবে। একে আমরা যদি কাজ করার কোন প্রস্তুতি হিসাবে গ্রহণ করি (হয় কোন প্রবণতা অথবা সিদ্ধান্ত গ্রহণের কোন সনাক্তকরণযোগ্য অভিজ্ঞতা), যার পক্ষে কাজে পরিণতি লাভ আবশ্যক নয়, তাহলে আমরা মেলডেন-এর শূণ্যতার অভিযোগ (charge of vacuousness) থেকে রেহাই পেতে পারি।

সংক্ষেপে বলা যায়, এমনও হতে পারে যে, কাজের মানসিক কারণে বিশ্বাসী প্রতিটি তত্ত্বকেই এই অভিযোগগুলোর সাহায্যে খণ্ডন করা যাবে না। যে-পর্যন্ত-না আমরা আরও ঘনিষ্ঠভাবে খুঁটিয়ে দেখছি কাজের আদৌ কোন কারণ থাকতে পারে কিনা, সে-পর্যন্ত এই তত্ত্বের বিস্তারিত আলোচনা আমরা স্থগিত রাখছি।

(২) কর্তা-তত্ত্ব

অধুনা প্রকাশিত একটি মতবাদানুসারে (যদিও এ্যারিস্টটলের দর্শনে এর আভাস পাওয়া যায়) কাজে গতির (movement) কারণ হল কেবল 'কর্তা নিজেই' (the agent himself)।[১] কাজ-এর সৃষ্টির মাধ্যমে জগৎকে পরিবর্তিত করার ক্ষমতা একজন কর্তার আছে। যখন একথা বলা হয় যে কারণটি হচ্ছে 'কর্তা নিজেই', তখন এর অর্থ হল এই মতকে নাকচ করে দেয়া যে, কাজটি হচ্ছে কোন 'ঘটনা' তা যদি কর্তার ভেতরের কোন ঘটনাও হয়। কাজ-এর

---

১ এই তত্ত্বটি একটি রূপরেখা Richard Taylor-এর *Metaphysics* বই-এ পাওয়া যায় (যা Prentice Hall Foundations of Philosophy Series-এর একটি অনুপূরক খণ্ড, পৃঃ ৫০—৫৩), এবং তাঁর *Action and Purpose* বই-এ (Englewood Cliffs, N. J. : Prentice-Hall Inc., ১৯৬৬), বিশেষভাবে অষ্টম অধ্যায়ে, বিস্তারিতভাবে সমর্থিত হয়েছে। *Human Freedom and the Self* (Lawrence, Kansas : University of Kansas Press, 1964) নামক পুস্তকটিতেও Roderick M. Chisholm কর্তৃক এটি উপস্থাপিত হয়েছে; প্রাসঙ্গিক অংশগুলো *Freedom and Action* নামে Keith Lehrer-সম্পাদিত *Freedom and Determinism* বইটির (New York : Random House, 1966) প্রথম ভাগে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

কারণ কোন ঘটনা নয়, বরং তা হচ্ছে একটি 'বস্তু' (thing) এবং, কাজ সংঘটন-ক্ষমতার অধিকারী এই বস্তুই হচ্ছে কর্তা। কর্তা-তত্ত্বীরা একথা স্বীকার করেন যে পৃথিবীতে বিপুল সংখ্যক গতি পূর্ববর্তী ঘটনাসমূহ দ্বারা সৃষ্ট হয়, কিন্তু তাঁরা এটা জোর দিয়ে বলবেন যে কিছু কিছু গতি (উদাহরণস্বরূপ যেগুলোর দ্বারা মানুষের কাজ ঘটিত) পূর্ববর্তী ঘটনা দ্বারা সৃষ্ট নয়, বরং বস্তুর দ্বারা (যেমন, মানুষ) সৃষ্ট। এবং যখন একজন মানুষ কোন কাজের কারণ হয় তখন যার দ্বারা কাজটি সংঘটিত হয় তা মানুষটির কোন আভ্যন্তরীণ ঘটনা বা অবস্থা নয়; তাহলে সেটা হত কাজ-এর কারণ হিসাবে মানসিক ঘটনা-তত্ত্ব। অর্থাৎ মানুষটি নিজেই, নিজের মধ্যে কোন পরিবর্তন সংঘটিত হওয়া ছাড়াই, কাজটি ঘটান। দাবী করা হয় যে এখানে আমরা একটা মৌলিক (basic) ও অনন্য কার্যকারণিক ব্যাপার পাচ্ছি যা জড় প্রকৃতির মধ্যে দেখা যায় না।

যে তাত্ত্বিকেরা একথা বিশ্বাস করেন তাঁরা স্বীকার করবেন যে, আমরা কখনো কখনো এমনভাবে কথা বলি যেন জড়বস্তুগুলো কর্তা। আমরা বলি একটি 'ইট' জানালাটি ভেঙেছে এবং উৎক্ষেপন মঞ্চ থেকে 'রকেটটি' আকাশে উঠল। কিন্তু তাঁরা বলবেন যে, এসব ক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে আমরা যা বুঝাতে চাই তা হচ্ছে, কোন একটি ঘটনা যা ইটটির প্রতি ঘটেছিল (যেমন, তাকে ছুঁড়ে দেয়া) তা জানালা ভাঙ্গার কারণ ঘটিয়েছিল অথবা কোন একটি 'ঘটনা' যা রকেটের প্রতি ঘটেছিল (যেমন, এর ভেতরে জ্বালানীতে অগ্নিসংযোগ) তা এর উঠে যাওয়ার কারণ ঘটিয়েছিল ঃ ইট বা রকেট কাজ-এর বা কাজ সৃষ্টিকারী ঘটনাবলীর সূত্রপাত করে নি। এমন-কি রকেটের ক্ষেত্রেও, যেখানে উঠে-যাওয়া ঘটেছিল আভ্যন্তরীণ ঘটনাসমূহের মাধ্যমে সেখানেও ঘটনাগুলো রকেটের দ্বারা সূচিত হয়নি। বরং রকেটের বাইরে নিয়ন্ত্রণ কক্ষের মধ্যবর্তী অন্য ঘটনাসমূহের দ্বারা সূচিত হয়েছিল। সুতরাং এসব ক্ষেত্রে, যদিও আমরা এমনভাবে কথা বলি যেন বস্তুগুলো কর্তা হিসাবে কাজ করেছিল, তবুও আমরা প্রকৃতপক্ষে কর্তা দ্বারা সূচিত কাজ পাই না বরং পাই পূর্ববর্তী ঘটনা দ্বারা সূচিত কতকগুলো ঘটনা। কিন্তু এখানে এই যুক্তি দেখানো হয় যে, মানুষের কাজের বেলায় আমরা মৌলিকভাবে ভিন্ন ধরনের গতি পাই যা মানুষের নিজেদের দ্বারা সূচিত হয়ে থাকে। এবং এর অর্থ হল, আমরা সেই জাতীয় কর্তার দৃষ্টান্ত পাচ্ছি, যারা গতিগুলো সৃষ্টি করে, কিন্তু নিজেরা এরূপ কোন পরিবর্তনের অধীন নয় যেগুলো গতিগুলোর জন্য কারণিকভাবে দায়ী।

এটা লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, কর্তা-তত্ত্বটি সমর্থনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হল নৈতিক দায়িত্বশীলতাকে প্রতিষ্ঠিত করা। এ তত্ত্বের কোন কোন প্রবক্তা[১] মনে করেন যে, যদি কোন গতির কোন কারণ না থাকে, তাহলে যে-ব্যক্তি গতিটি সৃষ্টি করে সে এর জন্য দায়ী নয়; এবং যদি এই গতির সৃষ্টি হয় এমন ঘটনাসমূহের দ্বারা যে-গুলো আবার কোন মানুষ ঘটায় নি এবং সে-কারণে তার নিয়ন্ত্রণাধীন নয়, তাহলে সে-ও সেই গতির জন্য দায়ী নয়। আমরা পরে (১০৬—১১০ পৃষ্ঠা দেখুন, নীচে*) আরো বিস্তারিতভাবে নৈতিক দায়িত্বের প্রশ্ন এবং অভিপ্রায়মূলক কাজের সাথে এই মতবাদের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করব।

কর্তা-তত্ত্বটি মূল্যায়নের ক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই লক্ষ্য করব যে, এই মতবাদ মানসিক কারণ-তত্ত্বের (mental cause theory) চেয়ে এবং, প্রকৃতপক্ষে, আমাদের আলোচিত উপঘটনাবাদ ও পারস্পরিক ক্রিয়াবাদের চেয়ে কার্যকরণ সম্পর্কে খুব ভিন্ন ধরনের ধারণার সূত্রপাত করে। শেষোক্ত মতবাদ অনুসারে কারণ হল একটি 'ঘটনা' অথবা 'অবস্থা' যা কোন পরবর্তী ঘটনা বা অবস্থার সাথে (যেমন, ফলাফল) কোন 'নিয়ম' দ্বারা অনুবন্ধযুক্ত থাকে যাতে পরবর্তী কোন কিছুর পূর্বাভাস বা তার 'ব্যাখ্যা' দিতে গিয়ে আমরা পূর্ববর্তী ঘটনা বা অবস্থার মুখাপেক্ষী হতে পারি; একে বলা যাক ঘটনা-কারণতা (event-causation)। কর্তা-তত্ত্বে কার্যকারণ সম্বন্ধের ধারণায়, যাকে আমরা কর্তা-কারণতা (agent causation) বলতে পারি, ঘটনা-কারণতার অনেক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের অভাব রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, আমরা গতিটির কোন ব্যাখ্যা (explanation) পাই না, যদি আমরা কেবল এটুকু জানি যে, কোন কর্তা দ্বারা এটা সংঘটিত হয়েছে। অধিকন্তু, কোন বিশেষ কার্যফলের পূর্বাভাস (prediction) দেয়ার পক্ষে আমাদের কোন যুক্তি থাকবে না, যদি আমরা কেবল এটুকু জানি যে, কোন কর্তা কাজটি করেছিল, অথবা কোন বিশেষ ধরনের কর্তা সম্বন্ধে পূর্বাভাস দেয়ার পক্ষে কোন যুক্তি থাকবে না, যদি আমরা কেবল এটুকু জানি যে কোন কর্তা দ্বারা কোন বিশেষ কার্যফল উৎপাদিত হয়েছিল। এমন-কি বিভিন্ন ধরনের কারণ এবং বিভিন্ন ধরনের কার্যফল অনুবন্ধকারী কোন কারণিক 'নিয়ম'ও থাকতে পারে না; এবং একবার যদি আমরা বিভিন্ন ধরণের কর্তা, যেমন, কৃপণ মানুষ, নির্দেশ করতে শুরু করি, তাহলে তখন আমরা এমন একটি মতবাদের দিকে অগ্রসর হব যার দ্বারা বুঝাবে যে তার কৃপণতাই এই

১ Chisholm, একই গ্রন্থে, পৃঃ ১১—১৭।

* বর্তমান অনুবাদে পৃষ্ঠা সংখ্যা ভিন্ন—অনুবাদক।

গতিটাকে ঘটিয়েছে—আর তার অর্থ হচ্ছে কর্তা-তত্ত্ব থেকে সরে যাওয়া। সংক্ষেপে বলতে গেলে, দেখা যাবে যে পূর্বাভাস, ব্যাখ্যা, অথবা কারণিক নিয়মের কোন সম্ভাবনাই আমাদের জন্য আর থাকছে না, এবং তার ফলে কোন কারণিক মতবাদই টিকে থাকছে না।

কিন্তু আমরা যদিও স্বীকার করতে পারি যে এখানে কার্য-কারণবাদের একটি বোধগম্য ধারণা আমরা পাই (কর্তা-তত্ত্ববিদেরা দাবী করবেন যে এটাই হল কারণের সবচেয়ে মৌলিক ধারণা), তবু যেখানে গতি কোন কর্তা দ্বারা সংঘটিত হয় সেখানে যে কোন মানসিক কারণ থাকতে পারে 'না', তা দেখাতে আমাদের আরো যুক্তির প্রয়োজন। কারণ উপরের অনুচ্ছেদে আলোচনা এই প্রমাণ করে যে, যদি কর্তাতত্ত্বটি একটি কারণিক মতবাদ হয়, তাহলে তা ওই শব্দের খুব বিশেষ অর্থেই কারণিক। সুতরাং, কর্তা দ্বারা সংঘটিত একটি গতি, ঘটনা-কারণ অর্থে, মানসিক ঘটনা দ্বারাও সংঘটিত হতে পারে।

যেহেতু কর্তা-তত্ত্ববিদেরা একথা বিশ্বাস কারেন বলে মনে হয় যে, কর্তা-কারণতা ঘটনা-কারণতার সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ, সেহেতু যে অন্তর্নিহিত চিত্র তাদেরকে এই বিশ্বাসের দিকে নিয়ে যায় তার দিকে লক্ষ্য করা যাক। তাঁরা মনে করেন যে, যদি কাজটি এমন কোন পূর্ববর্তী (মানসিক) ঘটনা দ্বারা সংঘটিত হয় যা কর্তার সাথে অভিন্ন নয়, তাহলে কাজটি সৃষ্টি করতে এবং সম্পাদন করতে কর্তা নিজে 'কোন ভূমিকা পালন করেন না', যেন কোন কর্তা না থাকলেও কাজটি সম্পাদিত হত। এ সত্ত্বেও, যদি কর্তা নয় বরং পূর্ববর্তী কোন (মানসিক) ঘটনা কাজটি সৃষ্টি করার জন্য যথেষ্ট হয়, তাহলে কাজের জন্য কর্তা প্রয়োজনীয় নয়।[১] কিন্তু তা অযৌক্তিক। এটি সেই যুক্তির মত হবে যে, যেহেতু সূর্যের 'আলোক-রশ্মি বিকিরণ' আমাদের তামাটে করে ফেলে, সেহেতু আমাদের তামাটে করাতে সূর্যের নিজস্ব কোন ভূমিকা নেই; অথবা যেহেতু ইঞ্জিনের 'চালক-দণ্ডটির ঘূর্ণন' গাড়ীর গতি-সঞ্চারের কারণ, তাই গাড়ীটির গতি-সঞ্চারের ব্যাপারে ইঞ্জিনের নিজস্ব কোন ভূমিকা নেই। এক ক্ষেত্রে সূর্য এবং অন্য ক্ষেত্রে ইঞ্জিন, কোন ভূমিকা পালন না

---

১ Taylor এই চিন্তাটাকে নিম্নোক্তভাবে প্রকাশ করেন: "যখন আমি বিশ্বাস করি যে আমি কিছু করেছি, তখন আমি অবশ্যই বিশ্বাস করি যে আমিই হলাম কাজটি সম্পাদিত হওয়ার কারণ, আমিই কোনকিছুকে ঘটিয়েছিলাম, এবং কাজের কারণটি নিছক আমার নিজস্ব আত্মগত অবস্থাগুলোর মত আমার ভেতরের এমন কিছু নয়, যা আমার নিজের থেকে স্বতন্ত্র" (Metaphysics, পৃ: ৫০—৫১)।

করলেও, কার্যফল উৎপাদনের জন্য সম্পূর্ণরূপে অপরিহার্য। অবশ্য, 'অন্য কোন কর্তা' হয়ত আলোক-রশ্মি বিকিরণ করে বা চালক-দণ্ড ঘুরিয়ে থাকতে পারে, কিন্তু তাহলে তা হবে 'সেই' কর্তা যা কার্যফল উৎপাদনের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত ভূমিকা পালন করে। একইভাবে, কাজের ক্ষেত্রে, যে পূর্ববর্তী (মানসিক) ঘটনাগুলোকে কাজ সংঘটিত করে বলে মনে করা হয় সেগুলো হচ্ছে এমন ঘটনা যা একজন 'কর্তার' প্রতি ঘটে। যদি একজন কর্তা না থাকত তাহলে এ ধরনের কোন ঘটনাও থাকত না, এবং তাহলে এরূপ কোন কাজও থাকত না। সুতরাং, কোন কাজ সৃষ্টিতে একজন কর্তা একটি চূড়ান্ত ভূমিকা পালন করে থাকে, এমন-কি যদি সেই কাজটি কর্তার মধ্যকার কোন ঘটনা দ্বারাও উৎপাদিত হয়ে থাকে।

কর্তা-তত্ত্বটি সম্পর্কে চিন্তা করার সর্বাপেক্ষা উত্তম পন্থা হল "ক কাজটি 'কেন' করা হয়েছিল?", এই প্রশ্ন প্রসঙ্গে নয়, বরং " 'কে' ক কাজটি করেছিল?" এই প্রশ্নের প্রসঙ্গে চিন্তা করা। এ প্রশ্নগুলো যে গুরুত্বহীন, তা নয়; "কেন" প্রশ্নটির উত্তর দেয়ার জন্য একটি অত্যাবশ্যকীয় 'প্রাথমিক পর্যায়' (preliminary) হিসাবে এ প্রশ্নগুলো বেশ উঠতে পারে। জড়-প্রকৃতি থেকে কতিপয় দৃষ্টান্তের আলোচনা করা যাক। যখন আমরা বলি 'সূর্যই' আমাদের চর্মকে তামাটে করে, বা 'ইঞ্জিনই' গাড়ীকে চালিত করে, তখনও কিন্তু আমরা "কেন আমাদের চর্ম তামাটে হয়?" বা "কেন গাড়ীটি চলে?"—এইসব প্রশ্নের উত্তর দিই নি। কিন্তু এখন আমরা জানি উত্তরের জন্য কোথায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে। সূর্য সম্পর্কে বা ইঞ্জিন সম্পর্কে কোন তথ্য থেকে প্রশ্নের উত্তরটি পাওয়া যাবে। একইভাবে, যখন আমরা জানি কাজটি 'কে' করেছিল, তখন আমরা জানব "কাজটি কেন করা হয়েছিল?"—এই প্রশ্নটির উত্তরের জন্য কোন্ দিকে মনোযোগ দিতে হবে। সুতরাং, মানসিক ঘটনা যে কাজের কারণ এই মতবাদের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া ত দূরের কথা, বরং কর্তা-তত্ত্বটি এর একটি অত্যাবশ্যকীয় পরিপূরক (a necessary supplement) হতে পারে।

অধিকন্তু, নৈতিক উদ্দেশ্যে, দায়িত্ব আরোপের উদ্দেশ্যে, অনুমোদন বা অননুমোদন (apporoval or disapporoval) করা, পুরস্কার বা শাস্তি দেয়া এবং কোন কাজে উৎসাহ দিয়ে বা নিরুৎসাহ করে জগতটাকে উৎকৃষ্টতর করার উদ্দেশ্যে, 'কর্ম-কর্তা' যে কাজটি করল তার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এবং কর্তা-তত্ত্বটি এই গুরুত্বপূর্ণ মূল উপাদানটিকে ।

উচ্চ স্থান দেয়। তবে এ মতবাদ আমাদের অভিপ্রায়মূলক কাজের ধারণায় অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ মূল উপাদানের বিনিময়ে তা করে থাকে।

(৩) সম্পাদনমূলক তত্ত্ব ঃ

কোন বিষয়কে সমর্থন করার জন্য বা কোন তথ্য পরিবেশনের জন্য আমরা প্রায়ই কিছু শব্দ ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু অনেক সময় আবার আমরা শব্দের সাহায্যে ভিন্ন কাজও করে থাকি। ধরুন, আপনাকে বলি, "আমি আমার কাজের জন্য দুঃখিত"। ব্যাকরণের দিক থেকে তেমন মনে হলেও, আমি আসলে আমার সম্পর্কে আপনাকে মূলত কোন রকম তথ্য প্রদান করছি না; আমি একটি সামাজিক আচার-পালনে ব্যাপৃত হচ্ছি, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমার কোন কাজের জন্য সর্বসমক্ষে দুঃখ প্রকাশ করা। "আমি আমার কাজের জন্য দুঃখিত" বললে কোন কিছু বর্ণনা করা হয় না অথবা এমন কিছু বলা হয় না যা সত্য বা মিথ্যা হতে পারে; এ হচ্ছে একটি কাজ সম্পাদন করা, অর্থাৎ অপরাধ স্বীকার করে দুঃখ প্রকাশের কাজটি করা। জে, এল, অস্টিন (J L Austin) যাকে সম্পাদনমূলক উক্তি[১] বলে নাম দিয়েছেন আমরা এখানে তার একটি উদাহরণই পাই, যে উক্তিতে আমরা কোন বাস্তবাবস্থা বর্ণনা করার জন্য নয়, বরং একটি বিশেষ কাজ সম্পাদন করার জন্য শব্দের ব্যবহার করে থাকি। ভাষার এ ধরনের বিপুল-সংখ্যক ব্যবহার রয়েছে যার কিছু উদাহরণ হল—"আমি এই জাহাজটির নাম দিচ্ছি লিবার্টি" "আমি আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি," "আমি তোমাকে বিবাহ করছি," "আমি প্রতিজ্ঞা করছি," "আমি তোমাকে আমার মার্বেলগুলো দিচ্ছি," "আমি প্রস্তাবটি সমর্থন করছি," "আমি আপনাকে বাড়ী যেতে অনুরোধ করছি," "আমি আপনাকে অভিযোগ অনুসারে অপরাধী দেখছি," "আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি," "আমি ও সম্পর্কে প্রশ্ন করছি" এবং "আমি প্রতিবাদ করছি"। উপযুক্ত পরিস্থিতিতে এই কথাগুলো উচ্চারণের মাধ্যমে একজন

---

১ J. O. Urmson এবং G. G. Warnock সম্পাদিত 'J. L. Austin: *Philosophical papers* (New York: Oxford University Press, 1961) সংগ্রহে J. L. Austin, 'Performative Utterances', পৃঃ ২২০--৩৯। Austin -এর একটি পূর্ণতর আলোচনা তাঁর *How to Do Things with Words* (J. O. Urmson সম্পাদিত: New York: Oxford University Press, 1965) বইটিতে পাওয়া যেতে পারে।

ব্যক্তি কোন জাহাজের নাম দেয়া, কাউকে সাবধান করা, বিবাহ করা, প্রতিজ্ঞা করা, উপহার দেয়া প্রভৃতি কাজ সম্পাদন করে।

সম্পাদনমূলক উক্তির তত্ত্বটি সম্পর্কে সাম্প্রতিককালে গভীর উৎসাহের সৃষ্টি হয়েছে। নিজস্ব গুণেই এটি একটি চমৎকার ধারণা এবং ভাষাতত্ত্বে এর গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োগ রয়েছে। আবার দর্শনেও জ্ঞান, সত্য ও নৈতিকতার স্বরূপ সংক্রান্ত প্রচলিত সমস্যাবলী নিয়ে আলোচনার প্রয়াসেও একে প্রয়োগ করা হয়েছে। অস্টিন নিজে এই তত্ত্বটিকে প্রথম জ্ঞানতত্ত্বের কিছু সমস্যার সাথে জড়িত করে উপস্থাপিত করেন, এবং বলেন যে "আমি জানি" কথাটি কারো মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা সম্পর্কে বিবরণ দেয়ার জন্য ব্যবহৃত হয় না, বরং কথাটা কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক থেকে এ ধরনের সম্পাদনমূলক উক্তিসমূহেরই মতন--যেমন, "আমি নিশ্চয়তা দিচ্ছি," "আমি কথা দিচ্ছি" অথবা "আমি তোমার সুনাম বিপন্ন করছি"।[১] স্ট্রসন এই যুক্তি দেখিয়েছেন যে, কোন একটি কাজকে "সত্য বলা-র"অর্থ সেই বাক্য সম্বন্ধে কোন নিশ্চিত উক্তি করা নয়, বরং সেই বাক্যটিকে গ্রহণ করা বা অনুমোদন করার কাজটি সম্পাদন করা।[২] এবং নীতিবিদ্যার ক্ষেত্রে একথা বলা হয়েছে যে, কোন কিছুকে 'ভাল' বা 'মন্দ', সঙ্গত বা অসঙ্গত বলার অর্থ আলোচ্য বিষয়টিকে বর্ণনা করা নয়, বরং একে 'ক্রম-অনুসারে সাজানো'[৩] অথবা প্রশংসা বা নিন্দা করার কর্ম-সম্পাদন করা।[৪] তবুও এখানে আমাদের উদ্দেশ্য হল সম্পাদনমূলক উক্তিসমূহের

---

১ J. L. Austin, "Other Minds", Proceedings of the Aristotelian Society, ২০তম সম্পূরক খণ্ড, ১৯৪৬, যা Antony Flew কর্তৃক সম্পাদিত Logic and Language-এর দ্বিতীয় সিরিজে (New York : Philosophical Library, 1953), এবং J. L. Austin-এর *Philosophycal Papers* বইটিতে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

২ P. F. Strawson, "Truth", Analysis, ৯ম খণ্ড, নং ৬ (১৯৪৯), যা Margaret MacDonald কর্তৃক সম্পাদিত *Philosophy and Analysis* (New York : Philosophical Library, 1955) গ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

৩ J. O. Urmson, "On Grading", Mind, ৫৯ (১৯৫০), ১৯৪৬—১৯৬৯, যা *Language and Logic*-এর দ্বিতীয় সিরিজে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

৪ R. M. Hare, *Language of Morals* (New York ; Oxford University Press, 1952) এবং *Freedom and Reason* (New York : Oxford University Press, 1963).

তত্ত্বটিকে কিভাবে অভিপ্রায়মূলক কাজের সমস্যার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে তা দেখা।

"ওই কাজটির ব্যাপারে আমি পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করছি", এই সম্পাদনমূলক উক্তিটি বিবেচনা করা যাক। সঠিক পরিস্থিতিতে এই উক্তি করার অর্থ হল দায়িত্ব গ্রহণের কাজটি সম্পাদন করা---যে কাজের দ্বারা আমি ফলাফলের জন্য নিজেকে দায়ী করছি, এবং কাজটির জন্য সম্ভাব্য দোষ, প্রত্যাভিযোগ ও শাস্তির জন্য নিজে প্রস্তুত থাকছি। একইভাবে "ওই কাজটির জন্য আমি আপনাকে সম্পূর্ণভাবে দায়ী করছি", তা বলার অর্থ হল ওই কাজটির ফলাফলের জন্য আপনাকে দায়ী করার কাজ সম্পাদন করা।

অভিপ্রায়মূলক কাজের সম্পাদনমূলক তত্ত্ব হল এমন একটি তত্ত্ব যেখানে "জোন্‌স্ এ কাজ 'অভিপ্রায়মূলকভাবে' করেছিল" বলতে প্রধানতঃ জোন্‌সের উপর সেই কাজের 'দায়িত্ব' বা 'দায় আরোপের' কাজটি সম্পাদন করা বোঝায়।'[১] এবং যখন আমি নিজের সম্পর্কে বলি যে "আমি এটি অভিপ্রায়মূলকভাবে করেছিলাম" তখন আমি যা করেছিলাম তার জন্য 'দায়িত্ব' নিই এবং 'দায় গ্রহণ' করার কাজটি সম্পাদন করি। অবশ্য এই উক্তিগুলোর মধ্যে সম্পাদনমূলক উপাদানের মত একটি বর্ণনামূলক উপাদানও রয়েছে। আমি যদি আপনার প্রতি সাবধান-বাণী উচ্চারণ করে বলি "আমি আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি যে, পুলিশ আসছে", তখন আমি পুলিশের আসাকেই বর্ণনা করছি এবং তার অর্থ হচ্ছে তথ্য পরিবেশন করা, এমন কিছু বলা যা সত্য বা মিথ্যা হতে পারে; কিন্তু "আমি আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি" অংশটি সম্পূর্ণভাবেই সম্পাদনমূলক। একইভাবে, "জোন্‌স্ এটি করেছিল, কিন্তু অভিপ্রায়মূলকভাবে কি-না তা আমি বলছি না" হল বর্ণনামূলক। "জোন্‌স্ এটি 'অভিপ্রায়মূলকভাবে' করেছিল" পূর্ববর্তী উক্তিটির সঙ্গে আর বেশী কিছু তথ্য যোগ করে না, কিন্তু কাজটি করার জন্য জোন্‌স্‌কে দায়ী করার সম্পাদনমূলক

---

১ এই তত্ত্বটি কোন কোন দিক থেকে H. L. A. Hart রচিত "The Aseription of Responsibility and Rights"-এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, Proceedings of the Aristotelian Society, খণ্ড-৪৯ (১৯৪৮-৪৯), পৃঃ ১৭১—৭৪, যা Antony Flew সম্পাদিত Logic and Language-এর প্রথম সিরিজে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে (New York: Philosophical Library, 1952)। Hart-এর তত্ত্বটিকে সাধারণতঃ আরোপণমূলকতা (ascriptivism) বলা হয়।

অংশটি যোগ করে দেয়। এভাবে, অভিপ্রায়মূলক কাজের একটি বিশ্লেষণ দিতে গিয়ে কোন পূর্বগামী মানসিক কারণ বা কর্তা-কারণের ন্যায় আর কোন বর্ণনামূলক উপাদান অনুসন্ধান করা আমাদের প্রয়োজন হবে না, যা উপরে আলোচিত মতবাদগুলো অনুসারে দরকার হত; এ ছাড়া নিম্নে আলোচিত মতবাদগুলোর ন্যায় কোন উদ্দেশ্যমূলক কারণ বা কোন মানদণ্ডের (norm) উল্লেখেরও প্রয়োজন হবে না।

এখন এই তত্ত্বটির সমালোচনা হিসাবে কয়েকটি কথা বলতে হয়। (১) এটা ঠিক নয় যে, আমরা অভিপ্রায়মূলকভাবে যা-কিছু করি তার জন্য আমাদের দায়ী বা দায়গ্রস্ত হতে হবে। পূর্বেই (পৃঃ ১১৬) দেখানো হয়েছে যে, আমরা অভিপ্রায়মূলকভাবে কাজ করতে পারি, তবে স্বেচ্ছামূলকভাবে (voluntarily) নয়---যেমন, কোন কাজ করতে পারি অত্যধিক চাপে পড়ে বা প্ররোচনায় অথবা আসক্তি, স্নায়বিক বাধ্যকতা বা অপ্রতিরোধ্য আবেগের কারণে---এবং এসব ক্ষেত্রে আমরা যা করে থাকি তার জন্য আমরা সাধারণভাবে দায়ী বা দায়গ্রস্ত হব না। সুতরাং, কোন কিছু অভিপ্রায়মূলকভাবে করাই তার জন্য দায়গ্রস্ত হবার পক্ষে কোন পর্যাপ্ত (sufficient) শর্ত নয়। (২) কোন উক্তিতে সম্পাদনমূলক উপাদানের একটি অত্যাবশ্যকীয় লক্ষণ হচ্ছে যে, তা সত্যও নয় বা মিথ্যাও নয়, কারণ এটি কিছু উল্লেখ, সমর্থন, বর্ণনা অথবা প্রতিবেদন করে না। কিন্তু কেউ যে তা অভিপ্রায়মূলকভাবে করেছিল সেই দাবী সত্য বা মিথ্যা হতে পারে, এবং এই সত্য বা মিথ্যা হওয়া নির্ভর করে কাজটি সে অভিপ্রায়মূলকভাবে করেছিল কি না তার উপর। যদি কোন কার্য সংঘটিত হয়, তাহলে কেউ বিশ্বাস করতে পারে যে সেটি 'অভিপ্রায়মূলক ভাবেই' করা হয়েছিল এবং তার ভুল হতে পারে (এমন-কি নিজের কাজ সম্পর্কেও, যেমন, যে-কাজ বেশ কয়েক বছর আগে করা হয়েছিল), এবং কেউ বলতে পারে যে কাজটি অভিপ্রায়মূলকভাবে করা হয়েছিল এবং সে মিথ্যাও বলতে পারে; এগুলো, "আমি আপনাকে অভিনন্দিত করছি" বা "আমি প্রতিবাদ করছি", এ সবের মত অকৃত্রিম সম্পাদনমূলক উক্তি নয়। (৩) কোন কিছু অভিপ্রায়মূলকভাবে করা বড় জোর সেটি করার জন্য দায়ী হওয়ার একটি 'অত্যাবশ্যকীয়' শর্ত, কিন্তু দায়ী 'করার' জন্য তা অত্যাবশ্যকীয় শর্ত নয়; কোন ব্যক্তি একটা কাজ অভিপ্রায়মূলকভাবে করে নি এবং সেই কারণে তার জন্য দায়ী নয়, এমন-কিছুর জন্যও কোন ব্যক্তিকে দায়ী 'করা' যেতে পারে (এমন-কি নিজেও সে নিজেকে দায়ী করতে পারে)। আবার, কোন

কিছুর জন্য সে দায়ী হতেও পারে, কিন্তু তার জন্য তাকে দায়ী 'করা' যেতে পারে না। কোন কাজ অভিপ্রায়মূলকভাবে করা হয়েছিল কিনা, তার থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবেই দায়িত্ব আরোপ বা গ্রহণের ক্রিয়াটি বেশ স্বাধীনভাবেই ঘটতে পারে বা না-ও ঘটতে পারে। এই তিনটি কারণে এ দাবী সঠিক বলে প্রতীয়মান হয় না যে, কেউ একটি কাজ 'অভিপ্রায়মূলকভাবে' করেছিল বলা এবং কাজটির জন্য সেই ব্যক্তির উপর 'দায়িত্ব' আরোপ করার ক্রিয়াটি অভিন্ন।

আমরা ধরে নিতে পারি যে, কোন একটি কাজের জন্য দায়িত্ব আরোপ করা এবং কাজটি অভিপ্রায়মূলকভাবে করা হয়েছিল বলা, এ দুই-এর মধ্যে একটি সম্পর্ক আছে। সম্পর্কটি মনে হয় এরূপ হবেঃ যখন কোন কাজের জন্য আমরা দায়িত্ব আরোপ করি তখন আমরা বিশ্বাস করি যে, সেই ব্যক্তি এই কাজটি অভিপ্রায়মূলকভাবে করেছিল; "আমি আপনাকে (অথবা নিজেকেই) কাজটির জন্য দায়ী করছি" একথা বলা এবং কাজটি যে অভিপ্রয়মূলক করা হয়েছিল তা বিশ্বাস না করা কপটতা হবে। কাজটি অভিপ্রায়মূলক ছিল এটা বিশ্বাস করা হল দায়িত্ব আরোপ করার অকপট কর্ম-সম্পাদনের একটি পূর্ব-শর্ত। কিন্তু এগুলো অভিন্ন একথা মোটেও বলা চলে না।

এটা অনস্বীকার্য যে, দায়িত্ব ও অভিপ্রায় আরোপ করা সম্পূর্ণরূপে বর্ণনা-মূলক নয়, তারা সম্পাদনমূলক উপাদানকেও অন্তর্ভুক্ত করে। এরূপ ক্ষেত্রে আমরা পৃথিবীকে কেবল বস্তুগতভাবে ও নির্লিপ্তভাবে বর্ণনা করি না। আমরা নিজেরাও এখানে একটি ভূমিকা গ্রহণ করি, একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হই, প্রশংসা ও দোষ, শাস্তি এবং পুরস্কার, অননুমোদন ও অনুমোদনের ব্যবহারিক পরিণতির সাথে নিজেদের জড়িত করি। কিন্তু এমন চিন্তা করা স্পষ্টতঃই ভুল হবে যে, এখানে বর্ণনামূলক কোন উপাদান নেই। যখন আমরা কোন একজন ব্যক্তিকে দায়ী করি বা বলি যে সে কোন কিছু অভিপ্রায়মূলকভাবে করেছিল, তখন আমরা দাবী করি যে, তার কাজটি কোন উদ্দেশ্য সহকারে, কোন লক্ষ্য সামনে রেখে করা হয়েছিল। আর, এর অর্থ হচ্ছে কাজটি করার সময় কাজের কর্তার মনের সাময়িক অবস্থা সম্পর্কে কিছু বলা। সুতরাং আমরা পরবর্তী তত্ত্বটির দিকে এবার মনোযোগ দিতে পারি, যে-মতবাদ উদ্দেশ্যের ধারণাটিকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরছে।

(৪) কাজের ব্যাখ্যা হিসাবে লক্ষ্য ঃ

অনেক কাজেরই এমন বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে, কোন একটি লক্ষ্যে (goal)

পৌঁছানোর জন্য কোন বিশেষ অবস্থা সৃষ্টির অভিপ্রায় অনুসারে, মনের কোন উদ্দেশ্য নিয়ে সেগুলো সম্পাদিত হয়ে থাকে। আমি কেবল আমার হাতকে নড়াইনা, হাত বাড়িয়ে আঙ্গুরগুলো ধরতেও চেষ্টা করি। আমি কেবল আমার ইচ্ছা পুনর্বিবেচনা করি না, আমি আমার অপব্যয়ী ভাইপোকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিতও করি। আমি কেবল আমার নাম সই করি না; আমি নিজেকে শান্তিবাহিনীর তালিকাভুক্তও করি। কাজটি এমন কোন ভবিষ্যৎ অবস্থার জন্য করা হয় যা কাজটি দ্বারা সংঘটিত হবে বলে আশা করা যায়।

কাজের ভবিষ্যৎ অবস্থা দুটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়ে এ বিষয়ের মধ্যে এসে পড়ে। প্রথমতঃ, কাজটিকে 'ব্যাখ্যা' করার জন্য আমরা এর উল্লেখ করিঃ "সে তার হাতটি 'কেন' নাড়িয়েছিল?" "আঙ্গুরগুলো পাওয়ার জন্য।" যে উদ্দেশ্যাবস্থা (end-state) অর্জনের জন্য কাজটি করা হয়েছিল আমরা তার মাধ্যমে কাজটিকে বুঝি। দ্বিতীয়তঃ অনেক সময় কাজটিকে 'বর্ণনা' করার জন্য আমরা তার উল্লেখ করি। "সে 'কি' করেছিল?" "সে আঙ্গুরগুলো হাত বাড়িয়ে ধরতে পেয়েছিল"। এখানে ব্যাখ্যা করা এবং বর্ণনা করার কাজটি অভিন্ন বলে গণ্য হতে পারে। ধরা যাক, আমি আমার নাম লিখি। আমি কি একটি চেক সই করছি, অথবা আমার হাতের লেখা অভ্যাস করছি, অথবা আমার কলমটি পরখ করে দেখছি, অথবা আমার নামের মত যার নাম এমন কারো সই জাল করছি, অথবা আমি যে-নাম লিখছি সেটি পর্যবেক্ষণ করে আমার কি নাম তা শিখতে চেষ্টা করছি? আমি যে কাজটি করছি যুগপৎ তার বর্ণনা এবং ব্যাখ্যা হিসাবে এদের প্রত্যেকটি ব্যবহৃত হতে পারে। এই ব্যাখ্যামূলক বর্ণনাগুলোর কোন একটি যদি সঠিক হয় তাহলে তাদের কোন্‌টি সঠিক সেটা যার দ্বারা নির্ধারিত হয় তা হচ্ছে সেই ভবিষ্যৎ-অবস্থা যাকে আমি লক্ষ্য হিসাবে নিয়েছি-অর্থাৎ আমার নাম লেখার সময় যাকে আমি 'উদ্দেশ্য' হিসাবে নিই।

উদ্দেশ্য, ফল বা ঈপ্সিত লক্ষ্যের মাধ্যমে কোন বর্ণনা যে-ব্যাখ্যা প্রদান করে তাকে প্রায়শঃই উদ্দেশ্যবাদী ব্যাখ্যা (teleological explanation) বলা হয়। এই মতবাদে বিশ্বাসী তাত্ত্বিকদের বক্তব্য হবে, কোন গতিকে অভিপ্রায়মূলক কাজে পরিণত হতে হলে সেই গতির ক্ষেত্রে একটা উদ্দেশ্যবাদী ব্যাখ্যা দেয়া যথোচিত হবে।[১]

---

১ এ মতবাদটি Charles Taylor কর্তৃক *The Explanation of Behaviour* (New York : Humanities, Press, ১৯৬৪) গ্রন্থে সমর্থিত হয়েছে। Richard Taylor-এর Action and Purpose বইটিও দেখুন।

উদ্দেশ্যবাদী বক্তব্যের সপক্ষে এ তথ্য উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এখানে আমরা এক ধরনের ব্যাখ্যা পাচ্ছি যা কাজ বলে গণ্য গতির জন্য বিশেষভাবে প্রযোজ্য। যেসব গতি কাজ বলে গণ্য নয়---যেমন, অষ্টম বলটি (the eighth ball) কেন নড়েছিল —তাদের সাধারণ ব্যাখ্যায় কোন উদ্দেশ্য, লক্ষ্য বা ফলের প্রতি আবেদন আবশ্যক বা যথোচিত নয়। এটা পাশের পকেটে যাওয়ার উদ্দেশ্যে নড়ে নি, নড়েছিল কেবল এ-কারণে যে বিশেষ গতিসম্পন্ন অন্য একটি বল এটাকে আঘাত করেছিল। কিন্তু বিলিয়ার্ড খেলোয়াড়কে আমরা জিজ্ঞাসা করতে পারি 'কেন' সে অষ্টম বলটিকে নাড়িয়েছিল এবং এ ধরনের একটি উত্তর আশা করতে পারি যে, "একে পাশের পকেটে ফেলবার উদ্দেশ্যে"। কাজ বলে গণ্য গতিগুলোর ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যের বা লক্ষ্যের প্রতি আবেদন আবশ্যক এবং যথোচিত। এ পর্যন্ত উদ্দেশ্যবাদী মতবাদে বিতর্কের অবকাশ সামান্যই।

বিতর্ক তখনই ওঠে যখন দার্শনিকেরা এ দাবী করেন যে, আমরা এখানে একটি বিশেষ ধরনের ব্যাখ্যা পাই যা 'পূর্বগামী পরিস্থিতির মাধ্যমে সাধারণ কারণিক ব্যাখ্যার' সাথে অপরিবর্তনীয়ভাবে ভিন্ন এবং অসামঞ্জস্যপূর্ণ। এ দাবীটিই আমাদের পরীক্ষা করা আবশ্যক।

তিনটি মতবাদ রয়েছে যেগুলোর মধ্যে এখানে পার্থক্য দেখাতে হবে। (১) একটি মতবাদ হল, 'ভবিষ্যৎ' ঘটনাই আমার বর্তমান আচরণকে ঘটায়, সৃষ্টি করে বা উদ্রিক্ত করে। এই মতবাদানুসারে, সাধারণ ধরনের কারণ, যাকে কখনও কখনও নিমিত্তকারণ বলা হয়, তার সাথে পরিণতিকারণের পার্থক্য হচ্ছে যে, কারণটি হল একটা ভবিষ্যৎ ঘটনা, কোন অতীত ঘটনা নয়। কাজ যে পূর্ববর্তী (মানসিক) ঘটনার দ্বারা সংঘটিত হয়, পূর্বে আলোচিত এ তত্ত্বটির সঙ্গে এই মতবাদ স্পষ্টতঃই অসঙ্গতিপূর্ণ। (২) আরও সূক্ষ্ম তত্ত্বটি হচ্ছে এই যে, আমার বর্তমান আচরণের কারণ হল 'পূর্ববর্তী' পরিস্থিতির কোন একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য--অর্থাৎ, ওইসব পরিস্থিতিতে ভবিষ্যৎ লক্ষ্যাবস্থাকে সৃষ্টি করার জন্য ঠিক সেই আচরণেরই 'প্রয়োজন' হয়। আচরণের 'প্রয়োজনীয়তাই' আচরণটি সংঘটনের কারণ।[১] (৩) সবশেষে, সংযত মতবাদটি হচ্ছে যে, কাজকে সম্পূর্ণভাবে বোঝাতে বা 'ব্যাখ্যা' করার জন্য

১ এই মতবাদটি Charles Taylor কর্তৃক প্রস্তাবিত হয়েছে, *The Explanation of Behaviour*, প্রথম অধ্যায়।

আমাদের অবশ্যই ঈপ্সিত ভবিষ্যৎ অবস্থার উল্লেখ করতে হবে। আমরা যদি বলি যে ভবিষ্যৎ অবস্থাটি কাজের "কারণ", তা হলে আমরা শব্দটিকে "নিমিত্ত কারণ"--এর অর্থে নয়, কাজটির লক্ষ্য অথবা যৌক্তিকতার (rationale) অর্থেই ব্যবহার করছি। এখানে আমরা এসব বিবরণের প্রত্যেকটিকে আরও বিস্তৃতভাবে পরীক্ষা করতে পারি।

(১) কেবল যুক্তির খাতিরেই যদি আমরা স্বীকার করি যে, একটি ভবিষ্যৎ ঘটনা কোন বর্তমান ঘটনাকে কারণিকভাবে প্রভাবিত করতে পারে, তথাপি কাজের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে আমরা প্রথম মতবাদটিকে সহজেই বাদ দিতে পারি। এরূপ হতে পারে না যে, প্রতিটি কাজই ভবিষ্যৎ লক্ষ্যাবস্থার দ্বারা সৃষ্ট হয়, যে লক্ষ্যাবস্থা কাজটির উদ্দেশ্য ; এবং তার সহজবোধ্য কারণটা এই যে, অন্ততঃ বহুক্ষেত্রেই, ভবিষ্যৎ লক্ষ্যাবস্থা কখনও সংঘটিত হয় না, কখনও অর্জিত হয় না। আমার কাজটি আঙ্গুরগুলোকে হাত বাড়িয়ে পাওয়ার একটা অকৃত্রিম প্রচেষ্টা হতে পারে, কিন্তু সেগুলো পেতে আমি ব্যর্থ হতে পারি ; এরূপ ক্ষেত্রে, আঙ্গুরগুলো 'প্রাপ্ত হওয়া' আমার সেগুলোকে পাওয়ার চেষ্টার কারণ হতে পারে না, কেননা, তা কখনও ঘটে না এবং সেজন্য তা কোন কিছুর কারণও হতে পারে না।

(২) এমন দাবী করা আপাত দৃষ্টিতে যুক্তিপূর্ণ মনে হয় না যে, আচরণের শুধু প্রয়োজনীয়তাই সেটা (কাজটা) সৃষ্টি করার জন্য যথেষ্ট। প্রয়োজজনীয়তাই উদ্ভাবনের জননী---এই প্রবাদের মধ্যে হয়ত কিছুটা সত্য আছে, কিন্তু কেবল প্রয়োজনীয়তা নিজেই কোনকিছুকে অস্তিত্বশীল করতে পারে না। আমরা এমন অনেক দুঃখজনক ঘটনার কথা জানি যেখানে লক্ষ্যাবস্থা (goal -state) অর্জনের প্রয়োজনে একটি কাজ কখনোই ঘটে না। উদাহরণস্বরূপ, কাজের কর্তা এমন অনুভব না-ও করতে পারে যে কাজটির প্রয়োজনীয়তা আছে। কাজটির সংঘটনের জন্য, অন্ততঃপক্ষে তাকে 'বিশ্বাস' করতে হবে যে, লক্ষ্যাবস্থাটি উৎপাদনের জন্য কাজটি প্রয়োজন। আর একবার যদি তা দেখানো হয় তাহলে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, কাজটি যে 'বাস্তবিকপক্ষে' প্রয়োজনীয় তাও অপরিহার্য নয় ; অপরিহার্য কেবল এটুকু যে, কাজটিকে যেন (হয়ত ভুলক্রমে) প্রয়োজনীয় বলে বিশ্বাস করা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা চলে, যদি প্রশ্ন করা হয় কেন সে গাড়ী থামিয়েছে, তাহলে "গ্যাস নেয়ার জন্য" উক্তিটি একটি সম্পূর্ণ ভাল ব্যাখ্যা হতে পারে, যদিও সে বুঝে নি যে, গ্যাসের ষ্টেশন বন্ধ এবং সেজন্য গ্যাস নেয়ার লক্ষ্যাবস্থার দিক দিয়ে সেখানে

তার থামার কাজটির কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। কিন্তু একবার যদি আমরা মতবাদটিকে পরিবর্তন করি এই ভেবে যে, কাজের কর্তার মানসিক অবস্থা, যেমন, তার বিশ্বাস ও কামনা, এখানে জড়িত রয়েছে, তা হলে পূর্বগামী মানসিক পরিস্থিতি কাজের কারণ---পূর্ববর্তী এই মতবাদ থেকে একে আর পৃথক করা যাবে না।

(৩) একথা অনস্বীকার্য যে, আমরা প্রায়ই কাজকে ঈপ্সিত ভবিষ্যৎ অবস্থার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করে থাকি, যেন কোন এক ব্যক্তির লক্ষ্যকে জানা তার কাজকে বোঝার জন্যও আবশ্যক হতে পারে। এখানে আমরা এক ধরণের ব্যাখ্যা পাই, যা বিশেষতঃ মানুষ ও উচ্চতর প্রাণীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য (আপনার বিড়াল ওই পাখীটিকে 'এখানে' কেন আনছে?" "আমাদের জানাতে যে, সে কত ভাল শিকারী")। যে-ক্ষেত্রে অচেতন বস্তুর বেলায় এর প্রয়োগ করা হয়, সেখানে হয় এটি রূপাত্মক ("পানি নিম্নতম তলকেই খোঁজে"), পরিকল্পনাকারীর উদ্দেশ্য-উদ্ভূত ("ব্যাটারির উদ্দেশ্য হল গাড়ীকে চলতে দেয়া"), নয়তো কোন পরিকল্পিত ব্যবস্থার (designed system) তুলনা-ভিত্তিক ("হৃৎপিণ্ডের উদ্দেশ্য হল রক্তের সঞ্চালন বজায় রাখা")।

আমরা বিতর্কের আওতায় তখনই প্রবেশ করি যখন আমরা এই প্রশ্ন করিঃ কাজকে অভিপ্রেত লক্ষ্যের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা এবং পূর্বগামী নিমিত্তকারণ-এর মাধ্যমে ব্যাখ্যা করার মধ্যে কোন অসামঞ্জস্যতা আছে কি না। মনে হয় যেন তা নেই। কারণ, আমরা যদি কোন 'ভবিষ্যৎ' অবস্থার উল্লেখ করি যার প্রতি লক্ষ্য নিবদ্ধ, তাহলে আমরা 'লক্ষ্য করার বর্তমান ও অতীত অবস্থাকে', অর্থাৎ ওই ভবিষ্যৎ অবস্থাকে অর্জন করার বর্তমান ও অতীত অভিপ্রায়কে উল্লেখ করতে পারি। সুতরাং, প্রত্যেক উদ্দেশ্যবাদী ব্যাখ্যার ক্ষেত্রেই অভিপ্রায়ের কারণিক ফলপ্রসূতার মাধ্যমে একটি সমান্তরাল ব্যাখ্যা সম্ভব হতে পারে। কাজকে যে পূর্বগামী কারণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়, তা দেখাতে আরো যুক্তির প্রয়োজন, যা আমরা পরে পরীক্ষা করে দেখব।

উদ্দেশ্যবাদী বক্তব্যের এই সমালোচনাকে তুলে ধরার আর একটি উপায় হচ্ছে এই বলা যে, কাজ বলে গণ্য গতির হেতুমূলক ব্যাখ্যার (reason-explanation) সঠিকতা আমাদেরকে কোন বিশেষ, অনন্য ও অপরিবর্তনীয় ধরনের 'ব্যাখ্যা' গ্রহণ করতে বাধ্য করে না। আমরা নিছক একটি বিশেষ ধরনের অবস্থা বা ঘটনার কথা ভাবতে পারি---যেমন নানা ধরনের হেতু, লক্ষ্য ও পরিণতিকে সামনে রাখার মানসিক অবস্থা যা গতিটাকে (পূর্বগামী নৈমিত্তিক

পরিস্থিতির পরিচিত অর্থে) সংঘটিত করে। শেষোক্ত বিকল্পের পথটি আমাদের জন্য এখনও খোলা ভরয়েছে।

(৫) কাজের প্রসঙ্গমূলক বিবরণ ঃ

এখন আমাদের যে তত্ত্বটি পরীক্ষা করতে হবে তার বক্তব্য অনুসারে কাজের অনন্য বৈশিষ্ট্য এই যে, তার মধ্যে কোন 'নিয়ম', 'আদর্শ', 'প্রচলিত রীতি,' 'মূলনীতি' অথবা 'মানদণ্ডের' সমষ্টির (some set of rules, norms,practices, principles, or standards) প্রতি একটা প্রচ্ছন্ন আবেদন রয়েছে, 'যাদের সাহায্যে কাজটিকে বর্ণনা করা হয় এবং মূল্যায়ন করা যেতে পারে'। এ তত্ত্বের প্রবক্তাগণকে প্রসঙ্গবাদী (Contexualists) বলব।[১]

একজন দাবা খেলোয়াড়ের একটি চাল-এর কথা চিন্তা করা যাক। দাবা সম্পর্কে অজ্ঞ কেউ হয়ত শুধু দেখেন যে, এক টুকরো কাঠ হাত দিয়ে একস্থান থেকে অন্যস্থানে সরানো হল। কিন্তু দাবা খেলা জানেন এমন কেউ লক্ষ্য করবেন যে, একজন 'খেলোয়াড়' এইমাত্র তার 'মন্ত্রীর' 'চাল' দিলেন। এখানে আমরা দাবার সেইসব নিয়মের মাধ্যমে বর্ণিত একটি কাজ পাচ্ছি, যেগুলোর দ্বারা নির্ধারিত হয় একজন 'খেলোয়াড়' কি, 'মন্ত্রী' কি, এবং অনুমোদনীয় চাল কি; কাজের বর্ণনার নিজের মধ্যেও দাবার নিয়মাবলীর উল্লেখ থাকে। অধিকন্তু, সেখানে মূল্যায়নের প্রতিও একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত রয়েছে। দাবা খেলার একটি কাজ হিসাবে এটি ভাল, মন্দ বা নিরপেক্ষ কাজ বলে গণ্য হয় সেইসব লক্ষ্যের মাধ্যমে যেগুলো আবার দাবা খেলার নিয়ম দ্বারাই নির্ধারিত হয়ে থাকে। এটা আশা করতে হবে যে, চালটি দিতে খেলোয়াড়ের কিছু 'যুক্তি' ছিল; যদিও কখনও কোন একটি চাল এলোমেলো হয়ে যেতে পারে, তথাপি যে ব্যক্তি সর্বদাই এলোমেলো চাল দেবে, সে যে দাবা খেলছে তা বলা কঠিন। এবং আমরা খেলোয়াড়টির যুক্তিটাকে ভাল, মন্দ বা নিরপেক্ষ বলে মূল্যায়ন করতে পারি। যে বৈশিষ্ট্য একে একটি বিশেষ কাজে পরিণত করে, যেমন একটি 'মন্ত্রীর চাল', তা হচ্ছে দাবার নিয়মের সাথে এর সঙ্গতি থাকা এবং ভাল দাবা খেলার মানদণ্ড সমূহের মাধ্যমে এর মূল্যায়িত হবার যোগ্যতা থাকা (its liability to evaluation)।

---

১ এ ধরনের মতবাদগুলোর সমর্থনের ব্যাপারে, Melden-এর *Free Action* এবং R. S. Peters-এর *The Concept of Motivation* (New York Humanities Press, 1958) দেখুন।

অন্যান্য ধরনের কাজের ক্ষেত্রেও একই মন্তব্য করা যায়। "বায়ে যাবার নির্দেশ দেয়া"—কে পথ চলার নিয়মের সাহায্যে, "উইল করা"—কে আইনগত এবং নৈতিক প্রসঙ্গের মাধ্যমে চিহ্নিত এবং সমর্থিত করা হয়। কোন একটি কাজকে "একটি নৈশভোজ প্রস্তুত করা" বলে বর্ণনা করা হচ্ছে পরোক্ষভাবে শিষ্টাচারের নিয়ম, রন্ধনবিদ্যার নিয়মাবলী, স্বাস্থ্য ও স্বাদের মানদণ্ড এবং মিতব্যয়ের নিয়মসমূহের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা। "যুক্তিটির বিষয়ে তোমার মতামত প্রদান" যুক্তিবিদ্যার নিয়ম, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি এবং সাধারণ যৌক্তিকতার প্রসঙ্গকে জড়িত করে। আদর্শক্ষেত্রে কাজ করার পেছনে যুক্তি থাকে, এবং যুক্তিগুলো নিয়ম, মানদণ্ড, রীতিমালা এবং মূলনীতির উল্লেখকে জড়িত করে।

একথা অস্বীকার করা যাবে না যে, বহু সংখ্যক কাজের বর্ণনার মধ্যেই নিয়মের প্রতি ইঙ্গিত থাকে। কিন্তু কাজ এবং দৈহিক গতির মধ্যে পার্থক্য দেখানোর উদ্দেশ্যে এই তথ্যের প্রতি আবেদন কোন কাজে আসবে না। কারণ, এমনসব ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে দৈহিক গতির বর্ণনার নিজের মধ্যেও নিয়মের প্রতি ইঙ্গিত থাকে। আমি যদি বলি যে, বলটি সঠিক ক্ষেত্রে গিয়ে পড়েছিল, তাহলে "বল" এবং "সঠিক ক্ষেত্র", এ পদগুলো স্পষ্টতঃই নিয়ম-নির্ভর; শুধু বেস বলের নিয়মাবলীর প্রসঙ্গেই এরূপ একটি বর্ণনা অর্থপূর্ণ হয়। কিন্তু স্পষ্টতঃই এটা (বলের সঠিক ক্ষেত্রে গিয়ে পড়া) একটা দৈহিক গতি মাত্র এবং কোন কাজ এখানে জড়িত নয়।

একথাও কি বলা যেতে পারে না যে, এমন অনেক সাধারণ কাজ আছে, যেমন 'কারো বাহু উঠানো', যা কোন নিয়ম বা আদর্শের প্রসঙ্গের উপর নির্ভরশীল নয়? আচ্ছা, একজন প্রসঙ্গবাদী হয়ত উত্তরে বলতে পারেন যে, "কারো বাহু উঠানো"—র মত বর্ণনাও কিছুটা প্রসঙ্গের উপর নির্ভরশীল। মনে করা যাক, আপনি কোন শ্রেণীকক্ষে আছেন এবং শিক্ষক একটি প্রশ্ন করলেন। সেই মুহূর্তে আপনার বাহু উপরে উঠে গেল, এবং আমরা মনে করি, এভাবে 'একটি' অভিপ্রায়মূলক কাজ সম্পাদিত হল। এটা কি সন্দেহাতীত যে, অভিপ্রেত কাজটির সঠিক বর্ণনা এই যে "আপনি আপনার বাহু উঠিয়েছিলেন"? মনে করা যাক, আপনি একটা মাছি ধরতে যাচ্ছিলেন অথবা শিক্ষককে সময় স্মরণ করিয়ে দিতে ঘড়ির দিকে নির্দেশ করছিলেন অথবা হাতটিকে কেবল প্রসারিত করছিলেন অথবা হাত দিয়ে কোন কিছু উপরে তুলছিলেন। আপনার কাজকে বাহু উঠানো বলে বর্ণনা করা কি ভুল হবে না? এমন হওয়াও কি সম্ভব নয় যে, আপনার বাহু উপরে উঠে যাওয়া 'অনভিপ্রেত' ছিল,

যদিও আপনি অভিপ্রায়মূলকভাবেই মাছিটি ধরতে গিয়েছিলেন? "কাজ"কে আমরা এ পর্যন্ত যে-অর্থে ব্যবহার করে আসছি, সে-অর্থে "কাজ" হচ্ছে অভিপ্রায়মূলকভাবে কিছু করার সংক্ষিপ্ত রূপ; কাজেই, উপরোক্ত সম্ভাবনাকে স্বীকার করে নিলে "আপনি আপনার বাহু উঠিয়েছিলেন"---উক্তিটি আপনার কাজের সঠিক বর্ণনা আর হবে না।

কিন্তু এই ব্যাপারটি দ্বারা যা পরিষ্কার হল তা এই নয় যে, "তিনি তাঁর বাহু উঠিয়েছিলেন", এ ধরনের কোন বর্ণনার যথোপযুক্ততা নিয়ম বা আদর্শের প্রসঙ্গের উপর নির্ভরশীল; বরং তা এই যে, এ ধরনের একটি বর্ণনার যথোপযুক্ততা হচ্ছে কাজের কর্তার 'অভিপ্রায়ের' উপরই নির্ভরশীল। এবং কেবল কারো বাহু উঠানোর চেয়ে আরো জটিলতর কাজের ক্ষেত্রে একথা আরও অধিক স্পষ্ট। আমরা দেখেছি যে, যে-ব্যক্তি এলোমেলোভাবে দাবার ঘুঁটিগুলো চাল দিয়েছিল সে যে দাবা খেলছিল তা বলা কঠিন, যদিও সৌভাগ্যক্রমে চালগুলো আশ্চর্যজনকভাবে চমৎকার হত।

এই বিষয়টিকে অন্যভাবেও দেখানো যেতে পারে। কোন কাজের বর্ণনার ক্ষেত্রে নিয়ম বা আদর্শের প্রয়োগের প্রশ্ন যখন আসে, তখন আমাদের এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে যে, যেগুলো যথোপযুক্ত সেগুলোই আমরা প্রয়োগ করছি। এবং নিয়ম ও আদর্শের যথোপযুক্ততা নির্ভর করবে কাজের কর্তা সেই নিয়ম বা আদর্শ অনুসারে কাজ করার অভিপ্রায় করেছিল কিনা।

তাহলে সমস্যাটি হল 'অভিপ্রায়'-এর একটি বিবরণ দেয়া। যদি সেগুলো মানসিক অবস্থা বা ঘটনা হয়, তাহলে আমরা প্রথমে যে মতবাদটি পরীক্ষা করেছিলাম সেখানে ফিরে এসেছি---যেখানে কাজ হচ্ছে মানসিক কারণসম্পন্ন গতিবিধি। যদি প্রসঙ্গবাদীকে তার অভিমতের প্রমাণ দিতে হয়, তাহলে তাকে নিশ্চয়ই অভিপ্রায়ের একটি প্রসঙ্গমূলক ব্যাখ্যা দিতে হবে।

ধরা যাক সে বলল যে, অভিপ্রায়মূলকভাবে কাজ করা বা কোনভাবে কাজ করার অভিপ্রায় করা হল কাজটিকে 'সমর্থন' করার জন্য 'যুক্তি' দেয়ার প্রস্তুতি। যুক্তি দেয়া হচ্ছে কাজটি ঘটার ফলে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি কিভাবে অপেক্ষাকৃত ভাল অবস্থায় পৌঁছাবে তা দেখানো। "বিষয়াদি অপেক্ষাকৃত ভাল" বলে একজন যা চিন্তা করে তা অবশ্য একজন কি চায় তার উপর নির্ভর করে; এবং কাজটিকে পছন্দ করা এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করবে যে, কাজটি তার অভাবসমূহের পরিতৃপ্তি ঘটাবে। সুতরাং, কারো যুক্তি যে মন্দ বা ভাল হবে তা নির্ভর করে প্রাসঙ্গিক চাওয়া ও বিশ্বাস কতটুকু যুক্তিপূর্ণ হবে বা হবে না।

তার উপর। কিন্তু এই মতবাদ অনুসারে একটি কাজকে যা অভিপ্রায়মূলক করে তা হচ্ছে---কাজটিকে যা সমর্থনযোগ্য করতে পারে সে-রকম তথ্য ও মূল্যের প্রতি আবেদন করে কর্তা কাজটির সপক্ষে যুক্তি উত্থাপন করতে এবং তার সপক্ষে দাঁড়াতে প্রস্তুত থাকবে। এমন নয় যে, কোন ব্যক্তিকে কাজটির উপযুক্ততা চিরকালের জন্য সমর্থন করতে হবে, কারণ কেউ এর উপযুক্ততা সম্পর্কে তার মন পরিবর্তন করতে পারে, কিন্তু কাজটি করার সময় বা কাজটি করার অভিপ্রায় করার সময় এর উপযুক্ততা সমর্থন করার জন্য একজনকে প্রস্তুত থাকতে হবে।

অভিপ্রায়ের এই ধরনের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গবাদীর কোন একটি অ-কারণিক ব্যাখ্যা দেয়ার প্রয়াসকে সমর্থন দিচ্ছে বলে মনে হতে পারে যেহেতু এ রকম মনে হয় যে, একটি কাজের জন্য 'সমর্থনকারী যুক্তি' দেয়ার অর্থ হচ্ছে সেই কাজের কোন 'কারণিক ব্যাখ্যা' দেয়া থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন কিছু করা। কারণিক ব্যাখ্যায় পূর্বগামী ঘটনাবলী এবং অভিজ্ঞতামূলক নিয়মাবলীর ওইসব দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা হয় যেগুলো সেসব ঘটনার সাথে পরবর্তী ঘটনাকে সম্বন্ধযুক্ত করে; অপরপক্ষে, ব্যাপারগুলো যে রকম হওয়া 'উচিত', কাজটি যে তারই একটা দৃষ্টান্ত তা দেখানোই পূর্বোক্ত প্রক্রিয়ার কাজ। সুতরাং, মনে হয় যে, আমরা যদি অভিপ্রায়মূলক কাজগুলোর বৈশিষ্ট্য দেখাতে গিয়ে তাদেরকে সেই ধরনের কাজ বলে উল্লেখ করি যেগুলোকে ন্যায্যতা-প্রদর্শনের প্রসঙ্গে ব্যক্তি সমর্থন করতে প্রস্তুত, তাহলে তাদের কারণসমূহের দ্বারা তাদের বৈশিষ্ট্য নিরূপণের কাজ এড়াতে পারি, অন্যান্য মতবাদ আমাদের যে-কাজ করতে প্রণোদিত করে।

প্রসঙ্গবাদীর পক্ষে এটা দুর্ভাগ্যজনক যে, এই ব্যাখ্যা চলবে না। কারণ, এমন হওয়া সম্ভব যে, 'অনভিপ্রেত' কোন কিছুও ঘটতে পারে যা তা সত্ত্বেও সঠিক আদর্শসমূহের উপযোগী হতে পারে; এবং এমনও হতে পারে যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সেই আদর্শ সমূহের মাধ্যমে সেই ঘটনার উপযুক্ততা সমর্থন করতে প্রস্তুত। উদাহরণস্বরূপ, এমন একজন দাবা খেলোয়াড়ের কথা বিবেচনা করা যাক, যে একটি চাল দিতে সিদ্ধান্ত নিল, যাকে সে সঠিক চাল বলে বিশ্বাস করে এবং যার জন্য সে চমৎকার যুক্তি দিতে প্রস্তুত, কিন্তু চালটি দেবার পূর্বে সে একটা আকস্মিক অথচ ক্ষণস্থায়ী তীব্র বেদনার আক্রমণ বোধ (paroxysm) করল, যখন সে যে-ঘুঁটিকে চালবার অভিপ্রায় করেছিল তার হাত সেটাকে ধাক্কা দিয়ে ঠিক সেই ঘরেই ঠেলে দিল যে-ঘরে সে চালটি দেয়ার অভিপ্রায়

করেছিল। সুতরাং, একটি চমৎকার চাল হল, এবং সে এই চালটিকে সমর্থন করতে প্রস্তুত কিন্তু সে 'অভিপ্রায়মূলকভাবে' এই চালটি দেয় নি। আমি স্বীকার করি যে, এ ঘটনা-পরম্পরা অনেকটা অদ্ভুত, কিন্তু তবুও এটা সম্ভব, এবং এর থেকে আমাদের কিছু শেখার আছে। কারণ, এর থেকে যা দেখা যায় তা এই যে, কাজটি করার ব্যাপারে কারোর কোন যুক্তি থাকাই কাজটির অভিপ্রায়মূলক হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট নয়। এটাও অবশ্য সত্য যে, কারো যুক্তি পার্থক্যের সৃষ্টি করে, সেগুলো কাউকে কাজটি করার দিকে 'ধাবিত' করে এবং কেউ সেসব যুক্তির 'জন্য' কাজটি করে, সেসব যুক্তির 'কারণে' তা করে, এবং যদি সেই যুক্তিগুলোর অনুপস্থিতি ব্যতীত পরিস্থিতি একই থাকত, তাহলে কেউ তা করত না। কারো যুক্তিগুলোকে অবশ্যই ক্রিয়াশীল (operative) হতে হবে; সেগুলো অবশ্যই কাজ করবে।

আমরা যখন কোন এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলি যে, সে শুধু "যুক্তি দেখাচ্ছে" অথবা কোন একটি "যৌক্তিকীকরণ" (rationalization) সম্পাদন করছে মাত্র, তখন আমরা প্রায়ই বুঝাই যে, সে তার কাজের জন্য যে-যুক্তিগুলো দিচ্ছে সেগুলো অর্থপূর্ণ হতে পারে, কিন্তু সেগুলো তার "প্রকৃত" যুক্তি ছিল না এবং সেগুলো প্রকৃতপক্ষে কাজটি করার দিকে তাকে ধাবিত করে নি। "যৌক্তিকীকরণ" --এর এ অর্থে আমরা প্রসঙ্গবাদের বিপক্ষে আমাদের সবচেয়ে মৌলিক সমালোচনা উপস্থিত করতে পারি এই বলে যে, তা কোন ব্যক্তির যুক্তি এবং যৌক্তিকীকরণের পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে পারে না।

যুক্তি ও কারণ

সবকটি প্রধান তত্ত্ব সম্পর্কেই আমরা নানাবিধ অসুবিধা লক্ষ্য করেছি। কিন্তু প্রসঙ্গমূলক তত্ত্ব (contexualism) সম্পর্কে আমরা যে সর্বশেষ সমালোচনাটি করেছি, অর্থাৎ, অভিপ্রায়মূলক কাজের মধ্যে কোন ব্যক্তির যুক্তি অবশ্যই কোন একটা পার্থক্যের সৃষ্টি করবে তারই আলোকে মানসিক কারণ-তত্ত্ব সম্পর্কে আমরা এ পর্যন্ত যে আলোচনা করেছি তার অধিক আরও কিছু বলার রয়েছে। এ সমালোচনা যদি সত্য হয়, তাহলে তা এরূপ বলার মত হবে যে কোন ব্যক্তির যুক্তি কারণিকভাবে অবশ্যই কার্যকর হবে---এ রকম সন্দেহ করা সঙ্গত মনে হয়।

'কাজ' এবং যে বাসনা ও বিশ্বাস কাজের সপক্ষে 'যুক্তি' তৈরী করে তাদের

মাঝখানে "অভীপ্সা"-র উপস্থিতি (intervening presence of "volitions") তাদের সম্পর্ককে জটিল করে তোলে (উপরে, পৃঃ ১১৯-২০ দেখুন)। কখনও কখনও অন্তর্দৃষ্টভাবে প্রত্যক্ষণযোগ্য সিদ্ধান্ত, পছন্দ-ক্রিয়া, বা অভিপ্রায়-সৃষ্টি কাজের পূর্বগামী হয়; কখনও কখনও যথাযথ শর্তের অধীনে সঠিকভাবে কাজ সম্পাদনের প্রবণতা সৃষ্টিই কাজের পূর্বগামী হয়। যদি কেউ এ মত পোষণ করে যে, কারো যুক্তি তার কাজকে 'সংঘটিত করায়', তাহলে যখন কাজ করার কোন সিদ্ধান্ত বা প্রবণতা থাকবে তখন কেউ মনে করবে যে, সেই ব্যক্তির যুক্তি তার সিদ্ধান্ত বা প্রবণতার কারণ, যে সিদ্ধান্ত বা প্রবণতা আবার কাজের ও কারণ। যদিও, যখন যুক্তির সাথে সিদ্ধান্ত বা প্রবণতার সম্পর্কের কথা আমরা আলোচনা করি তখন আমরা প্রায়ই বলি যে, কারো যুক্তি এটা করার সিদ্ধান্ত বা ওটা করার প্রবণতার দিকে তাকে পরিচালিত করেছিল, তথাপি কোন্ জিনিসটা তাকে এ সিদ্ধান্ত নিতে বা ওটা করার জন্য প্রবৃত্ত হতে 'বাধ্য করেছিল' তাও আমরা প্রায়ই উল্লেখ করি। কাজ যুক্তি দ্বারা 'সংঘটিত হয়--এ কথা বলার যদি উত্তম যুক্তি থাকে, তাহলে সিদ্ধান্ত বা প্রবণতার উপস্থিতি কার্য-কারণ 'শৃঙ্খলে' অতিরিক্ত উপাদান যুক্ত করে কারণ সম্পর্কিত উপাখ্যানকে জটিল করে তোলে; কিন্তু যুক্তিকে কারণ হিসাবে সমর্থন বা প্রত্যাখ্যান করার ব্যাপারে এর মধ্যে যে কোন অতিরিক্ত ভিত্তি পাওয়া যায় তা আমার মনে হয় না।

আলোচনার ভিত্তি হিসাবে কাজ করবে এমন একটা নির্দিষ্ট দৃষ্টান্ত দিতে হলে মনে করা যাক, হঠাৎ করে আমি আমার মাথাকে আমার দুই পায়ের মাঝখানে স্থাপন করলাম। পরে, আপনি আমাকে প্রশ্ন করলেন আমি কেন তা করলাম, এবং আমি উত্তরে বললাম, "কারণ আমার মনে হয়েছিল আমি মূর্ছা যাচ্ছিলাম"। এখানে একটা অভিপ্রায়মূলক কাজের পক্ষে আপনাকে আমার যুক্তি দিলাম। প্রকৃতপক্ষে, যুক্তি দেয়ার সময় সচরাচর আমরা যেমন করি তেমনিভাবে, আমি আমার যুক্তির একটা অংশ উল্লেখ করলাম মাত্র---বাকিটুকু নিতান্তই স্পষ্ট। কিন্তু মনে করুন আপনি তেমন কোন যোগাযোগ লক্ষ্য করছেন না এবং বললেন, "তাই কি? আমি উত্তর দিলাম,"হাঁ--আমি মনে করেছিলাম আমি প্রায় মূর্ছা যাচ্ছিলাম, আমি নিজেকে মূর্ছা যাওয়া থেকে রক্ষা করতে চেয়েছিলাম, এবং আমার ধারণা যে, মাথাকে পায়ের মাঝখানে রেখে মূর্ছা রোধ করা যায়।" ওভাবে নড়ার সময় আমার যেসব 'বিশ্বাস' ও বাসনা দেখা দিয়েছিল সেগুলোকে আমি উল্লেখ করি। কিন্তু আমি

'এগুলোকেই' বেছে নিই কেন? সে-সময়ে নিশ্চিতভাবেই আমার অন্যান্য বাসনা ছিল (সম্ভবতঃ বাড়ী ফেরার বাসনাও আমার হয়েছিল, কিন্তু সে-কারণে আমি আমার মাথা নীচু করে ফেলি নি) এবং অন্যান্য বিশ্বাসও ছিল। আমার কাজের "যুক্তি" হিসাবে এসব বাসনা ও বিশ্বাস উল্লেখের অর্থ কি?

কাজের পক্ষে আমার 'যুক্তিগুলো' উল্লেখের অর্থ হচ্ছে ওইসব বিশ্বাস বা বাসনাকেই উল্লেখ করা যেগুলো 'কার্যকর', যেগুলো আমার এভাবে কাজ করার জন্য দায়ী, এবং যেগুলো এমন ছিল যে সে-সময়ে সেগুলো না থাকলে আমি ওইভাবে কাজটি করতাম না। এখানে কি আমরা একদিকে এসব বিশ্বাস ও বাসনা এবং অন্যদিকে আমার কাজের মধ্যে এমন একটা সম্বন্ধ পাচ্ছি না, যাকে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে কারণিক সম্বন্ধের শ্রেণীভুক্ত করা হয়?

পূর্বোক্ত পর্যালোচনার আলোকে মনে হয় যে, কোন কাজ সম্পাদনের জন্য কারো যুক্তি (কারো যৌক্তিকীকরণের প্রচেষ্টা থেকে ভিন্ন) কাজটি উৎপাদনে কারণিকভাবে অবশ্যই কার্যকর হবে। যা হোক, অনেক সমসাময়িক দার্শনিকই এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন। তাঁরা এই অজুহাতে যুক্তিকে কারণ মনে করেন না যে, কার্য ও কারণ-এর মধ্যবর্তী সম্পর্ক থেকে যুক্তি ও কাজের মধ্যবর্তী সম্পর্কটি নিতান্ত ভিন্নতর। যুক্তি-ও-কাজ (reason-action) এবং কার্য কারণ-এর (cause and effect) মধ্যে তিনটি কথিত পার্থক্য আমরা পরীক্ষা করে দেখব: (১) কার্য ও কারণ যৌক্তিকভাবে একে অপরের থেকে অবশ্যই স্বাধীন হবে, কিন্তু যুক্তি ও কাজ এরূপ নয়; (২) কার্য-কারণ সম্পর্ক সার্বিকীকরণ-এর (generalisations) উদাহরণ হতেই হবে, কিন্তু যুক্তি ও কাজ-এর সম্পর্ক এরূপ নয়; (৩) কেবল আরোহী প্রমাণের (inductive evidence) ভিত্তিতেই কারণিক সম্পর্ক জানা যেতে পারে, কিন্তু কোন ব্যক্তি তার কাজের পক্ষে যুক্তিগুলোকে এ ধরনের প্রমাণ ছাড়াই জানতে পারে।[১]

(১) প্রায়ই বলা হয়ে থাকে যে, কারণ এবং তার কার্য অবশ্যই এমনভাবে একে অন্যের থেকে যৌক্তিক দিক দিয়ে স্বাধীন হবে যে, একটির অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব যেন কোনক্রমেই যুক্তির দিক থেকে অন্যটির অস্তিত্ব বা অনস্তিত্বকে অনিবার্য ফল স্বরূপ না ঘটায়। যা হোক, প্রায়ই দাবী করা হয় যে, কোন

১ এগুলো এবং এ ধরনের অন্যান্য প্রয়াসের পূর্ণতর আলোচনার জন্য Donald Davidson-এর এই প্রবন্ধটি, যার কাছে আমি খুবই ঋণী, দেখুন: "Actions, Reasons, and Causes", The Journal of Philosophy, ৬০, নং ২৩ (১৯৬৩), ৬৮৫—৭০০, বিশেষভাবে ৬৯৩—৭০০।

কাজের যুক্তি কাজটি থেকে যৌক্তিকভাবে স্বাধীন নয়।[১] এই দাবী সেই তর্কাতীত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত যে, কোন বিশেষ উপায়ে কাজ করার যুক্তিগুলোর বর্ণনার মধ্যেই সেই কাজটির উল্লেখ থাকতে হবে, যেহেতু যুক্তিগুলো হচ্ছে, অনিবার্যভাবে, অমুক অমুক কাজ করার জন্যই যুক্তি। এভাবেই কথিত কারণটির বৈশিষ্ট্যের বিবরণ কথিত কার্যফলটির বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভরশীল। এর থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, যুক্তি ও কাজ যৌক্তিকভাবে স্বাধীন নয়, সুতরাং তারা কার্যকারণরূপে সম্পৃক্ত হতে পারে না।

এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, কার্য-কারণের এমন অনেক সাধারণ দৃষ্টান্ত আছে যেখানে বর্ণনাগুলো যৌক্তিকভাবে স্বাধীন নয়। "রৌদ্রে তামাটে হয়ে যাওয়া (suntans) সূর্য দ্বারা সংঘটিত হয়," উক্তিটি এমনই একটি দৃষ্টান্ত; এখানে কার্যফলের বৈশিষ্ট্য তার কারণ দ্বারা নির্ধারিত। "ক্ষয়রোগের (tubereulosis) কারণ ক্ষয়-জীবাণু"---এখানে কারণের বৈশিষ্ট্য তার কার্যফল দ্বারা নির্ধারিত। তবুও উভয়ক্ষেত্রেই আমরা একটা প্রকৃত কার্য-কারণ সম্পর্ক পাচ্ছি।

যা হোক, একটি সমস্যা তবুও থেকে যায়, কারণ, "রৌদ্রে তামাটে হওয়া সূর্য দ্বারা সংঘটিত হয়" এ দৃষ্টান্তটির কথা উল্লেখ করলে, আমরা "রৌদ্রে তামাটে হওয়া"—কে 'অন্য একটি বর্ণনা' দ্বারা প্রতিস্থাপন করতে পারি, যেমন, অকৃত্রিমভাবে উৎপাদিত তামাটে রঙ" (non-artificially induced tans), যা আমাদিগকে কারণ-এর উল্লেখ না করেই ঐ কারণিক সম্পর্ককে উল্লেখ করতে দিবে। সাধারণতঃ যখন দুই ধরনের ঘটনা কারণিকভাবে সম্পৃক্ত হয় তখন আমরা তাদের এমন কিছু বর্ণনা পেতে পারি যা কোন চক্রকদোষ না ঘটিয়েই (without begging any questions) তাৎপর্যপূর্ণ কারণিক সম্পর্কটি প্রদর্শন করে।

কিন্তু যুক্তির ক্ষেত্রে, যে কাজটি সম্পাদন করা হবে তার বর্ণনা (description) 'নিশ্চয়ই' যুক্তিগুলোর বিবৃতিতেই প্রকাশ লাভ করবে, নতুবা 'সে-কাজটি' করার পক্ষে সে-গুলো কোন যুক্তিই হবে না। অবশ্য, যে-কোন বিশেষ ক্ষেত্রে, আমরা কখনও কখনও কোন বর্ণনার সাহায্যে সেইসব যুক্তিকে বেছে নিতে পারি যেগুলো কাজের কোন উল্লেখ করে না (যেমন, সেইসব যুক্তি যেগুলো সে বেলা ১টা থেকে ১-১৫ মিনিটের মাঝে বিবেচনা করেছিল), কিন্তু এমন কোন

---

১ Melden-এর *Free Action*, অধ্যায়—১২ দ্রষ্টব্য। অভীপ্সার ধারণার বিপক্ষের যুক্তিটিতে Melden কর্তৃক (উপরে উদ্ধৃত, পৃ: ১১৯—২২) একই নীতি ব্যবহৃত হয়েছে।

নিশ্চয়তা নেই যে আমরা সর্বদাই সেরূপ করতে পারব। অধিকন্তু, আমরা যদি তা করতাম, তাহলে আমরা আর কাজের কোন 'ব্যাখ্যা' (explanation) পেতাম না।

কাজটির প্রতি নির্দেশ না করে ঐ যুক্তিগুলো উল্লেখ করতে আমরা সক্ষম নাও হতে পারি, এ কথা সত্য হওয়া সত্ত্বেও অভিযোগটি ব্যর্থ হয়ে যায়। কারণ, যুক্তিগুলোর বৈশিষ্ট্য দেখাতে গিয়ে যখন কাজটির উল্লেখ করা হয়, তখন এ ধরনের কোন ইঙ্গিত থাকে না যে কাজটি ঘটবে। কোন কিছু করার জন্য হয়ত জগতের সর্বোত্তম যুক্তিসমূহ আমার থকেতে পারে, কিন্তু তবুও কাজটি নাও ঘটতে পারে; কারণ, কাজটির সম্পাদন থেকে আমাকে বিরত রাখা হতে পারে। এবং কাজটি যদি ঘটেই, তাহলে এর অর্থ এই নয় যে সেসব যুক্তি বা অন্য কোন বিশেষ যুক্তি-সমষ্টির জন্য কাজটি করা হয়েছিল। কোম্পানীর কাগজাদি কেনা-বেচার একটা উঠতি বাজারের (a rising stock market) প্রত্যাশার কথা বিবেচনা করা যাক। এই প্রত্যাশার বর্ণনা করতে আমাদের অবশ্যই কোম্পানীর কাগজাদি কেনা-বেচার উঠতি বাজারকে উল্লেখ করতে হবে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে বাজারটি উঠতিই থাকবে, অথবা কোন উঠতি বাজারও তার সম্পর্কে কোন প্রত্যাশার ইঙ্গিত দেয় না। সুতরাং, একটি উঠতি বাজার সম্পর্কে প্রত্যাশা এবং একটি উঠতি বাজারের ধারণা এই দিক দিয়ে যৌক্তিকভাবে স্বাধীন যে, কোন একটির অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব কোনক্রমেই অন্যটির অস্তিত্ব বা অনস্তিত্বের জন্য অপরিহার্য নয়। সুতরাং, এ দুটির মধ্যে কারণিক সম্পর্কের অস্তিত্বকে বাধা দেয়ার মত কিছুই থাকছে না। এবং এটা জানা যে, এ দুটির মধ্যে বস্তুতঃই একটি কারণিক যোগাযোগ রয়েছে।

একইভাবে, কোন একটা কাজ করার জন্য আমার যুক্তির অস্তিত্ব কোনক্রমেই এটা বোঝায় না যে কাজটি ঘটবে, এবং উল্টোভাবেও কথাটা সত্য। "(কোন কিছুর) প্রত্যাশার" মত, "(কোন কিছুর জন্য) যুক্তি" হচ্ছে এমন একটি "অভিপ্রায়মূলক" ধারণা* (৩২ পৃঃ দ্রষ্টব্য), যে-ধারণায় কোন কিছুর প্রতি আভ্যন্তরীণ উল্লেখ থাকে, কিন্তু এতে যা উল্লেখ করা হয় তার থেকে এটি যৌক্তিকভাবে স্বাধীন, এবং সেজন্য যা উল্লেখ করা হয় তার সাথে এটি কারণিকভাবে যুক্ত হতে পারে।

---

* Like "expectation of", "reason for" is an "intentional" notion

যেহেতু কোন ব্যক্তির যুক্তি আদর্শিকভাবে তার সে-সময়ের 'বিশ্বাস' ও 'বাসনা' দিয়ে তৈরী, সেহেতু এটা দেখানো উচিত হবে যে এগুলোও কাজ থেকে যৌক্তিকভাবে স্বাধীন। আমি যে 'বিশ্বাস' করছি যে, আমি প্রায় মূর্ছা যাচ্ছি এবং আমার মাথা আমার দুই পায়ের মাঝখানে রাখলে মূর্ছা রোধ করা যাবে, তার থেকে এটা কোনক্রমেই অনুসৃত হয় না যে, আমার মাথা আমার পায়ের মাঝখানে রাখব, এবং বিপরীতভাবেও কথা সত্য। একইভাবে, আমি যে মূর্ছা থেকে নিজেকে বিরত রাখতে 'চাই', তার থেকে কোনক্রমেই এটা অনুসৃত হয় না যে, আমি আমার মাথাকে আমার পায়ের মাঝখানে রাখব। এমনকি, বিশ্বাস এবং বাসনা একত্রভাবেও আমার কোন কাজকে অপরিহার্য করে তোলে না। কিংবা অন্য কোন বিশ্বাস বা বাসনা যা আমি যোগ করতে পারতাম, সেগুলোও কাজটিকে অপরিহার্য করে তোলে না।

কোন কোন দার্শনিক মনে করেন যে, যুক্তি এবং গতিকে সম্পর্কিত করে এমন অত্যন্ত সাধারণ (general) অনিবার্য উক্তি রয়েছে। তাঁরা মনে করেন যে, যুক্তি যে 'কখনোই' গতির সৃষ্টি করে না তা হতে পারে না; এমন হতে পারে না যে, কোন কিছু করার জন্য লোকের মনে সর্বোত্তম যুক্তি থাকা, না করার কোন যুক্তি না থাকা, এবং তা করা থেকে তাদের বিরত করার মত কিছুই না থাকা সত্ত্বেও তারা সেটি কখনোই করে নি। কিন্তু আমি ভিন্নতর মত পোষণ করি। কোন ব্যক্তির আত্মহত্যা করার ইচ্ছার কথা বিবেচনা করুন--অনেকেরই যুক্তি ও সুযোগ আছে, কিন্তু তারা তা করে না।

অবশ্য, কাজের এমন কিছু বর্ণনা রয়েছে যেগুলো যৌক্তিকভাবে কিছু যুক্তির অস্তিত্ব নির্দেশ করে। আমি যদি রুটির জন্য ভাঁড়ার ঘরের দিকে যাই, তাহলে আমার কাজের যুক্তি হল রুটি পাওয়া। এটা স্বীকার করতে হয় যে, এখানে কার্য-কারণ-এর (cause and effect) কথা বললে তা উদ্ভট শোনাবে। কিন্তু আমরা যদি কাজটির বর্ণনা থেকে যুক্তিকে (যথা, রুটির যুক্তি) বাদ দিই, তাহলে কার্য-কারণ সম্পর্কের কথা বলায় কোন উদ্ভটতা নেই। আমি যে ভাঁড়ার ঘরের দিকে গিয়েছিলাম তা অনিবার্যভাবে নির্দেশ করে না যে, আমি ভাঁড়ার ঘরের দিকে যেতে চেয়েছিলাম —আমি হয়ত মদের দোকানে যেতে চেয়েছিলাম, এবং ভাঁড়ার ঘরকে মদের দোকান বলে ভুল করেছিলাম।

(২) সাধারণতঃ যখন কোন পূর্বগামী অবস্থার সাহায্যে আমরা কোন ঘটনার কার্য-কারণ সম্পর্কের ব্যাখ্যা পাই, তখন আমরা ব্যক্ত বা অব্যক্তভাবে একটা সাধারণীকরণের প্রতি আবেদন করি, যা কার্য-কারণকে যুক্ত ক'রে

এটা উল্লেখ করে যে, যখনই পূর্বগামী অবস্থার উপস্থিতি থাকে তখনই ঘটনাটি অনুসরণ করে। একথা স্পষ্ট যে, যুক্তি ও কাজ এ শর্ত পূরণ করে না। আমি মূর্ছার ভাব অনুভব করলে 'সর্বদাই' আমার মাথাকে আমার দুই পায়ের মাঝখানে রাখতাম না; দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমি যদি ড্রিল-এর মাঠে থাকতাম। এর থেকে কোন কোন দার্শনিক এই সিদ্ধান্ত করেন যে, এখানে আমরা কোন কার্য-কারণ সম্পর্ক পাই না।[১]

উত্তরে, দুটি মন্তব্য করা উচিত হবে। প্রথমতঃ, এমন-কি অবিতর্কের কারণিক যোগাযোগের ক্ষেত্রেও, আপাত-দৃষ্টিতে যুক্তিপূর্ণ কোন সাধারণীকরণ-এর উদাহরণ আমরা প্রায়ই দিতে পারি না। একটি পাথরের আঘাত লেগে যদি কোন একটি জানালা ভেঙ্গে যায়, আমরা কি সবসময় এটা বলার মত অবস্থায় থাকি যে, যখনই সে-ধরনের একটি জানালা সেই গতিসম্পন্ন ঐ আকারের একটি পাথর দ্বারা আঘাত-প্রাপ্ত হয় তখনই জানালাটি ভাঙ্গবে? এমনকি, যখন আমরা কোন নির্দিষ্ট সাধারণীকরণ-এর উদাহরণ দিতে পারি না, তখনও কি আমাদের বিন্দুমাত্র সংশয় থাকে যে জানালাটিতে পাথরের আঘাতই সেটা ভেঙ্গে যাওয়ার কারণ ছিল? পাথরটি যে জানালাটি ভেঙ্গে যাওয়ার কারণ, সে-ক্ষেত্রে কোন নিয়ম উল্লেখ করতে সক্ষম না হওয়া সত্ত্বেও আমরা যদি কোন কার্য-কারণ সম্পর্ক স্বীকার করতে ইচ্ছুক হই, তাহলে সেখানে কোন সার্বিকীকরণ পাওয়া যাচ্ছে না, নেহায়েত এই কারণে যুক্তি ও কাজের মাঝে কারণিক সম্পর্ককে বাদ দেয়া উচিত হবে না।

দ্বিতীয়তঃ, যদিও যুক্তি এবং কাজকে যুক্ত করার কোন সরল সূত্র (simple) নেই, তবুও এমনসব জটিল সূত্র থাকতে পারে যা সেগুলোকে 'অন্তর্ভুক্ত করে।' আমি যখন আমার মাথাকে আমার দুই পায়ের মাঝখানে রাখার কাজটি করি, তখন নিশ্চিতভাবেই আমার যুক্তির একটি অংশ হচ্ছে এই যে, আমি বিশ্বাস করছি আমি ড্রিলের মাঠে নই, এবং সে-কারণে আমি বিশ্বাস করছি আমার কাজ কোন প্রতিকূল ফলাফল সৃষ্টি করবে না, ড্রিলের মাঠে থাকলে যেমন হত। যখন আমি কাজের জন্য আমার যুক্তি দিই, তখন আমি বিষয়টার অংশ মাত্র দিই; আমাকে যদি পুরো বিষয়টি উল্লেখ করতে হত, তাহলে সম্ভবতঃ আমরা এমনকিছু পেতাম যা ঐকটি নিয়মানুগ সাধারণীকরণকে সমর্থন করত।

---

১ H. L. A. Hart and A. M. Honore, *Causation in the Law* (নিউইয়র্ক : অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৫৯), পৃঃ ৫২।

এ ধরনের একটি সাধারণীকরণ-এর এই আকার হবেঃ যখনই কোন ব্যক্তির অমুক-অমুক বাসনা ও বিশ্বাস থাকবে এবং সে এই-এই পরিস্থিতিতে থাকবে (শেষোক্তটির প্রয়োজন এজন্য যে একজন ব্যক্তি তার পরিস্থিতির দরুণ কাজ করা থেকে বিরত থাকতে পারে, যদিও এভাবে কাজ করার সব রকম যুক্তিই তার রয়েছে), তখনই সে এই-এই ভাবে কাজ করবে। এমন-কি ওই রকমের একটি সাধারণী-করণও সর্বকালের সকল মানুষের বেলায় সত্য নাও হতে পারে। হয়ত তা কেবল বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের ক্ষেত্রে, অথবা মানুষ যখন 'বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন' হয়ে ওঠে তখন তাদের ক্ষেত্রে সত্য। একে সব ক্ষেত্রেই সত্য করতে হলে যে রকমের ব্যক্তির বেলায় এটি প্রযোজ্য তাদের একটা অতিরিক্ত বিবরণ যোগ করা প্রয়োজন হতে পারে। কিন্তু এখানে এমন কোন বৈশিষ্ট্য আছে বলে মনে হয় না, সাধারণ কার্য-কারণ সম্পর্কের মধ্যে যার কোন তুলনা নেই।

(৩) যুক্তি ও কাজের ক্ষেত্রে সাধারণ কার্য-কারণ সম্পর্কের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের অভাব রয়েছে বলে মনে হয়। সাধারণ ক্ষেত্রে, ক যে খ-এর 'কারণ' এবং নেহায়েত দৈবক্রমে খ-এর পূর্বগামী নয় তা জানার জন্য অবশ্যই 'প্রমাণ' থাকতে হবে; এবং এই প্রমাণ অবশ্যই সদৃশ দৃষ্টান্তসমূহের অভিজ্ঞতার আকারে হবে, অথবা, জটিলক্ষেত্রে, আরও ব্যাপক ধরনের অনু-মানভিত্তিক যুক্তির আকারে হবে। কিন্তু মনে হয় যে, বহু ক্ষেত্রেই যেখানে কাজের কর্তা একটা বিশেষ যুক্তির ভিত্তিতে কাজ করে সেখানে সদৃশ দৃষ্টান্তের অথবা অন্য ধরনের অনুমানভিত্তিক যুক্তি ব্যতিরেকেই সে জানতে পারে তার কি যুক্তি ছিল। যেমন, কোন ব্যক্তি যখন প্রথম বিদ্যুৎ-চমকানো দেখে এবং তারপর বজ্রধ্বনি শোনে তখন তার সম্পর্কে একথা বলা যায় না যে, সে 'জানে' যে বিদ্যুৎ-চমকানো বজ্রধ্বনিকে সংঘটিত করেছিল—কেননা, এমন আরও অনেক কিছু বজ্রধ্বনির পূর্বগামী হয়ে ছিল যা এর কারণ হতে পারত। বিদ্যুৎ-চমকানোর পর বজ্রধ্বনি সংঘটিত হওয়ার অনেক অভিজ্ঞতা, এবং সম্ভবতঃ আরও কিছু তাত্ত্বিক তথ্য থাকার পরই কেবল বলা যায় যে, সেই ব্যক্তি জানছে বিদ্যুৎ-চমকানোই বজ্রধ্বনিকে সংঘটিত করেছে। কিন্তু এমন হতে পারে যে, অনেক ক্ষেত্রে, যেখানে একজন কাজের কর্তা কোন বিশেষ যুক্তিতে কাজ করেছে, সেখানে সদৃশ দৃষ্টান্তের অভিজ্ঞতা অথবা আরও তাত্ত্বিক তথ্য ছাড়াই সে জানতে পারে ঐভাবে কাজ করার পিছনে তার কি কারণ বা যুক্তি ছিল। কোন লোকের মাথা তার দুই পায়ের মাঝখানে রাখার

পর তার মূর্ছা যাওয়ার অনুভূতি হয়েছিল, এমনসব ঘটনার প্রতি আবেদন ছাড়াই আমি জানতে পারি যে, আমি মূর্ছার ভাব অনুভব করেছিলাম বলেই আমি আমার মাথাকে আমার দুই পায়ের মাঝখানে রেখেছিলাম। আমি আমার মাথা নীচু করার পূর্ববর্তী সময়ে আমার মাঝে হয়ত নানা ধরনের বাসনা এবং বিশ্বাসও ছিল; কিন্তু অন্য আর কোন অভিজ্ঞতা ছাড়াই আমি জানছি যে ঐভাবে কাজ করার পিছনে আমার যুক্তি ছিল মূর্ছা যাওয়াকে এড়ানো এবং, যদি এমনও হত যে আমার জীবনে এই প্রথম আমি মূর্ছার ভাব অনুভব করেছি এবং আমার মাথাকে নীচু করেছি, তবু আমি তা জানতে পারি। মূর্ছা যাওয়ার পূর্বে কিভাবে মানুষ আচরণ করে অথবা কারো মাথা তার দুই পায়ের মাঝখানে রাখার পূর্বে কি ঘটনাগুলো ঘটে সে-সবের সাধারণ জ্ঞান থেকে আমি কার্য-কারণ সম্পর্ক 'অনুমান' করি, এমন দাবী করা অযৌক্তিক হবে। এরূপ তথ্যের প্রতি আবেদন ছাড়াই কিন্তু আমি জানছি কেন আমি সে-ভাবে কাজ করেছিলাম। অবশ্য অন্য কেউ আমার আচরণ পর্যবেক্ষণ করে জানতে পারে কেন আমি আমার মাথা নীচু করেছিলাম, কিন্তু এই জ্ঞান লাভ এবং তা প্রমাণ করার জন্য তাকে আমার সম্বন্ধে অথবা সাধারণ মানুষ সম্পর্কে আরও তথ্য অনুসন্ধান করতে হবে।

এখানে আমরা সত্যিই যদি এমন কোন জিনিস পাই যা সাধারণ কার্য-কারণ সম্পর্কের ক্ষেত্রে অনুপস্থিত, তাহলে দুটি সম্ভাব্য সিদ্ধান্ত টানা যায়। একটি হচ্ছে, যুক্তি ও কাজের মাঝে আদৌ কোন কার্য-কারণ সম্পর্ক আমরা পাই না। অন্যটি হচ্ছে, আমরা একটা অস্বাভাবিক কার্য-কারণ সম্পর্ক পাই, যাকে কখনো কখনো অ-হিউমীয় (non-Humean cause) কারণ বলে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। এই মত অনুযায়ী, এরূপ ক্ষেত্রে কারণ এবং কার্যফলের মাঝে একটি অনিবার্য সম্পর্ক রয়েছে, যা স্বতন্ত্রভাবে এক-এক ক্ষেত্রে কোন সদৃশ ঘটনার প্রতি আবেদন ছাড়াই জানা যেতে পারে।

আমার নিজস্ব মত এই যে, যুক্তির সাথে কাজের সম্পর্ক হচ্ছে সাধারণ ধরনের কারণিক সম্পর্কেরই একটি দৃষ্টান্ত। তথাপি একথা সত্য যে, প্রায়ই কেউ যখন তার যুক্তি দেয় তখন সেখানে তার প্রমাণ দেয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। এ মতটি কিভাবে ব্যাখ্যা করা যায়?

আমার বিশ্বাস একটি লোকের নিজস্ব মানসিক অবস্থার বহুলাংশই তার ব্যক্তিগত ব্যাপার, এ তথ্য থেকেই [যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে (পৃঃ ৩৪ দ্রষ্টব্য)] এই ব্যাখ্যার কিছুটা পাওয়া যায়। তার বাসনা বা বিশ্বাসগুলো জানতে

হলে অন্যদেরকে তার আচরণ পর্যবেক্ষণ করতে হবে, কিন্তু তার কাজে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বে কি কি বিশ্বাস ও বাসনা তার ছিল, 'পর্যবেক্ষণ ছাড়াই' সে তা জানতে পারে--এবং তার বাসনার তীব্রতার মাত্রা ও তার বিশ্বাসের প্রত্যয়ের পরিমাণ এর অন্তর্ভুক্ত। এর ফলেই তার স্বীয় কাজের জন্য যুক্তি দেয়ার ব্যাপারে অন্যদের তুলনায় সে বিশেষ সুবিধাজনক অবস্থায় থাকে। প্রমাণের উপর ভিত্তি করে অন্যদের প্রথমেই নির্ধারণ করতে হবে তার মানসিক অবস্থা কি ছিল। এখানে আমরা এই সত্যের একটা উৎস পাচ্ছি যে, নিজের কাজের জন্য যুক্তি দিতে কাজের কর্তার কোন 'প্রমাণের' প্রতি আবেদন করার প্রয়োজন নেই।

যেসব ক্ষেত্রে অন্যরা কোন ব্যক্তির মনের পূর্বগামী অবস্থা সম্পর্কে ততটুকু জানতে পারে যতটুকু সে নিজে জানে, শুধু সেই ক্ষেত্রগুলোকে বিবেচনা করে আমরা যদি এই উপাদানটি বাদ দেই, তাহলেও কি কাজের যুক্তি নির্ধারণের কোন অনারোহী (non-inductive) উপাদান থেকে যায়? তা থেকেই যাচ্ছে বলে মনে হয় এই কারণে যে, লোকে সাধারণতঃ আরোহী যুক্তির সাহায্যে কাজের যুক্তি সম্পর্কিত সিদ্ধান্তে উপনীত হয় না। একজন নেহায়েত সরাসরিভাবেই বলে দিতে পারে তার যুক্তিগুলো কি ছিল। এবং এটা লক্ষ্য করা উচিত যে, 'অন্যরা' যদি কোন ব্যক্তির মানসিক অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারত, তাহলে তারাও সাধারণতঃ তার যুক্তিগুলো কি ছিল তা সরাসরি বলতে পারত; যদি মানসিক অবস্থাকে একবার প্রকাশ্যভাবে জানা যায়, তাহলে এখানে কোন বিশেষ প্রবেশাধিকারের সুবিধার (privileged access) কথাই আর ওঠে না।

তবে এটা নিছক মনোবিজ্ঞানের ব্যাপার মাত্র। দৈহিক এবং মানসিক পারস্পরিক ক্রিয়ার সাধারণ ক্ষেত্রগুলোতে কিসের কারণ কি ছিল তা আমরা প্রায়ই কোনরূপে যুক্তিপ্রক্রিয়া ছাড়াই সোজাসুজি নির্ধারণ করে থাকি। কিভাবে আমরা আমাদের সিদ্ধান্তে পৌঁছি তা এখানে প্রাসঙ্গিক নয়। যা প্রাসঙ্গিক তা হচ্ছে কিভাবে সিদ্ধান্তগুলোকে যুক্তিযুক্ত বলে দেখানো যেতে পারে। এবং যখন আমরা এই প্রশ্নটি উত্থাপন করি তখন দেখা যেতে পারে যে, কাজের জন্য কারো যুক্তি উল্লেখের ব্যাপারে অনারোহীমূলক কোন বিশেষ উপাদান থাকে না। এটা এই তথ্য থেকে বোঝা যায় যে, যখন কোন ব্যক্তি কাজের জন্য তার যুক্তিগুলো উল্লেখ করে তখন সে হয়ত সরলভাবেই বিশ্বাস করে যে সেগুলো তারই যুক্তি ছিল এবং তা সত্ত্বেও 'সে হয়ত ভুল করতে পারে'। কোন ব্যক্তি হয়ত বিশ্বাস করতে পারে যে সে তার মাথা তার দুই পায়ের

মাঝখানে রেখেছিল, কারণ সে মূর্ছাভাব অনুভব করেছিল; কিন্তু তা সঠিক যুক্তি নাও হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে সে হয়ত তার নিজেরই প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করতে অথবা সমস্ত ব্যাপারটা নষ্ট করে দিতে চেয়েছিল। এগুলো হয়ত প্রকৃত কারণ হিসাবে কাজ করেছিল, যদিও সে হয়ত তা বুঝতে পারে নি। এটা নিতান্ত সুখ্যাত একটা সত্য যে, লোকে তাদের কাজের জন্য নিজস্ব যুক্তিগুলোর ব্যাপারে প্রায়ই নিজেদের ঠকিয়ে থাকে।

কাজ করার ব্যাপারে যুক্তিগুলো সম্পর্কে কোন বিশেষ বিশ্বাস যে ভুল, আমরা তা কিভাবে দেখিয়ে থাকি? সদৃশ ঘটনাগুলোকে উল্লেখ করে। আমরা অন্যান্য এমন দৃষ্টান্তের উল্লেখ করতে পারি, যেখানে তার নিজের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের ইচ্ছার পর পরই অদ্ভুত আচরণ সংঘটিত হয়েছিল। সে যে মূর্ছা যাওয়া অনুভব করেছে, অন্যান্য দৃষ্টান্তের উল্লেখ করে আমরা তার এই দাবীর প্রতি সন্দেহ পোষণ করি না, কিন্তু শুধু তার এই দাবীর উপর করি যে, মূর্ছা অনুভব করার 'কারণেই' সে তার মাথা নীচু করেছিল। এবং এভাবে অগ্রসর হওয়ার মধ্যে আমরা কাজের কথিত যুক্তিগুলোকে সেভাবেই দেখছি, ঠিক যেভাবে আমরা কাজের কথিত কারণগুলোকেও দেখি; এগুলোকে আমরা সদৃশ ঘটনাবলী দ্বারা পরীক্ষা করে নেই। এভাবেই যুক্তি ও কারণের এই আপাত-প্রতীয়মান বৈসাদৃশ্য দূরীভূত হয়।

যদিও-বা আমরা কার্য-কারণ এবং যুক্তি-ও-কাজ-এর (reason-action) মধ্যে কোন বিশেষ পার্থক্য সঠিকভাবে নির্দেশ করতে ব্যর্থ হয়েছি, তবুও মনে হতে পারে যে, এগুলো সম্পূর্ণভাবে পৃথক। এরূপ মনে হওয়ার কিছু সম্ভাব্য উৎস রয়েছে এবং আমার মতে এগুলোর প্রতিটিইর মধ্যেই বিভ্রান্তি একটা উপাদান। আমরা ইতিপূর্বেই এমন একটি উৎস লক্ষ্য করেছি, যখন আমরা কর্তা-তত্ত্বের আলোচনা করেছিলাম (উপরে, পৃঃ ১২৫-২৬ দ্রষ্টব্য)। সেখানে এই ধারণা প্রকাশ করা হয়েছিল যে, যদি কাজের কর্তা ব্যতীত কাজের অন্য কোন কারণ থাকে (এবং কোন ব্যক্তির যুক্তি নিজেই কাজের কর্তা নয়), তাহলে কাজের কর্তা দ্বারা কাজগুলো 'সম্পাদিত হতে' পারে না, যেমন নাকি কারো যুক্তির ফলস্বরূপ কাজটি সম্পাদিত হলে কারো যুক্তি আবশ্যিকভাবে তার কাজটি 'সম্পাদনের' কারণ হয় না। বিভ্রান্তির আরেকটি উৎসের সম্ভাবনা রয়েছে; অর্থাৎ, এই মনে করা যে, যদি কাজ কোন কিছুর কার্যফল হয়, তাহলে কাজ নিছক ব্যক্তির জীবনে ঘটে যায়; যার অর্থ হচ্ছে, ব্যক্তির জীবনে যেসব ঘটনা ঘটে ব্যক্তি তাদের নিষ্ক্রিয় ও "অসহায় শিকার"(helpless

victim")[১] মাত্র—ব্যক্তি নিজে সক্রিয় কর্তা হিসাবে কাজটা করে নি। কিন্তু কেউ একথা বিশ্বাস করবে কেন? যদি আমার কাজ আমার প্রয়োজন মেটাবার শ্রেষ্ঠ উপায় অনুসন্ধানের নিজস্ব গভীর চিন্তার ফলাফল হয়, তাহলে কোন প্রকারেই আমি একজন "অসহায় শিকার" নই।

সবশেষে, বিভ্রান্তির আরেকটি উৎস আসছে কার্য-কারণ সম্পর্কে নিতান্ত সংকীর্ণ ধারণা থেকে। একথা কখনও কখনও বলা হয় যে, যুক্তিকে কাজের কারণ হিসাবে ব্যাখ্যা করার অর্থ সেগুলোকে কোন ভৌতিক ইঞ্জিন থেকে "উপ-যন্ত্রের জোরালো ধাক্কা" ("para-mechanical thrusts") হিসাবে অথবা কোন অদৃশ যন্ত্র থেকে ছুটে যাওয়া ভারোত্তলন-দণ্ড ও কপিকল হিসাবে ব্যাখ্যা করা। কিন্তু একটি জিনিস আরেকটিকে সংঘটিত করে বলার অর্থ সেটা কোন্ ধরনের কারণ তা বলা নয়; নিশ্চয়ই সেটা এও বলা নয় যে, জিনিসটা ঊনবিংশ শতাব্দীর পদার্থ-বিজ্ঞানের পুস্তকে বর্ণিত কোন 'যান্ত্রিক' কারণ। যান্ত্রিক কারণ না হয়েও যুক্তিগুলো কাজের কারণ হতে পারে; এমন-কি পদার্থ বিজ্ঞানেও এ রকম কারণকেই একমাত্র অস্তিত্বশীল কারণ বলে আর মনে করা হয় না। আমাদের যুক্তি আমাদিগকে চালিত করতে পারে, যদিও একটি বিলিয়ার্ড বল যেভাবে অপরটিকে চালিত করে অথবা চাঁদ যেভাবে স্রোতকে চালিত করে, তারা সেভাবে চালিত করে না।

মানসিক কারণ-তত্ত্বের পুনরালোচনা

যুক্তি কাজের কারণ হতে পারে, এই মতের বিভিন্ন সমালোচনাকে যদি আমরা দূরীভূত করে থাকি তাহলে মানসিক কারণ-তত্ত্বটিকে পুনরায় পরীক্ষা করা যুক্তিযুক্ত হয়ে পড়ে। তত্ত্বটা এই যে, আমার হাত উপরে ওঠানোর মত একটি অভিপ্রায়মূলক কাজ এবং আমি একে অভিপ্রায়মূলকভাবে উপরে উঠালেও আমার বাহুর উপরে উঠে যাওয়া, এ দুটোর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, অভিপ্রায়মূলক কাজটি পূর্বাহ্নে ঘটিত মানসিক ঘটনা বা অবস্থার ফলে ঘটেছে। আমরা যদি এখন তত্ত্বটিকে আরো বিশেষভাবে উল্লেখ করার জন্য একথা যোগ করি যে, মানসিক ঘটনা বা অবস্থাটা হচ্ছে কিছু বাসনা ও বিশ্বাসের সমষ্টি, যেগুলো সেই প্রকারের জিনিস যাদের সমবায়ে যুক্তি গঠিত হয়, তাহলে আমরা এই তত্ত্বটি পাচ্ছি যে, অভিপ্রায়মূলক কাজগুলো ওইসব ঘটনা যেগুলোর কারণই হল যুক্তি।

---

১ Melden-এর Free Action, পৃঃ ৭,১২৯ দেখুন।

এই তত্ত্বের বিরুদ্ধে দুই ধরনের বিরূপ সমালোচনা করা হয়ঃ (১) কাজ অভিপ্রায়মূলক হওয়ার জন্য যুক্তি-কারণ (reason-causes) অপরিহার্য নয়, এবং (২) কাজ অভিপ্রায়মূলক হওয়ার জন্য যুক্তি-কারণ পর্যাপ্ত নয়।

(১) এমন দাবী করা হতে পারে যে, আমরা যে কাজ অভিপ্রায়মূলকভাবে করি তার জন্য সবসময় যুক্তির প্রয়োজন নেই। আমি যখন আমার জামার আস্তিন থেকে এক টুকরো নরম কাপড় ছিড়ে ফেলি তখন কি আমার কোন প্রকার 'যুক্তি' থাকে? এর উত্তর হচ্ছে, যখন এখানে আমরা যুক্তির কথা বলি তখন আমরা অপরিহার্যভাবেই কোন গূঢ়, গভীর অথবা অপ্রত্যাশিত যুক্তির কথা বলি না। কেউ তার আস্তিন থেকে এক টুকরো নরম কাপড় হয়ত ছিঁড়ে নিতে পারে শুধু এই কারণে যে, সে এমনটিই 'চাচ্ছে' অথবা তার এমনটিই করার 'ইচ্ছে হচ্ছে'। কোন ব্যক্তির যুক্তি খুবই সরল হতে পারে, এবং প্রায়ই তা হয়। যদি আমরা "যুক্তি"কে এভাবে বুঝি, তাহলে আমরা অভিপ্রায়মূলকভাবে যা করি তার জন্য আমাদের সব সময় একটা যুক্তি থাকবে, কারণ আমরা অভিপ্রায়মূলকভাবে যা-ই করি তা হয় আমরা নেহয়েত ইচ্ছা করি অথবা তা করার জন্য আমাদের আরও কোন জটিলতর যুক্তি থাকে। সুতরাং, যুক্তি-কারণ থাকা অভিপ্রায়মূলক কাজের একটি অপরিহার্য শর্ত।

(২) এমন দাবী করা হতে পারে যে, কোন কাজ অভিপ্রায়মূলক হওয়ার জন্য কারণ হিসাবে একটি যুক্তিকে পাওয়াই যথেষ্ট নয়। এই অভিযোগটিকে অবশ্যই পৃথক করতে হবে সেই অধিকতর সহজে নিষ্পত্তিযোগ্য অভিযোগটি থেকে যে, যুক্তি এই অর্থে কাজের পর্যাপ্ত শর্ত নয় যে, সর্বোৎকৃষ্ট যুক্তি থাকা সত্ত্বেও কাজটি নাও ঘটতে পারে (কারণ, উদাহরণস্বরূপ, কাজটি বাধা প্রাপ্ত হয়)। পরবর্তী অভিযোগটি প্রাসঙ্গিক নয়, কারণ যেসব ক্ষেত্রে কাজটি প্রকৃতপক্ষে সংঘটিত হয়, মানসিক কারণ-তত্ত্বটি শুধু সেসব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য বলে ধরা হয়। সেসব ক্ষেত্রে তত্ত্বটির বক্তব্য এই যে, যে কারণে কাজটি 'অভিপ্রায়মূলক' হয় তা হচ্ছে, কাজটির জন্য কোন যুক্তি-কারণের পূর্ব-সংঘটন। আরও গুরুতর, পূর্ববর্তী অভিযোগটি এই যে, এমন-কি যেখানে কাজটি ঘটে সেখানে এর কারণ হিসাবে কোন যুক্তি থাকতে পারে এবং তা সত্ত্বেও এটি একটা অভিপ্রায়মূলক কাজ নাও হতে পারে; যার ফলে একটি কাজ 'অভিপ্রায়মূলক' হওয়ার জন্য যুক্তি-কারণ (reason-cause) থাকাই যথেষ্ট নয়।

এই অভিযোগটিকে সমর্থন করার জন্য নীচের দৃষ্টান্তটি দেয়া যেতে পারে।[১] কোন একটি লোক কিছু ঐশ্বর্য উত্তারাধিকার সূত্রে লাভ করতে চায় এবং মনে করে যে, যদি সে তার চাচাকে খুন করে তবে সে তা লাভ করতে পারবে। ধরা যাক, সে তার চাচাকে খুন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। এই সিদ্ধান্ত তাকে এমন একটা উত্তেজনার অবস্থায় নিয়ে গেল যে, গাড়ী চালাবার সময় সে গতি বাড়াতে থাকে এবং ঘটনাক্রমে অন্য একটি গাড়ীকে ধাক্কা দেয়, তার ফলে একজন আরোহী নিহত হয়, এবং দেখা যায় যে আরোহীটি তারই চাচা। এখানে আমাদের সামনে এমন একটা লোকের দৃষ্টান্ত আছে, যার পক্ষে তার চাচাকে খুন করার যুক্তি আছে, এবং যার যুক্তিগুলো তাকে দিয়ে তাঁর চাচাকে খুন করায়; কিন্তু তা সত্ত্বেও সে অভিপ্রায়মূলকভাবে তার তার চাচাকে খুন করে নি (যদিও একজন জুরিকে তা বিশ্বাস করানো কঠিন হবে)।

এ রকম একটি ঘটনা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমরা আর কি শর্ত যোগ করতে পারি ? এটি এমন একটি ঘটনা যেখানে উদ্দেশ্যের (চাচার মৃত্যু) জন্য একটি উপায়ের প্রয়োজন। সৌভাগ্যবান ভাইপো উদ্দেশ্যটির অভিপ্রায় করেছে কিন্তু উপায়ের (গাড়ীতে ধাক্কা দেয়া, যে-গাড়ীতে তার চাচা রয়েছে) অভিপ্রায় করে নি। এ সমস্যার সমাধান করতে হলে আমাদেরকে অবশ্য এই অতিরিক্ত শর্ত যোগ করতে হবে যে, কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যদি কোন উপায় প্রয়োগ করা প্রয়োজন হয়, তবে উদ্দেশ্যকে অভিপ্রায়মূলকভাবে ঘটানোর জন্য উপায়কেও অভিপ্রায়মূলকভাবে ঘটাতে হবে। কাজেই ভাইপোকে অবশ্যই 'অভিপ্রায়মূলকভাবে' তার চাচার গাড়ীকে ধাক্কা দিতে হবে। এখানে যে মানসিক কারণ-তত্ত্বটি সমর্থন করা হল সে অনুসারে, তার এমনটি করার জন্য অবশ্যই যুক্তি থাকতে হবে (যেমন, সে তা করতে চায়) এবং তার তা করতে চাওয়াকে অবশ্যই তা ঘটাতে হবে। যেহেতু ভাইপোটি গাড়ীকে ধাক্কা দিতে চায় নি, তাই সে তা অভিপ্রায়মূলকভাবে করেনি, এবং সেজন্য সে তার চাচাকে অভিপ্রায়মূলকভাবে হত্যা করে নি। সুতরাং কথিত পাল্টা দৃষ্টান্তটি নিষ্ফল।

এখন মানসিক কারণ-তত্ত্বটির সার-সংক্ষেপ দেয়া যাক। সবচেয়ে সাধারণ ঘটনার ক্ষেত্রে, আমি অভিপ্রায়মূলকভাবে কোন গতি ক সৃষ্টি করি, যদি এবং কেবল যদি আমি ক-কে ঘটাতে চাই এবং যদি সেই বাসনা ক-কে

---

১ মৌলিকভাবে একই ধরনের একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন Roderick M. Chisholm তাঁর *Freedom and Determinism* গ্রন্থের (ed. Lehrer) "*Freedom and Action*" নামক প্রবন্ধে, পৃ: ৩০।

সংঘটিত করে। যখন কোন অভীপ্সা (যেমন, একটি সিদ্ধান্ত) এর মধ্যে এসে জড়িত হয় তখন বাসনাই সেই অভীপ্সাকে সংঘটিত করে যা আবার ঘটনাটিকে ঘটায়। এর চেয়ে জটিলতর ক্ষেত্রে---যেখানে ক-এর সংঘটন খ-এর সংঘটিত হওয়ার উপায়-যদি আমি খ-কে ঘটাতে চাই এবং বিশ্বাস করি যে, ক খ-এর সৃষ্টি করবে এবং যদি আমার বাসনা ও বিশ্বাস (অর্থাৎ আমার যুক্তি) ক-কে সংঘটিত করায়, তাহলে এবং শুধু তাহলেই ক অভিপ্রায়মূলকভাবে ঘটে। এর চেয়ে আরও জটিল ক্ষেত্রে বিবরণটিকে যথাযথভাবে আরও জটিল হতে হবে, কিন্তু আমার বিশ্বাস, এসব চিন্তা ধারার পথ ধরে যে ব্যাখ্যা দেয়া হবে, সেটাই হচ্ছে, একটি কাজ কিসে 'অভিপ্রায়মূলক' হয়, তার বিশ্লেষণ দেয়ার সর্বাপেক্ষা যুক্তিযুক্ত সম্ভাব্য উপায়।

ইচ্ছার স্বাধীনতা সমস্যা

যুক্তিই যে আমাদের সিদ্ধান্তের এবং আমাদের কাজের কারণ, আমরা এতক্ষণ সে-মতবাদটি পরীক্ষা করে দেখেছি। এ মতবাদটির প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাবের একটা বড় উৎস হচ্ছে এই ধারণা যে, এটি আমাদেরকে 'স্বেচ্ছা-প্রণোদিত' কাজের অর্থাৎ কাজের কর্তার 'স্বাধীন ইচ্ছা' অনুযায়ী সম্পাদিত কাজের অস্তিত্ব অস্বীকার করতে বাধ্য করে। এ ধারণাটি গড়ে ওঠে নিম্নোক্ত উপায়ে। মনে করুন, কেউ জিজ্ঞাসা করল: "যে বাসনা ও বিশ্বাস দিয়ে যুক্তি তৈরী 'তাদের' সংঘটিত করে কোন্ জিনিসটি"? এ বিষয়ে সম্ভাবনা আছে দুটি। হয় (১) আমাদের বাসনা ও বিশ্বাসগুলো স্বতঃস্ফূর্ত এবং লক্ষ্যহীনভাবে এসে থাকে বলে তাদের নিজেদের কোন কারণ নেই, অথবা (২) যেগুলো নিজেরা সংঘটিত হয় এমনসব অন্যান্য কারণ দ্বারা সেগুলো, যদি বেশ পিছনের দিকে তাকানো যায় তবে দেখা যাবে, কাজের কর্তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে। কিন্তু প্রতিটির ক্ষেত্রেই, দেখা যাবে যে, কাজের কর্তা তার স্বাধীন ইচ্ছায় কাজ করতে পারে না; কারণ, যদি (১) বাসনা ও বিশ্বাস স্বতঃস্ফূর্ত এবং লক্ষ্যহীনভাবে এসে থাকে (যার অর্থ, সেগুলোর কোন কারণ নেই), তাহলে কাজের কর্তা অসহায়ভাবে তার এসব আভ্যন্তরীণ বিস্ফোরণের (eruptions) অধীন হয়ে পড়ে যা তার আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে, অথবা যদি (২) বাসনা ও বিশ্বাসগুলো কাজের কর্তার নিয়ন্ত্রণের বাইরের অন্যান্য ঘটনা দ্বারা সংঘটিত হয় তাহলে কাজের কর্তা অসহায়ভাবেই তার নিয়ন্ত্রণের বাইরের ঘটনাবলীর অধীন হয়ে পড়ে। প্রতি ক্ষেত্রেই, যেহেতু কাজের কর্তা

তার নিজের স্বাধীন ইচ্ছায় কাজ করতে পারে না, তাই কখনোই তার কাজের জন্য নৈতিকভাবে তাকে দায়ী করা উচিত নয়, এবং কখনোই সে তার কাজের জন্য প্রশংসা বা দোষের খ্যাতি বা অখ্যাতির যোগ্য হতে পারে না।

কাউকে যে কখনোই তার কাজের জন্য নৈতিকভাবে দায়ী করা উচিত নয়, তা একটা খুবই অবাঞ্ছিত পরিণাম। কারণ, কেউ যদি কখনো দায়ী না হয় তাহলে আমাদের গোটা নৈতিক ব্যবস্থাকে এবং, মানুষ তার কাজের জন্য নিজেই নৈতিকভাবে দায়ী, আমাদের এই গভীর অনুভূতিকে মারাত্মকভাবে পরিবর্তন করতে হত। এমন লোক আছে যারা, বলতে গেলে, এই পরিণামকে গ্রহণ করে এবং মনে করে যে, কাউকে তার কাজের জন্য প্রশংসা বা দোষী করা উচিত নয়।[১] কিন্তু, যেসব ব্যক্তিকে তাদের কাজের জন্য দায়ী করা উচিত নয়---যেমন পাগল, নির্বোধ, ছোট শিশু, স্বপ্নচারী, যারা বল-প্রয়োগে শাসিত এবং যারা প্রতারিত--এবং যেসব ব্যাক্তিকে তাদের কাজের জন্য দায়ী করা উচিত—যেমন সুস্থ, স্বাভাবিক মানুষ যারা জেনে-শুনে এবং বল-প্রয়োগ ব্যতিরেকেই কাজ করে---আমাদের অনেকেই এই দুই শ্রেণীর মধ্যে এটা ভেদরেখা টানার ইচ্ছা প্রকাশ করবেন। নিশ্চিতই যদি দ্বিতীয় প্রকারের কোন ব্যক্তি সম্পদলাভের জন্য কাউকে হত্যা করে অথবা অননুমোদিত কোন কিছুকে এড়ানোর জন্য মিথ্যা কথা বলে, নিজের সুবিধার জন্য যদি কোন পবিত্র প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে অথবা পুরস্কারের জন্য কোন বন্ধুকে প্রতারণা করে, তাহলে আমাদের অনেকেই বিশ্বাস করবেন যে, তার কাজের জন্য তাকে নৈতিকভাবে দায়ী করা উচিত।

আমাদের মধ্যে অনেকেই যখন বিশ্বাস করেন যে মানুষকে তার কাজের জন্য কখনো কখনো নৈতিকভাবে দায়ী হতে হয়, তখন আমরা এও বিশ্বাস করি যে, একজনকে তার কাজের জন্য দায়ী করা উচিত কেবল যদি সে অন্য কাজ করতে পারত। যদি সে অন্য কাজ করতে না পারত, সে যা করেছে যদি সে তা না করেই পারত না, তাহলে সে-কাজটি করার জন্য তাকে দায়ী করা ঠিক নয়।

---

১ *Philosophy and Phenomenological Research*-এর ১৯৫০ সনের সংখ্যায় John Hospers লিখিত "Free Will and Psychoanalygis" প্রবন্ধটি দেখুন, Paul Edwards and Arther Pap-এর *A Modern Introduction to Philosophy* পুস্তকটির পরিবর্তিত সংস্করণে (New York, Free Press, 1965) এটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে, পৃঃ ৭৫—৮৫।

কিন্তু যদি আমাদের সিদ্ধান্তের এবং কাজের কারণ থাকে এবং যদি এই কারণগুলো লক্ষ্যহীনভাবে আসে বা এগুলোর নিজেদেরই এমন কারণ থাকে যা আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে, তাহলে মনে হয় যে আমরা যা করেছি তা ছাড়া আর কিছুই করতে পারি না, এবং সেজন্য আমরা আমাদের কাজের জন্য দায়ী নই।

যদি আমরা বিশ্বাস করে যেতে চাই যে, কখনো কখনো মানুষ তাদের সিদ্ধান্ত ও কাজের জন্য দায়ী, তাহলে এর বিকল্পসমূহ কি? আমরা অস্বীকার করতে পারি যে, এ ধরনের সিদ্ধান্ত ও কাজের কখনো এমন কারণ থাকতে পারে যা কাজের কর্তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকে (এ ধরনের মতবাদকে প্রায়ই স্বাধীন-ইচ্ছা মতবাদ [libertarianism] বলা হয়), কারণ হয় এ ধরনের সিদ্ধান্ত ও কাজের ওপর কারণের ধারণার কোন প্রয়োগ নেই (সম্পাদনামূলক মতবাদীরা, উদ্দেশ্যবাদীরা, প্রসঙ্গবাদীরা যেমন মনে করেন), অথবা এ ধরনের সিদ্ধান্ত বা কাজের আদি কারণ হল নেহায়েত কাজের কর্তা নিজেই (যেমন কর্তাতত্ত্বীরা মনে করেন)। অথবা, আমরা স্বীকার করতে পারি যে, এ ধরনের সিদ্ধান্ত ও কাজের কারণ থাকবেই, যা শেষ পর্যন্ত কাজের কর্তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে, কিন্তু মানুষ তা সত্ত্বেও তার সিদ্ধান্ত ও কাজের জন্য দায়ী হতে পারে, এ তথ্যের সপক্ষে যুক্তি দিতে পারি।

যেহেতু আমরা মানসিক কারণ তত্ত্বটির কিছু কিছু সুবিধা লক্ষ্য করেছি, সুতরাং এখন দেখা যাক মানুষকে দায়ী করার ব্যাপারে ওই তত্ত্বানুসারে কোন যুক্তি দাঁড় করানো যায় কিনা। এ ধরনের মতবাদের একটা প্রারম্ভিক আপাত-যৌক্তিকতা রয়েছে; কারণ এটা বলা যুক্তিসঙ্গত মনে হয় যে, যদি একজন মানুষের সিদ্ধান্ত ও কাজ তার বাসনা ও বিশ্বাস দ্বারা নির্ধারিত হয়ে থাকে তাহলে সে তার স্বাধীন ইচ্ছানুসারে কাজ করছিল, যদিও তার বিশ্বাস ও বাসনাগুলোর এমনসব কারণ ছিল যেগুলো, খুব পিছনের দিকে তাকালে দেখা যাবে, তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল। যদি আমি কোন কিছু করি, নিছক এ জন্য যে আমি তা করতেই চাই, অথবা এ কারণে যে আমি বিশ্বাস করি যে তা করলে আমি ঈপ্সিত জিনিসটা পাব, তাহলে ঠিক সে ধরনের কাজই কোন স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কাজের আদর্শ দৃষ্টান্ত (paradigm) হবে।

কিন্তু এখন যদি আমরা মনে করি যে, আমাদের বিশ্বাস ও বাসনা আমাদের কাজের কারণ এবং এগুলোর কারণ আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে, তাহলে দুটি তথ্য প্রকাশ পায় বলে মনে হয়, যাতে দেখা যায় যে এ ধরনের কাজ

স্বাধীন-ইচ্ছা প্রসূত নয়। (১) যেহেতু বিশ্বাস ও বাসনা আমাদের সিদ্ধান্ত কাজের কারণ, তাই মনে হয় যে আমাদের সিদ্ধান্ত ও কাজের ওপর 'আমাদের' কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। আমাদের বিশ্বাস ও বাসনা উপস্থিত থাকলে আমরা 'অবশ্যই' সিদ্ধান্ত নেব এবং একটি বিশেষ উপায়ে কাজ করব, এবং এছাড়া আর অন্যকিছু আমরা করতে পারি না। তবে এ ধরনের সিদ্ধান্ত ও কাজ কিভাবে স্বাধীন হতে পারে? (২) যেহেতু বিশ্বাস ও বাসনার নিজেদেরই এমন কারণ আছে যা আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে, সে-কারণেই আমাদের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত ব্যাপারগুলোর দরুন আমরা যা চাই ও বিশ্বাস করি তা আমরা অবশ্যই চাইব ও বিশ্বাস করব, এবং সেজন্য আমরা যেভাবে কাজ করি ও সিদ্ধান্ত নিই সেইভাবে কাজ করব ও সিদ্ধান্ত নেব। তাহলে আবার প্রশ্ন উঠবে, এ ধরনের সিদ্ধান্ত ও কাজ কিভাবে স্বাধীন হতে পারে? আমাদের এই সিদ্ধান্তগুলো কতটুকু সঙ্গত?

(১)--এর উত্তরে, মানসিক কারণ তত্ত্বীরা হয়ত বলবেন যে, আমরা অবশ্যই কারণ এবং জবরদস্তির (coercion) মধ্যে পার্থক্য করব। বিশেষ বিশেষ বাসনা ও বিশ্বাস আবশ্যিকভাবেই বিশেষ বিশেষ সিদ্ধান্তের সৃষ্টি করবে এই অর্থে যে সেগুলো সিদ্ধান্তটার কারণ---এ ব্যাপারটি দ্বারা এটা বোঝায় না যে, কাজের কর্তা এই অর্থে 'আবশ্যিকভাবে' সেই সিদ্ধান্ত নেবে যে, সে 'তার প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে অথবা প্রতিকূল বিশ্বাস সত্ত্বেও' সেটি করতে 'চাপ প্রাপ্ত হয়েছিল' এবং 'বাধ্য হয়েছিল'। ব্যাপারটা বরং সম্পূর্ণ বিপরীত—অর্থাৎ, কাজের কর্তার সিদ্ধান্তটি সেইসব প্রবৃত্তি ও বিশ্বাস দ্বারাই গড়ে উঠেছিল। তার বাসনা ও বিশ্বাসের কারণিক কার্যকারিতা (the causal efficieney) তার স্বাধীন ইচ্ছার উপর কোন বাধা নয়, বরং তার প্রয়োগেরই নামান্তর। এ কথা সত্য যে, ওই বিশ্বাস ও বাসনা নিয়ে 'কারণিকভাবে' সে অন্য কিছু করতে পারত না, কিন্তু সে অন্য কিছু করতে পারত এই অর্থে যে, অন্য বাসনা বা অন্য বিশ্বাস থাকলে সে অন্য কিছু করত। আর শেষোক্তটিই হচ্ছে প্রাসঙ্গিক অর্থ, যে অর্থে কোন মানুষ যে তার নিজের স্বাধীন-ইচ্ছায় কিছু করেছে তা বলা যায়।

সমকালীন অনেক দার্শনিক এই উত্তরকে সন্তোষজনক মনে করেন না। তাঁরা যুক্তি দেখান যে, কোন মানুষ স্বাধীন-ইচ্ছায় কিছু করেছে বলার জন্য এটা প্রয়োজন যে, 'ওই পরিস্থিতিতে' সে অন্য কিছু করতে পারত, এবং "অন্যভাবে করতে পারত"—এই কথার এই ব্যাখ্যা তাঁরা প্রত্যাখ্যান করেন যে, অন্য বাসনা বা অন্য বিশ্বাস থাকলে সে অন্যকিছু করতে পারত। 'এই' পরিস্থিতিতে

কোন ব্যক্তি অন্যকিছু 'করতে পারত' কিনা সে আলোচনায় সে যে 'অন্য' পরিস্থিতিতে অন্যকিছু করত তা বলা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। সিদ্ধান্তটি যে স্বাধীন ছিল তা বলার অর্থ এই যে, সেই সময়ে লোকটির যেসব বাসনা ও বিশ্বাস ছিল সেগুলোর উপস্থিতিতে সেখানে এবং সেই মুহূর্তে ইচ্ছামত কোনকিছু করার ক্ষমতা তার ছিল। এমন কোন মাদকাসক্ত ব্যক্তির কথা চিন্তা করুন, যে নেশাগ্রস্ত হতে চাচ্ছে এবং মনে করছে যে সে নিজেকে এই সূঁচটি দিয়ে ইন্‌জেক্‌শন দিলেই নেশাগ্রস্ত হতে পারবে, এবং এই যুক্তিগুলো তার গায়ে সূঁচ প্রবেশ করানোর কারণ। এই ব্যক্তির বেলায় এ কথা নিশ্চিতভাবেই সত্য যে, তার যদি সেই বাসনা ও সেই বিশ্বাস না থাকত, তাহলে সে অন্যভাবে কাজ করত। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, সে তার নিজের স্বাধীন ইচ্ছায় সূঁচটি প্রবেশ করিয়েছিল। বাস্তবিক পক্ষে, যেমন আমরা ভাল করেই জানি, সে নিজেকে এ কাজ থেকে বিরত রাখতে পারত না: তার কাজটি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত নয়। এখন, এই মাদকাসক্ত ব্যক্তির সঙ্গে, যার কাজের কারণ হল তার বিশ্বাস ও বাসনা, আমাদের মত অন্যান্যের কি পার্থক্য রয়েছে? স্বাধীন-ইচ্ছা মতবাদীর (libertarian) উত্তর হবে যে, অন্ততঃ আমাদের মত অন্যান্যের ক্ষেত্রে, যখন আমরা স্বাধীনভাবে কাজ করি তখন, আমাদের বিশ্বাস বা বাসনা আমাদের কাজের 'কারণ নয়'।

মাদকাসক্ত ব্যক্তির "বাধ্যতামূলক" (compulsive) ঔষধ গ্রহণ ও আমাদের সাধারণ স্বাধীন কাজের মধ্যে পার্থক্যের কিছু বিবরণ আমরা মানসিক কারণ তত্ত্বীদের কাছ থেকে আশা করি। নিম্নোক্ত প্রস্তাবটির কিছু মূল্য থাকতে পারে। যা মাদকাসক্ত ব্যক্তির ব্যাপারকে পৃথক করে তা হচ্ছে এই যে, তার ইচ্ছা "অপ্রতিরোধ্য" (irresistible), এবং অপ্রতিরোধ্য ইচ্ছা হচ্ছে সেই ইচ্ছা যা কাউকে কোন কাজের দিকে পরিচালিত করে, 'যদিও সেই কাজের পরবর্তী ফলাফল সে-সম্পর্কে সে কি বিশ্বাস করল তাতে কিছু আসে যায় না। যেমন, সেই মাদকাসক্ত ব্যক্তি সূঁচটি প্রবেশ করাবে, যদিও সে এমন-কি এটাও বিশ্বাস করে যে, এর ফলে তার পরিবার ও সে নিজে ধ্বংস হয়ে যাবে, এমন-কি তাদের মৃত্যু এবং তার নিজের মৃত্যুও ঘটবে। তবে আমরা আমাদের কাজ সম্পর্কে প্রায়ই জানি যে, আমরা যদি বিশ্বাস করতাম যে আমাদের কাজের বিশেষ অবাঞ্ছিত ফলাফল থাকবে, তাহলে আমরা সেভাবে কাজ করতাম না। যখন আমরা বলি যে, আমরা সেভাবে কাজ করতে বাধ্য ছিলাম না এবং অন্যভাবে কাজ করতে পারতাম, তখন সম্ভবতঃ আমরা

সে-ধরনের কিছু-একটাই বুঝাই; কিন্তু মাদকাসক্ত ব্যক্তি সেভাবেই কাজ করতে বাধ্য হয়েছিল এবং অন্যভাবে সে কাজ করতে পারত না। আমরা যদি সে-ধরনের কোন-কিছুই বুঝাই তা হলে মাদকাসক্ত ব্যক্তির কাজের সাথে আমাদের স্বাভাবিক কাজের পার্থক্য এই নয় যে, তার কাজের কারণ ছিল, যদিও আমাদের কাজের তা নেই। পার্থক্যটা এই যে, তার কাজের কারণ এত শক্তিশালী ছিল যে অন্য কোন বিবেচনা কাজটিকে সংঘটিত হওয়া থেকে বিরত রাখতে পারত না; কিন্তু একটি স্বাভাবিক কাজের কারণ কাউকে সেই কাজের দিকে নিয়ে যেত না, যদি অতিরিক্ত আরও কিছু বিষয় বিবেচনার মধ্যে আনা হত। এই উত্তর কতটুকু সন্তোষজনক তা বিচার করার ভার পাঠকের উপরই ছেড়ে দিতে হবে; বিষয়টি আজ পর্যন্তও খুবই বিতর্কমূলক।

(২)-এর উত্তরে, অর্থাৎ, আমাদের যেসব বিশ্বাস ও বাসনা রয়েছে সেগুলো যদি আবশ্যিকভাবেই আমাদের থাকে, তাহলে তারা আমাদের দিয়ে যেসব কাজ করায় সেগুলো না করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব---এই অভিযোগের উত্তরে মানসিক কারণতত্ত্বীরা হয়ত বলবেন যে, এ সিদ্ধান্তটি করা চলে না। এই যুক্তিটি এ পূর্বধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত যে, যদি কোন ক-এর একটি বৈশিষ্ট্য (এ ক্ষেত্রে, অনিবার্য কোন-কিছু হওয়ার বৈশিষ্ট্য) থাকে এবং যদি ক খ-কে ঘটায়, তাহলে খ-এরও অবশ্যই সেই বৈষিশষ্ট্য থাকবে। যদিও এ পূর্বধারণাটি কোন কোন বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে, স্পষ্টতই তা সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়; যে ঔষধটি আমরা পছন্দ করি না তা হয়ত অপেক্ষাকৃত ভাল স্বাস্থ্যের কারণ হতে পারে যা আমাদেরও পছন্দনীয়। একথা সত্য যে, ক যদি খ-কে ঘটায়, এবং খ যদি গ-কে ঘটায়, তাহলে ক যে গ-কে ঘটায় তা বলা যায়; কাজেই মানসিক কারণতত্ত্বের বক্তব্য অনুসারে একথা বলা যেতে পারে যে, যা আমাদের বাসনা ও বিশ্বাসের কারণ, তাকে আমাদের কাজের কারণ বলা যেতে পারে। কিন্তু এর থেকে অনুমান করা যায় না যে, 'আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে' যা আমাদের বাসনা ও বিশ্বাসের কারণ তা 'আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই' অনিবার্যভাবে আমাদের কাজেরও কারণ। এবং যে-ক্ষেত্রে আমাদের বাসনা ও বিশ্বাস 'আমাদের ইচ্ছাকে প্রভাবিত করে', সেক্ষেত্রে একথা স্পষ্টতঃই মিথ্যা যে আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যা আমাদের বাসনা ও বিশ্বাসের কারণ, তা আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই আমাদের কাজেরও কারণ। মানসিক কারণতত্ত্বীর মতে, আমাদের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত যেসব ঘটনা আমাদের বাসনা ও বিশ্বাসের কারণ, সেগুলো থেকে 'আমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন'

কাজের উৎপত্তি ঘটে। কিন্তু কোন জিনিসের পক্ষে আমাদের নিয়ন্ত্রণের অধীন হওয়ার অর্থ কি, মানসিক কারণতত্ত্বীর নিকট থেকে তার একটা বিশ্লেষণ একনও আমাদের পাওয়ার বাকী রয়েছে। এবং সম্ভবতঃ উপরের অনুচ্ছেদটির চিন্তা ধারার আলোকে প্রস্তাবিত বিশ্লেষণ সন্তোসজনক বলে প্রমাণিত হবে।

এই অধ্যায়ে, যে অভিপ্রায়মূলক কাজের প্রত্যয় চেতনা সম্পর্কিত ধারণার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত প্রত্যয়গুলোর অন্যতমম, কিছুটা বিশদভাবে আমরা তাকে পরীক্ষা করে দেখেছি। যে পরিমাণে বিশ্বাস, কামনা ও সিদ্ধান্তকে অভিপ্রায়-মূলক কাজের প্রত্যয়ের অন্তর্ভুক্ত বলে দেখানো হয়েছে সেই পরিমাণে এ প্রত্যয়ের মধ্যে জ্ঞান, অনুভূতি ও অভীপ্সার পবিত্র ত্রয়ীর (hallowed triad) তিনটি দিকের সবকটিরই দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কোনকিছু 'বিশ্বাস করা', কোন-কিছুকে 'কামনা করা' অথবা কোন-কিছুকে 'পছন্দ করার' কি অর্থ, নিজেদের এ প্রশ্ন করে আমরা মনোদর্শনের চর্চার পথে আরো এগিয়ে যেতে পারতাম। অথবা প্রত্যক্ষণ, স্মৃতি, কল্পনা, মনোযোগ ইত্যাদি অপরাপর কেন্দ্রীয় প্রত্যয়ের দিকে নজর দিয়ে আমরা এখন অন্যান্য দিকে চলে যেতে পারতাম। কিন্তু সম্ভবতঃ পাঠককে মনোদর্শনের জটিলতা, গুরুত্ব ও আকর্ষণীয়তা সম্বন্ধে কিছু ধারণা দেয়ার পক্ষে এখানে যথেষ্ট করা হয়েছে।

অতিরিক্ত পাঠের জন্য

যে গ্রন্থটি মনোদর্শনের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিককালে কৌতূহল জাগ্রত করেছে সেটা হল গিলবার্ট রাইল প্রণীত *The Concept of Mind,* যা ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। এ বিষয়ে সকল একক রচনাকে এই গ্রন্থটি আজও ম্লান করে রেখেছে। বিভিন্ন লেখকের সাম্প্রতিককালে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ রচিত গ্রন্থাদির সাথে একেও নিম্নে তালিকাভুক্ত করা হল। নিম্নোক্ত সংকলন-গ্রন্থসমূহে সাম্প্রতিককালে রচিত কতকগুলো জার্নাল-প্রবন্ধের নাম রয়েছে, যদিও এসবের মধ্যে অতীতের প্রখ্যাত দার্শনিকদেরও রচনার কিছু প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃত অংশ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যেমন ফ্লু (Flew) এবং ভেসি (Vesey) প্রমুখ দার্শনিকের রচনার অংশ। অন্যান্য বহু সংকলনেই পুস্তকাদির আরও পঠিতব্য গ্রন্থপঞ্জীর উল্লেখ পাওয়া যায়। আমি পল এডওয়ার্ড্স্ (Paul Edwards)-এর *The Encyclopedia of Philosophy* থেকে প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধগুলোকেও এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছি। প্রধান প্রধান বিশেষজ্ঞদের দ্বারা লিখিত এ প্রবন্ধগুলো অত্যন্ত উচুমানের এবং বিশেষ বিশেষ আলোচ্য বিষয়-বস্তুর উপর এতে প্রয়োজনীয় গ্রন্থপঞ্জী অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

বিভিন্ন লেখকের রচনাবলী

Anscombe, G.E.M., *Intention.* Ithaca, N.Y. : Cornell University Press, 1958. Paperback.

Armstrong, David M., *Bodily Sensations.* New York : Humanities Press (London : Routledge & Kegan Paul, Ltd.), 1962.

Feigl, Herbert, *The "Mental" and the "Physical".* Minneapolis : University of Minnesota Press, 1967. Paperback.

Hampshire, Stuart, *The Freedom of the Individual.* New York : Harper and Row, Publishers, 1965.

————, *Thought and Action.* New York : Viking Press, 1960.

Kenny, Anthony, *Action, Emotion, and Will.* New York : Humanities Press (London : Routledge & Kegan Paul, Ltd.), 1963.

MacIntyre, Alasdair C., *The Unconscious : A Conceptual Analysis*. New York : Humanities Press (London : Routledge & Kegan Paul, Ltd.), 1958.

Melden. A. I., *Free Action*. New York : Humanities Press, (London : Routledge & Kegan Paul, Ltd.), 1961.

Peters, R. S., *The Concept of Motivation*. (2nd ed.). New York: Humanities Press, (London : Routledge & Kegan Paul,Ltd.), 1960.

Ryle, Gilbert, *The Concept of Mind*. New York : Barnes & Noble, Inc., 1949. Also in Paperback : Baltimore. Penguin Books.

Shoemaker, Sydney. *Self-Knowledge and Self- Identity*. Ithaca, N. Y. : Cornell University Press, 1963.

Shwayder, David S., *The Stratification of Behavior*. New York : Humanities Press (London : Routledge & Kegan Paul, Ltd), 1965.

Smythies, J. R., *The Neurological Foundations of Psychiatry*. New York : Academic Press (Oxford: Blackwell Scientific Publications), 1966.

Taylor, Charles, *The Explanation of Behavior*, New York : Humanities Press (London : Routledge & Kegan Paul, Ltd.), 1964.

Taylor, Richard, *Action and Purpose*. Englewood Cliffs, N.Y. : Prentice-Hall, Inc., 1966.

Vesey, G. N. A., *The Embodied Mind*. New York : Humanities Press (London : George Allen and Unwin, Ltd.), 1965.

White, Alan R., *Attention*. Oxford : Basil Blackwell & Mott, Ltd. 1965.

————, *Explaining Human Behavior*. Hull University Press, 1962.

————, *The Philosophy of Mind*. New York : Random House, 1967. Paperback.

Wisdom, John O., *Other Minds*. Oxford : Basil Blackwell & Mott, Ltd., 1965.

Wittgenstein, Ludwig, *Philosophical Investigations*. Trans. G. E. M. Anscombe (2nd ed..). New York : The Macmillan Company (Oxford : Basil Blackwell & Mott, Ltd.), 1958.

সংকলন গ্রন্থসমূহ

Anderson, Alan R., ed., *Mind and Machines*. Englewood Cliffs, N. J. : Prentice-Hall, Inc., 1964. Paperback.

Berofsky, Bernard, ed., *Free Will and Determinism*. New York : Harper and Row, Publishers, 1966.

Chappell, Vere C., ed., *The Philosophy of Mind*. Englewood Cliffs, N. J. : Prentice-Hall, Inc., 1962. A Spectrum book.

Flew, Atony, ed., *Body, Mind, and Death*. New York : The Macmillan Company, 1964. Paperback.

Gustafson, Donald F., ed., *Essays in Philosophical Psychology*. Garden City, N. Y.,: Doubleday & Company, Inc., 1964. An Anchor book.

Hampshire, Stuart, ed., *Philosophy of Mind*. New York : Harper and Row, Publishers, 1966. Paperback.

Hook, Sidney, ed., *Determinism and Freedom : In the Age of Modern Science*. New York : Collier Books, 1961.

——————, *Dimensions of Mind : A Symposium*. New York : New York University Press, 1960.

Lehrer, Keith, ed., *Freedom and Determinism*. New York : Random House, 1966.

Pears, D. F., ed., *Freedom and the Will*. New York : St. Martins Press (London : Macmillan and Company, Ltd.), 1963.

Smythies, J. R., ed., *Mind and Brain*. New York : Humanities Press, (London : Routledge & Kegan Paul, Ltd.), 1965.

Vesey, G. N. A., ed., *Body and Mind.* New York : Humanities Press, (London : George Allen and Unwin, Ltd.), 1964.

Wann, T. W., ed., *Behaviorism and Phenomenology.* Chicago : The University of Chicago Press, 1966. A Phoenix book.

এনসাইক্লোপেডিয়ার প্রবন্ধসমূহ

নিম্নোক্তগুলো হচ্ছে পল এডওয়ার্ডস্ সম্পাদিত *The Encyclopedia of Philosophy* (New york : The Macmillan Company, 1967)-র অন্তর্গত প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ :

Behaviorism
Can
Choosing, Deciding and Doing.
Consciousness
Death
Determinism
Dreams
Emotion and Feeling
ESP Phenomena
Freedom
Happiness
Ideas
Images
Imagination
Immortality
Intention
Intentionality
Materialism
Memory
Mind-Body Problem
Motives and Motivation.
Other Minds
Perecption
Personal Identity.
Persons
Phenomenology
Philosophical Anthropology
Pleasure
Private Language Problem
Reason and Causes
Responsibility
Thinking.
Unconsciousness
Volition
Voluntarism

নির্ঘণ্ট

অ

অস্টিন জে, এল, ১২৭-১২৮
অশরীরী অস্তিত্ব, ১০৪-১০৬
অভিন্নতা তত্ত্ব, ৪৩, ৫৯-৭১, ৭৮, ৭৯, ১১৮
অভীপ্সা, ১১৯-১২০, ১৪১
অভিপ্রায়গত, ১৬
অভিপ্রায়মূলক, ১৪৪
অভিপ্রায়তত্ত্ব, ৩১-৩২
অভিপ্রায়মূলক কাজ, ১১১-১৬০
অধি-মনোবৈজ্ঞানিক ঘটনা, ১০৭-১১০

আ

আচরণবাদ, ২০-২৯, ৫৯-৬০
--পারস্পরিক ক্রিয়াবাদের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, ১১৮
আত্মা, ১
আত্মার ধারণা, ২
--প্রাচীন ইহুদিগণ, ২
--এ্যারিস্টটল, ৩
--প্রাচীন গ্রীকগণ, ২, ৫৫
--প্লেটো, ২-৩
আত্মা বনাম মন, ৩-৪
আর্মসন জে, ও, ১১৮

উ

উপঘটনাবাদ, ৫২, ৫৬, ৭৫, ৮৮, ৯৭-১১০, ১২৪

এ

এ্যারিস্টটল, ৩, ১২২

ও

ও'শাউগ্‌নেসি, ব্রায়ান, ১১১

ক

কাজ, ১১১-১৬০
--কাজের কারণ হিসাবে মানসিক ঘটনা-তত্ত্ব, ১১৬-১২২, ১৫১-১৬০
--কর্তা-তত্ত্ব, ১২২-১২৭, ১৫০-১৫১
--সম্পাদনমূলক তত্ত্ব, ১২৭-১৩১,১৫৬
--কাজের ব্যাখ্যা হিসাবে লক্ষ্য, ১৩১-১৩৬, ১৫৬
--কাজের প্রসঙ্গমূলক বিবরণ, ১৩৬--১৪০, ১৫৬
কারণ, ৮৯-৯০
--কার্য-কারণের প্রকার ভেদঃ
--কর্তা-কারণতা, ১২৪-১২৫
--ঘটনা-কারণতা, ১২৪-১২৫
—উদ্দেশ্যমূলক কারণতা, ১৩৩-১৩৫
--এবং যুক্তি, ১৪০-১৫১
কর্ণম্যান, জেম্‌স ডব্লিউ, ৭৬

খ

খ্রীস্টীয় বিজ্ঞান, ৫২

চ

চিজম, রোডেরিক এম, ৩১, ১২২, ১২৪, ১৫৩

জ

জড়বাদ, ৪৯, ৫৫-৭২, ৭৫, ৮২, ১১৮

ট

টেইলর, চার্ল্‌স্‌, ১৩২-১৩৩
টেইলর, রিচার্ড, ১২২, ১২৫, ১৩২

ড

ডেভিডসন, ডোনাল্‌ড্‌, ১৪২
ডেমোক্রিটাস, ৫৫

ডেকার্ট, রেনে, ৪৯-৫২, ৭২, ৭৮, ১১৭
ডান্, মাইকেল, ৪১

দ

দেহহীন অস্তিত্ব, ২
দ্বিমুখী তত্ত্ব, ৫০, ৭২-৭৪, ৮০
দেহান্তর, ২, ১০৫
দ্বৈতবাদ, ৪৯-৫৫, ৮২-৮৫
দায়িত্ব, ১২৪, ১২৯, ১৩০-১৩১, ১৫৪-১৬০

প

প্রবণতাসূচক গুণাবলী, ২২
পরবর্তী জীবন, ১০৪-১০৭
পিটার্স, আর, এস, ১৩৬
পারস্পরিক ক্রিয়াবাদ, ৫১, ৮৭-৮৮, ১০২-১১০, ১১৭-১২৪
প্লেটো, ১-৩

ফ

ফাইগাল, হার্বার্ট, ৭৯

ব

বার্কলি,, জর্জ, ৫২
ব্রেনতানো, ফ্রেঞ্জ, ৩১-৩২
ব্যথাঃ
—বনাম আচরণের প্রবণতা, ২৫-২৯, ৩৪, ৪৫--৪৭,
—ব্যথার ধারণাটি শেখা, ৪০-৪১ ৪৬--৪৭
--এবং সুখ, ৮--৯
--ব্যথার ব্যক্তিগত নির্দেশক সংজ্ঞা, ৩৩--৩৯
ব্যক্তিতত্ত্ব, ৪৯, ৭২-৮২, ৯৭
ব্যক্তিগততা, ৩৪, ৪৪-৪৫, ১৪৮
ব্যক্তিগত নির্দেশক সংজ্ঞা, ৩৩-৩৫
ভেটগেন্স্টাইন, লুদভিগ, ১৬, ৩৫, ৪২, ১১৫

ম

মালেব্রাঁশে, নিকোলাস, ৯২
মার্ক্স, কার্ল, ৫৬
মেলডেন, এ, আই, ১২০, ১৩৬, ১৪৩, ১৫১
মানসিক ট্যালিপ্যাথি, ৮৪, ১০৭
মন, ৪
--দেহ থেকে পৃথক হিসাবে, ৪৯-৫৫
--মনের সারধর্ম, ১৫-১৭
--মনের বৃত্তিসমূহ, ৬--১০
--মনোদর্শন, ৫,৮, ২৬০
--মনোবিজ্ঞানের সাথে মনোদর্শনের সম্পর্ক, ১০-১১
--সনাক্তকরণের সমস্যা, ৫৪, ৮৩ ৮৪
--স্বতন্ত্রীকরণের সমস্যা, ৫৪, ৮৩ ৮৪
--বনাম আত্মা, ৩--৪
--দেহ মনের তত্ত্বসমূহ, (আচরণবাদ, দ্বিমুখীতত্ত্ব, উপ-ঘটনাবাদ, অভিন্নতাতত্ত্ব, পারস্পরিক ক্রিয়াবাদ, জড়বাদ, সমান্তরালবাদ, ব্যক্তিতত্ত্ব দেখুন।)
মনোবিজ্ঞান, ১০-১১
মনঃসঞ্চলন, ১০৭
ম্যাওর, জি, ঈ, ১২, ৩১

যৌক্তিকীকরণ, ১৪০
* যুক্তি, ১১৪, ১১৭, ১৩৫--১৫৪

র

রাইল, গিলবার্ট, ৯, ২৪, ১১৯
রূপবিদ্যা, ৩১-৩২

ল

ল্যাড, জি, টি, ১৩
ল্যুইস, ডেভিড কে, ২৮
লক্, জন, ৩৪, ৪৩

স

স্বীকারোক্তিসূচক তত্ত্ব, ৫৭
স্বাধীন ইচ্ছা, ১৫৪-১৬০
সর্ব প্রাণবাদ, ৭৩
সমান্তরালবাদ, ৫৩-৫৪, ৮৮-৯৭
সুখ, ৮-৯
সান্তায়ানা, জর্জ, ১০০

স্মার্ট, জে, জে, সি, ৪৩, ৬৫
স্পিনোজা, বারুচ, ৭২--৭৪, ৮০, ৯৩, ৯৭
স্ট্রসন, পি, এফ, ৭৪-৮২, ১২৮

হ

হেয়ার, আর, এম, ১২৮
হার্ট, এইচ, এল, এ, ১২৯, ১৪৬
হাইডেলবার্গার, হার্বার্ট, ৩২
হব্স্, টমাস, ৭২
হনোর, এ, এম, ১৪৬
হস্পার্স্, জন, ১৫৫
হিউম, ডেভিড, ৪৬, ৮৯, ৯৪
হুসার্ল, এডমাণ্ড, ৩৯

* 'reason' কথাটি কখনও কখনও 'হেতু' বা 'কারণ' অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে —অনুবাদক।

পরিভাষা

A

Aboutness : সাম্বন্ধিকতা
Abstraction : অমূর্তায়ন
Aetion : কাজ
Accidental : দৈবিক, আপতিক
Accretion : পরিবৃদ্ধি
Affection : অনুভূতি
Afterimage : অনুবেদন,উত্তর প্রতিরূপ
Afterlife : পরবর্তী জীবন
Agent : কর্তা
Agent-causation : কর্তা-কারণতা
Agency : কর্তৃত্ব
——theory of : কর্তা-তত্ত্ব
Alibi : কোন ঘটনা অনুষ্ঠান কালে অভিযুক্ত ব্যক্তির অনুপস্থিতির ওজর
Appearance : অবভাস, বাহ্যরূপ, প্রতীয়মান সত্তা
Approval : অনুমোদন
Approximate : প্রায় সঠিক বা যথাযথ
Amalgam : মিশ্রণ
Amoebae : এ্যামিবা
Analogy : সাদৃশ্যানুমান, উপমা
Anatomy : শারীরস্থান
Animating force : প্রাণ সঞ্চরকারী শক্তি
Anecdote : কাহিনী, গল্প
Antecedent : পূর্বগ, পূর্ববর্তী ঘটনা
Anti-particles : বিপরীত কণা
Assertion : উক্তি, নিশ্চিত উক্তি
Assign : আরোপ করা
Aspect : দিক
Assumption : পূর্বস্বীকৃতি, অনুমান
Asymmetry : অসুষমতা, অসামঞ্জস্যতা
———— Epistemological : জ্ঞান-তাত্ত্বিক অসামঞ্জস্যতা বা অসুষমতা
Attribution : আরোপণ
Atypical : আদর্শস্থানীয়, নমুনা বা জাতিরূপ নয় এমন, অ-বৈশিষ্ট্যমূলক
Avowal theory : স্বীকারোক্তি-সূচক তত্ত্ব

B

Belief : বিশ্বাস
Behaviourism : আচরণবাদ
..———Methodical পদ্ধতি গত
———Metaphysical : আধিবিদ্যক
Behaviouristic version : আচরণবাদী ব্যাখ্যা
Behaviour : আচরণ
————Overt : বাহ্যিক
————Covert : আভ্যন্তরীণ
Blame : দোষ
Blameworthy : নিন্দার যোগ্য, দোষণীয়

Black arts : যাদু বিদ্যা
Breath : নিঃশ্বাস
Brain-state : মস্তিষ্কাবস্থা
Brain-events : মস্তিষ্কবর্তী ঘটনা
Brittleness : ভঙ্গুরতা
By-product : উপজাত

C

Carcass : পশুপক্ষীর মৃতদেহ
Cause : কারণ
Causal : কারণিক
Causality : কার্য-কারণতা, কার্য-কারণ সম্বন্ধ
Cause and effect : কার্য-কারণ
Causation : কারণবাদ, কার্য-কারণ, কার্যকারণ সম্বন্ধ
Causal chain : কার্যকারণ পরম্পরা
Causal relationship : কারণিক সম্বন্ধ
Charge : বৈদ্যুতিক শক্তিদ্বারা সঞ্চারিত করা
Characterization : বৈশিষ্ট্য-বর্ণনা
Choice : পছন্দ, মনোনয়ন
Choose : মনোনয়ন করা
Coercion : জবরদস্তি
Co-existence : সহাবস্থান
Cognition : জ্ঞান
Compulsion : বাধ্যবাধকতা
Composition : সংমিশ্রণ
Concept : প্রত্যয়, ধারণা
Conceptual apparatus : কাল্পনিক যন্ত্র বা সরঞ্জাম
Content : আধেয়
Contingent : শর্তাধীন
Contexual account : প্রসঙ্গমূলক বিবরণ
Contexualist : প্রসঙ্গবাদী
Concave : অবতল
Concomitant : সহগামী
Contemplative awareness : গভীর চিন্তামূলক সচেতনতা
Consequences : ফলাফল
Convex : উত্তল
Corner-stone : ভিত্তিস্তর
Corpse : শবদেহ
Correspondence : অনুরূপতা
Correlation : অনুবন্ধ, পরস্পর সম্বন্ধ
Creation : সৃষ্টি
Crucial test : চরম বা চূড়ান্ত পরীক্ষা

D

Day-dream : দিবা-স্বপ্ন
Decesion : সিদ্ধান্ত
Definition : সংজ্ঞা
Deliberation : বিবেচনা, চিন্তা
Description : বর্ণনা
Desire : কামনা
Demonic possession : ভূতাবেশ
Denominator : নির্ধারক
Determination : সঙ্কল্প
Dice : ঘুটি
Dimension : আয়তন, আকৃতি, পরিমাণ, মাত্রা

Diaphanous : স্বচ্ছ
Disapproval : অননুমোদন
Disembodied existence : অশরীরী অস্তিত্ব
Displeasure : সুখাভাব
Disposition : প্রবণতা
Disposition to behave : আচরণের প্রবণতা
Dispositional properties : প্রবণতা সূচক গুণাবলী
Dispositional definition প্রবণতাসূচক সংজ্ঞা
Dogmatism : নির্বিচারবাদ
Dream-imegery : স্বাপ্নিক প্রতিচ্ছবি
Double aspect theory : দ্বিমুখী তত্ত্ব
Dualist : দ্বৈতবাদী
Dualism : দ্বৈতবাদ

E

Efflux : নিঃসরণ
Electrical : বৈদ্যুতিক
Electrical charge : বৈদ্যুতিক ক্ষরণ
Electro-magnetic waves : বৈদ্যুতিক চুম্বক প্রবাহ
Electrodes : তড়িৎ শলাকা
Electro-chemical : তড়িৎ রাসায়নিক
Emission : নির্গমন
Epiphenomenalism : উপঘটনাবাদ
Energy : শক্তি
Enjoyment : আনন্দ
Entail : অনুসরণ করা, অচ্ছেদ্য-ভাবে থাকা (অন্য কিছুর সঙ্গে), অপরিহার্য ফল স্বরূপ ঘটান
Entity : সত্তা
Extention : বিস্তার, প্রসারণ
Extrapolation : অধিগণন
Event -causation : ঘটনা-কারণতা
Evidence : প্রমাণ, সাক্ষ্য

F

Faculty : বৃত্তি
Family resemblance : শ্রেণী-সাদৃশ্য
Face Value : অভিহিত মূল্য
Fetus : ভ্রূণ
Feeling : অনুভূতি
First-person account উত্তম-পুরুষ বিবরণ
Folk-lore লোক-গাঁথা
Fore-boding : পূর্বাভাস
Force : বল
Form : আকার, রূপ
Frame of mind : মানসিক অবস্থা
Free-will : স্বাধীন ইচ্ছা

G

Gap : ফাঁক
Generalisation : সার্বিকীকরণ, সাধারণীকরণ
Geometrical system : জ্যামিতিক পদ্ধতি
Germinating beam sprout : শিমের অঙ্কুরোদগমাবস্থা
Goal : লক্ষ্য, উদ্দেশ্য
Goal-State : লক্ষ্যাবস্থা, উদ্দেশ্যাবস্থা

Gravitational : মাধ্যাকর্ষণমূলক
God-intoxieated man : ঈশ্বর প্রমত্ত মানুষ

H

Hallowed trinity : পূত ত্রিত্ব
Heavenly body জ্যোতিষ্ক
Hellish : নারকীয়
Homo Sapiens : মানবগোষ্ঠী
Hunch : ইঙ্গিত
Hypothesis : প্রকল্প

I

Identity theory : অভিন্নতা তত্ত্ব
Identity theorists : অভিন্নতা তত্ত্বী
Identification : সনাক্তকরণ
Ignition : জ্বলন
Illusion : ভ্রম
Image : প্রতিচ্ছবি, মানসচিত্র
Imagination : কল্পনা
Imbecile : নির্বোধ
Impoverish : দরিদ্র করে ফেলা
Inductive inference : আরোহী অনুমান
Individuation : স্বতন্ত্রীকরণ
Infer : অনুমান করা
Incompatibility : অসংগতি
Infinite regress : অনন্ত প্রত্যাগমন
Inorganic : অজৈব
Intelligible : অবোধগম্য
Intelligibility : অবোধগম্যতা
Intention : অভিপ্রায়
Intentionality : অভিপ্রায়তা
Intentional : অভিপ্রায়মূলক
Intentionally : অভিপ্রায়মূলকভাবে
Intentional action : অভিপ্রয়মূলক কাজ
Interaction : পারস্পরিক ক্রিয়া
Interactionism : পারস্পরিক ক্রিয়াবাদ
Interpersonal : আন্তর্বৈক্তিক
Intermediary : মধ্যস্থকারী
Irresistible : অপ্রতিরোধ্য
Irreversible : অপরিবর্তনীয়
Introspection : অন্তর্দর্শন
Insubstantial substance : অবাস্তব পদার্থ

K

Knack : দক্ষতা, কৌশল
Knowing : জানা

L

Liability : দায়
Libertarianism : স্বাধীনইচ্ছার তত্ত্ব
Libertarian : স্বাধীন ইচ্ছার মতবাদী
Linguistics : ভাষাতত্ত্ব

M

Magnetic : চুম্বকশক্তিপূর্ণ
Mammal : স্তন্যপায়ী
Masochism : মর্ষকাম
Materialism : জড়বাদ
Material : জড়
Materiality : জড়ত্ব

Material behaviour : জড়-আচরণ
Material atoms : জড়-অণু
Mechanism : যন্ত্রের গঠন, কার্য সাধনের বন্দোবস্ত
Mechanical cause : যান্ত্রিক কারণ
Memory : স্মৃতি
Mental image : মানসিক প্রতিচ্ছবি
Mental events : মানসিক ঘটনাবলী
Mentality : মানসতা, মানসিকতা
Mentalistic terms : মানসধর্মী পদ
Mental cause theory : মানসিক কারণ তত্ত্ব
Mental telepathy : মানসিক টেলিপ্যাথি
Metaphysical : আধিবিদ্যক
Minuseule : ক্ষুদ্রাংশ
Misleading : ভ্রমাত্মক
Motive : উদ্দেশ্য
Moral action : নৈতিক কাজ
Morality : নৈতিকতা
Motor :: সঞ্চালনমূলক

N

Necessary : আবশ্যিক
Necessary condition : আবশ্যিক শর্ত
Necessity : অবশ্যম্ভাবিতা, অপরিহার্যতা, বাধ্যবাধকতা
Nervous system : স্নায়ুতন্ত্র
Network : জালাকার সংযোগ
Neurological investigation : স্নায়ুতাত্ত্বিক অনুসন্ধান
Neurophysiology : স্নায়ু-শারীরতত্ত্ব
Neurotic compulsion : স্নায়বিক বাধ্যকতা
Neutralist theory : নিরপেক্ষীতত্ত্ব
Non-inductive : অনারোহী

O

Objective : বিষয়গত, বস্তুগত
Occasionalism : উপলক্ষণবাদ
Occur : সংঘটিত হওয়া
Occurrence : সংঘটন, ঘটনা
Organic : জৈব
Organism : জীবাঙ্গ, জীবন্ত প্রাণীকুল
Outflow : বহির্প্রবাহ
Oversimplification : অতিসরলীকরণ

P

Pain : ব্যথা
Panpsychism : সর্বপ্রাণবাদ
Paradigm : পরিকল্পিত কাঠামো বা ছাচ, আদর্শ দৃষ্টান্ত
Paroxysm : তীব্রবেদনার আক্রমণবোধ
Paradox : কূটাভাস
Paradoxical : কূটাভাস পূর্ণ, আত্ম-বিরোধী অথচ সত্য
Parallelism : সমান্তরালবাদ
Paralysis : পক্ষঘাত, অসাড়তা
Parasychological Phenomenon : অধিমনোবৈজ্ঞানিক ঘটনা
Perception : প্রত্যক্ষণ
Person: ব্যক্তি

Person theory : ব্যক্তি-তত্ত্ব
Performative theory : সম্পাদনমূলক তত্ত্ব
Performatives : সম্পাদনমূলক উক্তি
Perspective : প্রেক্ষিত
Phenomena : অবভাস, ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যরূপ, দৃশ্যমান বস্তু, ঘটনা
Phenomenology : রূপবিদ্যা
Physical : ভৌত, পদার্থিক
Physical law : ভৌত বা পদার্থিক নিয়ম
Physical Phenomena : ভৌত বা পদার্থিক ঘটনা
Physical events : ভৌত বা পদার্থিক ঘটনাবলী
Phvsical object : ভৌতবস্তু, জড়বস্তু
Physicalistic terms : ভৌত ধর্মী পদ বা শব্দাবলী
Physical theory : ভৌত বা পদার্থিক তত্ত্ব
Physical state : ভৌতাবস্থা
Physical movement : দৈহিক সঞ্চলন
Physical terms : দেহধর্মী পদ বা শব্দ
Pipe dream : গাঁজাখুঁরী স্বপ্ন
Pleasure : সুখ
Plausible : যুক্তিসঙ্গত
Plausibility : যুক্তিসঙ্গতা, আপাত যুক্তিসঙ্গতা
Poker face : প্রকাশ বিহীন মুখাবয়ব
Psycho-physical interactionism : মনোদৈহিক সমান্তরালবাদ
Publtc matter : প্রকাশ্য বস্তু বা ব্যপার
Private ostensive definition : ব্যক্তিগত নির্দেশক সংজ্ঞা
Principle of Conservation of Energy : ভরশক্তির সংরক্ষণ নীতি
Probes : ক্ষত পরীক্ষার শলাকা
Psychic : মানসিক
Praise worthy : প্রশংসার যোগ্য
Presentiment : পূর্বধারণা
Prediction : পূর্বাভাস
Presumably : সম্ভবতঃ
Private : ব্যক্তিগত, নিজস্ব
Privacy : ব্যক্তিগততা
Poker behaviour : প্রকাশবিহীন আচরণ
Poltergeists : শব্দকারী ভূত
Porousness : ছিদ্রময়তা
Postulation : স্বীকৃত অনুমান
Postulate : স্বতঃসিদ্ধ, স্বীকার্য বিষয়
Practioners : পেশাধারীগণ

R

Radio activity : তেজস্ক্রিয়তা
Radio-active material : তেজস্ক্রিয় পদার্থ
Random : লক্ষ্যবিহীন
Rationality : যৌক্তিকতা
Rationalization : যৌক্তিকীকরণ

Reason : যুক্তি, হেতু, কারণ
Reason-action : যুক্তি ও কাজ
Reason-cause : যুক্তি ও কারণ
Reality : সত্তা, বাস্তবতা
Realities : সত্তাসমূহ
——Eternal and Final : শাশ্বত ও পরম
Receptive : গ্রহণশীল
Reflection : চিন্তন
Referent : আরোপ্য
Refutation : খণ্ডন
Reflex : প্রতিবর্ত
Responsible : দায়ী
Responsibility : দায়িত্ব
Reverie : জাগ্রত-স্বপ্ন
Reward : পুরস্কার

S

Santans : তামাটে হওয়া
Scalpels : ক্ষুদ্রছুরি
Scarlet : লোহিত বর্ণ
Scowling : ভ্রূকুটি
Self-mover : স্বতঃ সঞ্চালনকারী
Self-movement : স্বতঃসঞ্চলন, স্বতঃচলন
Self-propelled : স্বতঃচালিত
Set : সমষ্টি বা সংগ্রহ, দল, গুচ্ছ
Sleep-walker : স্বপ্নচারী
Sensation-words : সংবেদনমূলক শব্দ
Simultaneous identity : যুগপৎভাবে ঘটমান অভিন্নতা
Spectrum : বর্ণালী
Soporific : নিদ্রাদায়ক
Sprout : নবোদগম, পল্লব
Spontaneous : স্বতঃ প্রণোদিত
Stuttering : তোতলামি
Subject : বিষয়, কর্তা
——of consciousness : চেতনার কর্তা
Subjective : বিষয়ীগত, আত্মগত
Substance : দ্রব্য
Sub-atomic particles আধা-অনুকণা
Succeeding : অনুগামী
Successive : অনুক্রমিক
Sufficient condition : পর্যাপ্ত শর্ত
Survival : অস্তিত্ব

T

Tautology : পুনরুক্তি
Technical : পেশাগত
Teleological thesis : উদ্দেশ্যবাদীতত্ত্ব
——,explanation উদ্দেশ্যবাদী ব্যাখ্যা
Terminology : পারিভাষিক শব্দাবলী
Thinking : চিন্তন
Third-person account : নাম পুরুষ বিবরণ
Tow line : গুণের রজ্জু
Transmigration : দেহান্তর
Traditional : প্রচলিত
Twiddle : ইতস্ততঃ মোচড়ান

Tubereule : ক্ষয়জীবাণু
Tuberculosis : ক্ষয়রোগ
Tug : শক্ত দড়ি

U

Underlying entity : অন্তর্নিহিত সত্তা
Understanding : বোধশক্তি
Undulating Wave : তরঙ্গায়িত রেখা
Unified theory thesis : একীভূত তত্ত্ব
Unintentional : অনভিপ্রেত
Unintelligibility : অবোধগম্যতা তত্ত্ব
Utilitarian : প্রয়োগবাদী

V

Vacuousness : শূন্যতা
Verification : প্রতিপাদন
Verifiable : প্রতিপাদনযোগ্য
Visual phenopmena : দৃষ্টি সংক্রান্ত ঘটনাবলী
Vice versa : তদ্বিপরীত, বিপরীতক্রমে
Vocal chord : স্বরনালী
Void : শূন্যতা
Volition : অভীপ্সা, ইচ্ছশক্তি
Voluntary : ঐচ্ছিক, স্বেচ্ছামূলক, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত

W

Want : বাসনা, অভাববোধ
Will : ইচ্ছা
Wish : অভিলাষ, ইচ্ছা
Wild paradox : উৎকট কূটাভাস
Witchcraft : যাদুবিদ্যা
Withdrawal : প্রত্যাহার

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	লাইন	আছে	হবে
৩৩	২১-২২	খুব খুব মাথা খাটায়	খুব মাথা খাটায়
৩৭	২৫	তরা	তার
৩৭	২৯	কর	করে
৪১	পাদটীকা	Mr. Michael	Mr. Michael Dunn
৪৯	৭	Person Theery	Person Theory
৫০	২৩	বশিষ্ট্য	বৈশিষ্ট্য
৫১	১	অ-বিস্তৃত	অ-বিস্তৃত
৫৯	১৬	বাখ্যগুলোকে	বাক্যগুলোকে
৬২	২৬	ধারনাই	ধারণাই
৬৪	৬	মানসিক হচ্ছে দিক	মানসিক দিক হচ্ছে
৬৪	২৯	তাহলে	তাহলেও
৬৫	১৭	জানেন	জানেন না
৭৭	২	শীঘই	শীঘ্রই
১১৬	২৬	Independenee	Independence
১১৮	১২	Identoty	Identity
১৪০	৬	পার্থকোর	পার্থক্যের
১৪৯	২৪	কভাবে	কিভাবে
১৪৯	২৬	উথাপন	উত্থাপন
১৫২	২১	পর্য্যন্ত	পর্য্যাপ্ত
১৫৩	২	উত্তারাধিকার	উত্তরাধিকার
১৫৯	১৭	বৈষিশষ্ট্য	বৈশিষ্ট্য
১৫৯	১৯	সক্ষল	সকল
১৬০	৬	অন্যতমম	অন্যতম
১৬০	৪	সন্তোসজনক	সন্তোষজনক
১৬০	৮	পরিমণে	পরিমাণে